# অসম্পূর্ণ

## স্মরণজিৎ চক্রবর্তী

আলোর টুকরো আজ ছড়িয়ে আছে চারিদিকে! আর তার মাঝে ও শুনল, 'না, তুমি এমন কথা বলবে না আমায়! কোনওদিনও বলবে না! আমি অন্য একজনকে ভালবাসি! তুমি আমার কেউ নও! কোনও অধিকার নেই তোমার! দূরে থাকবে, তুমি দূরে থাকবে আমার থেকে। বুঝেছ!'

ও শুধু তাকাল মুখ তুলে! মনে হল আকাশ থেকে হাজার হাজার মৃত পাখির পালক ঝড়ে পড়ছে সামনে! আর তার মধ্যে দিয়ে ওর চলে যাওয়ার পথটুকুই আজ স্পষ্ট হয়ে আছে কেবল! ওর মনে হল আজ থেকে ওর জীবনে চলে যাওয়াটুকুই থাকবে শুধু, ফিরে আসা বলে কিছু থাকবে না কোনওদিন!

ও মাথা নিচু করল। তারপর আলোছায়া পেরিয়ে আস্তে আস্তে মিলিয়ে গেল মনমরা গলিটার বাঁকে। না, পেছনে ফিরে তাকাল না একবারও।

## ঈশ্বরের ডাইরি - ১

আমি জানি একদিন সে আসবে। জানি তার আসার পথে যে কলকাতা নামক শহরটা পড়ে সেখানে পাহাড় থাকবে একটা। তাতে উঠে মাঝে মাঝে অন্ধ বোইম দাদু পতাকা নাড়াবে। আমি জানি একদিন সেই পাহাড়ের মাথায় প্রচুর কাক জড়ো হয়ে পুচ পুচ করে ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট হাগু করবে। আমি জানি একদিন আমাদের বাড়িতে রাখা কামানটা দিয়ে আমি সেই সব মুনাফাখোর কাকেদের মেরে ক্রান্তি আনব। আমি জানি একদিন সেই আনন্দে মনুমেন্ট খুলে মাটিতে শুইয়ে সেটা দিয়ে ময়দানের মতো একটা বিরাট রুটি বেলা হবে! আর সেই রুটির টুকরো ছড়িয়ে নতুন করে ডেকে আনা হবে আরও নানান রকমের আধ ঢ্যামনা, ফুল ঢ্যামনা কাকেদের! আর জানি এই এসব দেখে একদিন আমি আবার অসুখ থেকে সেরে উঠে সবার মতো ডিপ্রেশানে ভুগতে শুরু করব! আমি জানি একদিন আমাকেও আমার মাইনে দিয়ে মাপা হবে! আমাকে আমার সেলফি দিয়ে পছন্দ করা হবে! জানি, জন্মদিনের বেলুন কিনতে গিয়ে আমি কিনে আনব ডটেড আর রিবড! নিজের প্রেমিকাকে বিক্রি করে দেব উন্নতি আর লোভের কাছে। আমি জানি তার পরের দিন আমি মানুষ হয়ে উঠে ইঁদুরের মতো দৌড়তে শুরু করব আবার! আবার আমি কিছু না করেও অন্যের পরিশ্রমের কাজে হাফ-পন্ডিতি আঙুল খুঁচিয়ে নিজেকে কয়েক মিনিটের জন্য বিখ্যাত আর শব্দ করে তুলব! আমি জানি তারপর আবার ঘুমিয়ে পড়ব আর জেগে উঠে দেখব টিভি সিরিয়ালের মতো সবার হাসিকান্নারাগকষ্টবমিপায়খানার পেছনে মিউজিক বেজে উঠছে আকাশ-পাতাল কাঁপিয়ে! আমি জানি একদিন আমিও জানব কী করতে নেই! তবু ভাল মানুষের মতো মুখ করে সেটাই করে যাব রোজ! আমি জানি একদিন আমিও পা চাটব চালাক লোকেদের মতো। রাজা-উজির মারব ছদ্ম-মেধাবীদের মতো! একদিন আমিও ভাল হয়ে উঠে সোশ্যাল নেটওয়ার্কে বুড়ো আঙুলের জোরে বিপ্লব আনব দেশে! আমিও একদিন অন্যের মাংস খেয়ে ঢেকুর তুলবো! তারপর আচমকা একদিন ভোরবেলা উঠে বুঝব আসলে এখানে রাত্রি চলছে কুড়ি হাজার বছর ধরে! বুঝব মা, বাবা, ভাই, বোন, প্রেমিকা, প্রেমিক আসলে কেউ হয় না আমাদের! বুঝব সবাই আমরা মৃত এক অ্যালব্যাট্রস পাখি গলায় ঝুলিয়ে ঘুরছি! যে আমায় বাঁচিয়েছে

আমরা তাকে হত্যা করে সেই দোষে আটকে আছি পৃথিবী নামক তেল-সাগরে ভেসে থাকা এক জাহাজে! আর তবু আমি বিশ্বাস রাখব যে একদিন সে আসবে! বিশ্বাস রাখব, সে আমাদের এই জোড়া তাপ্পি দেওয়া জাহাজটাকে আবার পথ দেখিয়ে এই গোলকধাঁধা থেকে বের করে নিয়ে যাবে নতুন এক ভোরবেলার শহরে!

॥ ১ ॥

**আদিত**

আজও রাস্তার পাশে ঈশ্বরকে বসে থাকতে দেখল আদিত। ঈশ্বর বেশ লম্বা। ভারি চেহারা। জামা কাপড় হাকুচ কালো। এক মাথা এলোমেলো চুল। বড় দাড়ি। চামড়াতেও ম্যাপের মতো ছোপ ছোপ ময়লার দাগ। কিন্তু যখনই ঈশ্বরকে চোখে পড়ে আদিতের, ও দেখে একটা খাতায় উপুড় হয়ে কীসব যেন লিখছে ও! অবাক লাগে। রাস্তায় পড়ে থাকা একটা পাগল কী লেখে এত! কে ওকে এমন খাতা কিনে দেয়! এমন পেন কিনে দেয়!

ওকে দেখে আদিতের কেমন একটা হিংসে আর হীনমন্যতা আসে। এত শব্দ আর হইচইয়ের মধ্যে কী করে একটা পাগল নিজেকে এক বিন্দুতে এমন করে ধরে রাখে! আদিত পারে না কেন এমন? কেন বারবার বাঁধন খুলে যাওয়া ঝাঁটার মতো ছড়িয়ে পড়ে ওর মন! কী আছে পাগলটার মধ্যে যা ওর নেই!

লেক গার্ডেন্স স্টেশানে আপ বজবজ লোকাল ঢুকছে। লেভেল ক্রসিং পড়ে আছে। কিন্তু আদিত কখনও লেভেল ক্রসিঙের তলা দিয়ে গলে যায় না। এমন কী পাশ দিয়েও যায় না! ও অপেক্ষা করে গেটের সামনে। যতক্ষণ না গেট খোলে ও রেল লাইন পার হয় না!

ওকে এমন করতে দেখে মাকু খুব হাসে। বলে, 'শালা তুই নিয়ম মানার জন্য নোবেল প্রাইজ পাবি! অস্কারও পেতে পারিস!'

আদিত বিরক্ত হয় মাকুর কথায়। বলে, 'দেশটা কার? কার এই দেশ? আমাদের না? এই নিয়মগুলো করা হয়েছে কেন? মানার জন্য তো নাকি? সবাই বলবে দেশের কিছু হচ্ছে না, কারও কিছু হচ্ছে না, কিন্তু কেউ শালা নিয়মকানুন কিছু মানবে না। সবাই নিয়ম ফোটায়, কিন্তু অন্যের জন্য! সবাই এমন করলে দেশটা চলবে?'

মাকু তাকিয়ে থাকে ওর দিকে। তারপর কিছু সময় পরে বলে, 'ছোটবেলায় মাথায় চোট পেয়েছিলি? নাকি কোনও পার্ভার্ট কাকু তোকে ইয়ে করেছিল? বিয়ন্ড রিপেয়ার এমন চু... মানে ঘেঁটে গেলি কী করে বলত?'

ট্রেনটা স্টেশানে দাঁড়িয়ে একটা লম্বা হুইসল দিল! আদিতের মনে হল কেউ যেন সরু লোহার শলাকা কানের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছে! তীব্র শব্দ একদম সহ্য করতে পারে না আদিত। আচ্ছা পাশেই এত বড় লেক। এত সব গাছ। এত এত পাখি আছে তাতে, সেই সব তুলো বলের মতো এক ফোঁটা দুই ফোঁটা পাখির বাচ্চাদের কতটা কষ্ট হয় এমন শব্দে! মনে মনে যেন কষ্টে কুঁকড়ে যাওয়া পাখির বাচ্চাদের দেখতে পায় আদিত। কেমন একটা কষ্ট হয় ওর! আর এ ঝলকে ওর মনে পড়ে যায় স্মাহির কথা!

স্মাহিদের বাড়িতে কত পাখি ছিল! ওর জেঠুর পাখির সখ ছিল খুব। বিরাট লম্বা বারান্দার এক পাশে তারের জাল দিয়ে ঘেরা বিশাল একটা খাঁচা ছিল পাখির! কত রকমের রঙবেরঙের পাখি ছিল সেই খাঁচায়!

খাঁচার লোহার জাল ধরে দাঁড়িয়ে পাখিদের দিকে তাকিয়ে থাকত আদিত! কী ভাল যে লাগত! মনে হত এত রঙ কী করে এল পৃথিবীতে!

মাঝে মাঝে স্মাহি এসে দাঁড়াত ওর পাশে। পাখিদের নাম বলে দিত ওকে। বলে দিত কোন পাখি কোন অঞ্চলের। কী খায়। কেমন করে বাসা বানায়!

একবার আদিত জিজ্ঞেস করেছিল, 'পাখিদের বাসা কেন বলে? পাখিদের বাড়ি কেন বলে না?'

স্মাহি হেসেছিল। কী সুন্দর মুক্তোর মতো দাঁত ছিল স্মাহির! ছোট্ট মুকুট কপাল। নাকের দুই পাশে ছোট্ট দুটো তিল! থুতনিতে আলতো একটা টোল! রঙ্গন ফুলের পাঁপড়ির মতো ঠোঁটের ওপর আলতো একটা কাটা দাগ! স্মাহি হাসলে আদিতের মনে হত কে যেন হাজার হাজার আয়না ছড়িয়ে দিয়েছে চারিদিকে! মনে হত বাতাসে অক্সিজেন বেড়ে গেল! মনে হত সিংহের মতো হলুদ কেশর নাড়িয়ে আকাশে উঠে দাঁড়াল সূর্য!

সেই অদ্ভুত হাসি নিয়ে আদিতের দিকে তাকিয়েছিল স্মাহি। নিচু শান্ত গলায় বলেছিল, 'পাখিদের মতো ভালবাসা আর কজন দিতে পারে! তাই হয়ত ওদের বাসস্থানকে বাসা বলে। আর মানুষরা অমন পারে না, তাই তাদের হল বাড়ি!' কথা শেষ করে মাথা নামিয়ে নিয়েছিল স্মাহি।

আদিতর ইচ্ছে করেছিল স্মাহির অদ্ভুত সুন্দর আঙুলগুলো একবার ও ধরে আলতো করে। আর বলে, 'আমাদের বাসস্থানকেও বাসা বলা হবে। দেখো?'

ঘটাঘট ঘটাঘট শব্দে ট্রেনটা সামনে দিয়ে ছিটকে বেরিয়ে গেল শিয়ালদার দিকে। স্মৃতির পাতলা কাচটা আলতো করে ভেঙে মিলিয়ে গেল হাওয়ায়!

'কীরে? রাজুদার বাড়িতে যাচ্ছিস?' পাশের থেকে মাকুর গলা পেয়ে তাকাল আদিত।

দেখল, সকাল সকাল লাল জামা, লাল সোয়েটার আর সবুজ প্যান্ট পরে ফিটবাবু হয়ে এসে পড়েছে মাকু। মুখে হাসি। পানের রসে লাল হয়ে যাওয়া দাঁতগুলো ম্যাচ করে গেছে জামার সঙ্গে! কটা চোখ চঞ্চলভাবে ঘুরছে!

আদিত হাসল। মাকু ছেলেটা ভাল। একটু বেশি বকে, কিন্তু তাতে ক্ষতি নেই! আসল তো মন। সেদিক থেকে ছেলেটা সহজ সরল।

'নে এবার যাবি তো?' মাকু পাশের থেকে খোঁচা দিল ওকে।

ট্রেন চলে যাওয়ার পরে কেমন ফুলস্টপের মতো মানুষজন ছড়িয়ে পড়ে চারিদিকে। এখানেও মানুষ লাইন পার হয়ে ছড়িয়ে পড়ছে রাস্তাঘাটে।

সামনের লেভেল ক্রসিঙের গেট উঠে গেছে। মানুষজন তড়বড় করে এগিয়ে যাচ্ছে সামনে। এদিক দিয়ে আর গাড়ি যায় না। লেক গার্ডেন্স ওভার ব্রিজ হয়ে যাওয়ায় ব্রিজ পেরিয়ে সব চলে যায় আজকাল।

সাবধানে লাইন পার করে অন্যদিকে গেল আদিত আর মাকু।

ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহেই কলকাতায় শীত পড়ে গেছে বেশ। সকালের দিকে একটা হালকা ওড়নার মতো ঝিরঝিরে কুয়াশা এসে জড়িয়ে থাকে শহরে চোখে মুখে। বেশ ভাল লাগে আদিতের। মনে হয়, কোনও পাহাড়ে ঘুরতে এসেছে!

পাহাড়ে যেতে খুব ইচ্ছে করে ওর। ছোটোবেলা একবার পাহাড়ে গিয়েছিল আদিত। বাবা তখন সুস্থ ছিল। ওদের বাড়িটা কী হাসিখুশি আর আনন্দের ছিল! বাবা আর মায়ের হাত ধরে কার্শিয়াঙ শহরের উঁচু নিচু রাস্তায় ঘুরেছিল আদিত। রঙিন টয় ট্রেন স্টেশনটা কী ভাল লেগেছিল! কেমন ছোট্ট শহরের মধ্যে দিয়ে ঝিকঝিক করে যেত সেই ট্রেন! কাঠের স্টেশানের মাথায় জড়িয়ে থাকত মেঘ! পুরোনো আভিমানী ইঞ্জিন দাঁড়িয়ে থাকত স্টেশানের এক কোণে!

সেই বয়সে আদিতের মনে হত বড় হয়ে ও টয় ট্রেনের ড্রাইভার হবে! রোজ পাহাড়ের পাক দন্ডি বেয়ে উঠে যাবে মেঘেদের ওপরে! ঝাউ, পাইন আর পপলার গাছের ফাঁক দিয়ে দেখবে কীভাবে সূর্য ঘুরে যাচ্ছে কাঞ্চনজঙ্ঘার ওপর দিয়ে অন্য কোনো অজানা পাহাড়ের মাথায়!

আজ এতদিন পরে আদিতের মনে হয় সেসব আসলে বিগত জন্মের স্মৃতি। মনে হয় আসলে ও জাতিস্মর! এক সকালে ঘুম থেকে উঠে যেন অন্য জন্মের সেইসব কিছু হঠাৎ মনে পড়ে গিয়েছে ওর!

কলকাতায় কাকুলিয়া রোডের এক তন্য গলিতে থাকে আদিত। সেখানে অসুস্থ বাবা আর ভাঙা টেরাকোটার মতো মাকে নিয়ে ওর

মনখারাপের সংসার। কখনও কখনও রাতে নিজের ঘরে শুতে গিয়ে ওর মনে হয়, এই জীবনটা ফালতুই কেটে গেল! কিছুই ঠিকভাবে করা হল না।

চাকরি একটা করত আদিত। একটা খবরের কাগজে সাব এডিটারের কাজ করত ও। বর্ধমানে পোস্টিং ছিল। কিন্তু সেটা করতে গিয়ে দেখেছিল, রাজনীতিটা করতে পারছে না! কোনও কিছুই অর্ধেক বা ভাঙাভাবে করতে পারে না আদিত। মনে হয় ও অন্যকে ঠকাচ্ছে! তাই চাকরিটা ছেড়ে দিয়েছিল।

রাজুদা বকেছিল খুব। বলেছিল, 'শালা গাধা নাকি তুই? পাচ্ছিলি কুড়ি হাজার টাকা। এখন কী করবি? ফালতু সেন্টি হয়ে যাস কেন বল তো? কেন ছাড়লি চাকরি?'

রাজুদার কথায় কিছু মনে করে না আদিত। রাজুদাকে ও নিজের দাদার মতোই দেখে! এই যে ও রাজনীতি করে সেটা তো রাজুদার জন্যই। সেই কলেজ লাইফ থেকে দেখে আসছে পার্টির জন্য রাজুদার কী ডেডিকেশান! আর গত আট বছরে উঠতে উঠতে রাজুদা এখন এম.এল.এ.! ওরা শুনছে সামনের বার নাকি মন্ত্রীও হতে পারে। আজকাল মাঝে মাঝেই রাজুদার ছবি দেখা যায় খবর কাগজে!

বুদ্ধিমান, সৎ আর পরিষ্কার মনের মানুষের খুব দরকার এই দেশের। নিজেরটা গোছানো পাবলিকে চারিদিকটা থিকথিক করছে! তাই রাজুদাকে অনুসরণ করে আদিত। ওর কথা শুনলে আদিতের মনে হয় এখনও কিছুটা হলেও আশা আছে!

এছাড়া রাজুদা মাস শেষে ওকে সাত হাজার টাকা মতো দেয়। কিন্তু ও জানে সেটা যথেষ্ট না। মা তো প্রায়ই বলে, 'এইভাবে সারা জীবন কাটবে? সাতাশ হল। এখনও সিরিয়াস হলি না? হিস্ট্রিতে এম.এ.-এ করলি, সেটা এমন বেকার যাবে!'

আচ্ছা, অনেক টাকা রোজগার করাই বুঝি সিরিয়াসনেস? দেশের কাজ, দশের কাজ করাটা কিছু না? সবার যদি নিজের কথা ভাবে তাহলে দেশের কথা কে ভাববে?

তবে মায়ের উদ্বেগের কারণটা বুঝতে পারে আদিত। বাবার জন্য মাসে হাজার সাত আটেক টাকা খরচ হয়ে যায়। তারওপর ওদের নিজেদের বাড়িটা বন্ধক রাখা আছে অন্যদি সরখেলের কাছে। মাসে মাসে তাকেও হাজার চারেক করে দিতে হয়!

রাজুদার থেকে হাত পেতে টাকা নিতে ইচ্ছে করে না আদিতের। কিন্তু ওর জীবন ওকে এমন একটা জায়গায় নিয়ে এসে ফেলেছে যে বাস্তবটাকে অস্বীকারও করতে পারে না! কিন্তু প্রতিবার হাত পেতে টাকা নেবার সময় একটু একটু করে যেন মরে যায় ও।

রাজুদা বোঝে। ওর দিকে তাকিয়ে হেসে বলে, 'আমার থেকেই তো নিচ্ছিস! তাও সংকোচ? ঠিক আছে একদিন সব উশুল করে নেব!'

'কীরে, তখন থেকে সাইলেন্স মেরে আছিস? কোনও কেস করেছিস নাকি?'

মাকুর কথায় ওর দিকে তাকাল আদিত। ক্লাস ইলেভেন অবধি পড়েছে মাকু। তারপর আর ইচ্ছে করেনি। ও বলে, 'শালা বাবরের ছেলের নাম জেনে আমার কী বলব? রাশিয়ার কোন কয়াল খনিতে কয়লা পাওয়া যায় সেটাই বা জেনে আমি কী ছিঁড়ব? পড়াশুনো হুল ঢপবাজি! ওসবে আমি নেই।'

আদিত ওর সঙ্গে বিশেষ মুখ লাগায় না। জানে লাভ নেই।

মাকুদের বাড়িটা ঢাকুরিয়ায়। ওরা তিন ভাই। মাকু সবার ছোট। কিছুই বিশেষ করে না। তাই ওর বাবা মা আদিতকে বলে রাজুদাকে বলে কোনও কাজে ঢুকিয়ে দিতে।

কিন্তু এসব কথা রাজুদাকে বলে না আদিত! ক্ষমতাবান লোক দেখলেই লোকে হাত বাড়িয়ে ভিক্ষে করা শুরু করে! এসবে গা ঘিনঘিন করে ওর!

তবে কয়েক দিন হল মাকু ওর সঙ্গে আসছে রাজুদার বাড়ি। কিছুই না, এমনিই আসছে। রাজুদা দেখছে সব। কিন্তু এখনও বলছে না কিছু।

আজ রাজুদা বিশেষ দরকারে ডেকেছে আদিতকে। কাল রাতে ফোন করে যখন রাজুদা ওকে যেতে বলছিল, মাকুও সামনে ছিল। ব্যাস পাগলটা চলে এসেছে!

স্টেশান পার করে লর্ডসের মোড়ের দিকের রাস্তাটায় পা বাড়াল আদিত। আর তখনই দেখল লোকটাকে। সেম লম্বা। কাঁচা পাকা কোঁকড়া চুল। টানা বুলপি। চোখে রিমলেস চশমা। গায়ের রঙে কেমন যেন গোলাপী আভা! একটা মেরুন রঙের হুডি আর কারগো প্যান্ট পরে লোকটা নিজের মনে হেঁটে চলে গেল। সপ্তাহ দুয়েক হল লোকটাকে দেখছে আদিত। এমন লম্বা, সুন্দর দেখতে একটা লোক রাস্তা দিয়ে গেলে চোখে তো পড়বেই! কত বয়স হবে লোকটার! পঁয়তাল্লিশ ছেচল্লিশ! লোকটার হেঁটে যাওয়া দেখলে অদ্ভুত লাগে আদিতের। ওর মনে হয় লোকটা যেন এখানে থেকেও এখানে নেই!

মাকু চাপা গলায় বলল, 'শালা বিলিতি মাল খাওয়া চেহারা। দেখেছিস, কেমন লাল্টুস মাছে? বিলিতি পেট্রোলে এসব গাড়ি চলে?'

মাকু মদ খায়। এটা পছন্দ করে না আদিত। কিন্তু একটা সীমার পরে তো আর অন্যের ব্যাপারে কথা বলা যায় না। তাই কিছু বলে না।

মাকু আবার বলল, 'বাংলা খেয়ে খেয়ে জিভের সেন্স হারিয়ে যাচ্ছে। একদিন আমিও বিলিতি খাব।'

আদিত বলল, 'তোর সেন্স কি ছিল কোনওদিন?'

মাকু হাসল, 'আমার প্রচুর সেন্স! একদিন বুঝতে পারবি।'

দূর থেকে রাজুদার বাড়িটা দেখতে পেল আদিত। এই সকাল নটাতেও লোকজন দাঁড়িয়ে আছে সামনে। সব মোসাহেব আর ধান্দাবাজের দল! দেখলেই শরীর জ্বলে যায় ওর! তাদের মধ্যে রাজুদাকেও দেখতে পেল ও। জান-টান সেজে পাট-পাট করে আঁচড়ানো চুল। পরণে পাজামা পাঞ্জাবী আর হাত-কাটা কোট!

আরে, রাজুদা যে বলল থাকবে সকালে! তাহলে এখন আবার কোথায় বেরচ্ছে! ও কি দেরি করে ফেলল!

মাকু বলল, 'ওই তো রাজুদা জার্সি পরে রেডি!'

'জার্সি?' আদিত ভুরু কুঁচকে তাকাল মাকুর দিকে।

'ম্যাক্সিমাম নেতারাই দেখি এমন জামা কাপড় পরে! আমার তো মনে হয় পলিটিক্স করলে এই জার্সিটা পরতে হয়! কোনওদিন থ্রি কোয়ার্টার প্যান্ট আর কোটেশান লেখা টি-শার্ট পরা কোনও নেতাকে দেখেছিস কাজে যাচ্ছে?'

আদিত বিরক্ত হয়ে বলল, 'তুই এইসব ভাট বকা বন্ধ করবি? রাজুদার সামনে একটাও ফালতু কথা বলবি না কিন্তু?'

মাকু হিহি করে লালচে দাঁত দেখিয়ে হেসে বলল, 'আলিয়া ভাট-ই একমাত্র সত্যিক ভাট, নারে?'

রাজুদা দূর থেকে আদিতকে দেখে নিজেই স্তাবকদের জটলার ব্যূহ ভেঙে বেরিয়ে এল। তারপর চোখের ইশারায় আদিতকে একা আসতে বলল এক কোণায়।

মাকু ওসব ইশারা-টিশারা বোঝে না। বুঝতেও চায় না। আদিতের পেছন পেছন ও নিজেও এগোল।

রাজুদা বিরক্ত হয়ে বলল, 'তুই আসছিস কেন? তোকে ডেকেছি?'

মাকু থতমত খেয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল, 'ও প্রাইভেট কথা? কোনও কেস-ফেস হয়েছে নাকি?'

আদিত মাকুর দিকে কড়া চোখে তাকিয়ে রাজুদার সঙ্গে রাস্তার এক পাশে সরে গেল।

রাজুদা নিচু গলায় বলল, 'শোন, একটা ঝামেলা হয়েছে আমাদের দলেরই মধ্যে। সেই জন্য হাই কম্যান্ড থেকে ডেকে পাঠিয়েছে আমায়। তোর সঙ্গে ডিটেলে তাই কথা বলতে পারছি না। শুধু এটুকু বলছি, আমার কলটিটিউয়েন্সিতে একটা ঝামেলা হয়েছে। রাবার ফ্যাক্টরি আছে একটা। সেখানে দু মাস হল মাইনে দিচ্ছে না ওরা! লেবাররেরা সেই নিয়ে কদিন হল একটা গোলমাল চলছে। তুই ওখানে যাবি। ইউনিয়ান লোকদের সঙ্গে কথা বলবি। মালিক পক্ষের সঙ্গেও পারলে কথা বলবি আমার নাম করে। তবে নিজে ডিসিশান নিবি না! যা হবে আমায় জানাবি! দেখবি অপোজিশান যেন কোনও সুবিধে না করতে

পারে। ওরা তো স্টাইকের ভান করে মালিকের থেকে টাকা খেয়ে নেবে। সেটা আমরা হতে দিতে পারি না। গরীবদের দিকটা আমাদের দেখতে হবে, তাই না?'

আদিত মাথা নাড়ল। একদিম খাঁটি কথা। গরীবের দিক ওরা না দেখলে কে দেখবে? এই জন্য রাজুদাকে ওর এত ভাল লাগে!

রাজুদা বলল, 'আর শোন, বিলুর থেকে কিছু টাকা নিয়ে যাস। ওখানে লাগতে পারে।'

বিলু রাজুদার সেক্রেটারি গোছের। সিড়িঙের ধরনের চেহারা। লোকটাকে সুবিধের লাগে না আদিতের।

ও বলল, 'রাজুদা, ওই লোকগুলোর রেশন কার্ডটা তো...'

'হবে হবে,' রাজুদা পিঠ চাপড়ে দিল আদিত, 'তুই ওদের কথা দিয়েছিলি। ওরা আমাদের ভোট দিয়ে রাখালিয়া পৌরসভায় জিততে সাহায্য করেছে। আমি তো ভুলিনি। চেয়ারম্যান অমলবাবুকে আমি বলে দেব। উনি ফর্মে সই করে দেবেন। ভাবিস না!'

'হয়ে যাবে তো?' আদিত আবার জিজ্ঞেস করল।

রাজুদা চলে যেতে গিয়েও ঘুরে দাঁড়াল, 'আমি বলছি তো! ভরসা করিস না আর আজকাল!'

'না না...' আদিতর খারাপ লাগল।

রাজুদা ওর কাঁধে হাত দিয়ে বলল, 'তুই রাবার ফ্যাক্টরিটায় যা। ওটা ইমপরট্যান্ট খুব। দেড় হাজার মানুষ কাজ করে। ওটা নিয়ে ভাব। জানবি সামনের বছর রাজ্যসভা নির্বাচন, আমি চাই না আমাদের অসুবিধে হোক, বুঝলি?'

আদিত কিছু বলার আগেই দেখল, সেই লম্বা লোকটা একটা জলপাই রঙের সাইড কার লাগানো মোটর বাইক করে সারা পাড়া কাঁপিয়ে বেরিয়ে গেল সামনের রাস্তা দিয়ে।

ও শুনল মাকু বলছে, 'শালা, আমি একদিন বিলিতি পেট্রোল খাবই!'

## ॥ ২ ॥

## নিরমুক্তা

ক্যাপসিউল এলিভেটারের ভেতর দিয়ে অন্ধকার নেমে আসা শহরটার দিকে তাকাল মুকু। ডিসেম্বরে এবার ঠান্ডা পড়েছে বেশ। মুকুর ঠান্ডা একটু বেশি। আর এখন মূলত দক্ষিণ ভারতে থাকে বলেই হয়ত একটু শীত পড়লেই ওর বেশি ঠান্ডা লাগে!

ডিক্রগড় থেকে অফিসের কাজ সেরে ও কলকাতায় এসেছে আজ। ওদিকে তো আরও ঠান্ডা! ফ্লাইট সেট ছিল তাই এয়ারপোর্ট থেকে বেরিয়ে হোটেলে আসতে আসতে অন্ধকার হয়ে গেছে।

রাতের কলকাতাকে এখন এল.ই.ডি. লাইটে সাজানো বিয়ে বাড়ি মনে হচ্ছে!

ঘড়িটা দেখল একবার মুকু। সাড়ে আটটা বাজে। প্লেনে আসার সময় খাবার নেয়নি। কিন্তু এখন খিদে পাচ্ছে। ও ভাবল ঘরে গিয়ে ফ্রেশ হয়ে রুম সার্ভিসে বলে কিছু খাবার নিয়ে নেবে।

এখন ওর ছুটি। গত দু বছর ছুটি নেয়নি ও। তাই দু সপ্তাহ ছুটি পেতে অসুবিধে হয়নি। ওর বস, রভি গুপ্তা খুব রিজনেবল মানুষ! পরপর দুটো বড় কাজ ওরা পেয়েছে। সব মিলিয়ে প্রায় যাট কোটি টাকা। আর দুটোতেই মুকুর খুব ভাল পারফরম্যান্স!

রভি তো আজ সকালে ফোন করে বলেছিল, 'নিরমুক্তা, ইউ হ্যাভ ডান অ্যা গ্রেট জব। নাও এনজয় ইওর লিভ। আফটার দ্যাট কাম টু আস উইথ রিনিউড জিল! তোমাকে টেক্সাস যেতে হবে সামনের জ্যানিউয়ারিতে! বাট আই ডোন্ট নো হোয়াই ইউ আর স্পেন্ডিং ইউর হলিডেজ ইন কলকাতা! বাট, ঈক কাছে। আমার হয়ে ফুচকা খেও কয়েকটা বেশি। হ্যাভ ফান। বাই!'

রভির বয়স প্রায় পঞ্চাশ। কড়া বস, কিন্তু মানুষটা ভাল। স্কুল জীবন কলকাতায় কাটিয়েছে বলে বাংলা ভালই বলে। আর কলকাতার খাবারের খুব ভক্ত! বলে, 'সারা পৃথিবীতে এমন অ্যাসর্টেড ফুড আর কোথাও পাওয়া যায় না! বিশেষ করে ফুচকা! ইট ইজ অরগ্যাস্মিক গুড!'

কথাটা মনে পড়াতে হাসি পেল মুকুর। আর সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে গেল প্রিতমের কথা।

প্রিতম সুর। বিদেশী ব্যাঙ্কের বড় পদে আছে। বেঙ্গালুরুতেই থাকে। তবে বেশিরভাগ সময় লন্ডন টোকিও সিডনি আর নিউ ইয়র্ক করে বেড়ায়। এখন যেমন ও আছে সিঙ্গাপুরে! তবে যেখানেই থাকুক না কেন দিনে একবার ও ফোন করবেই মুকুকে।

প্রিতমের বয়স বেয়াল্লিশ। যদিও মাথার চুল বেশিরভাগ পেকে গিয়েছে। তাই বয়সের চেয়ে বেশ কিছুটা বুড়ো লাগে ওকে। প্রিতম বুদ্ধিমান, কেয়ারিং আর লয়াল!

ওর প্রথম বিয়েটা টেঁকেনি। সেই বিয়ের থেকে একটা ছেলে আছে ওর। সেই স্ত্রী আর ছেলে থাকে অস্ট্রেলিয়ায়। বছরে একবার ছেলের সঙ্গে দেখা করতে ওখানে যায় প্রিতম!

ছেলেকে খুব ভালবাসে ও। কিন্তু তাও ছেলের কাস্টডি নিয়ে লড়াই করেনি! কারণ ওর মতে, 'সুমিতার কাছে থাকলে ঋষি অনেক ভাল থাকবে!'

একটা পার্টিতে গত বছর প্রিতমের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল মুকু।

নিরমুক্তা নামটা শুনে বেশ চমকে গিয়েছিল প্রিতম। বলেছিল, 'নিরমুক্তা? অদ্ভুত নাম তো? কী মানে এর?'

মুকুর এই একটা জিনিস ভাল লাগে না। ছোট থেকেই দেখছে সবাই ওর নাম শুনলে এর মানে জানতে চায়।

তাও ও সামান্য হেসে বলেছিল, 'ফ্রি ফ্রম বন্ডেজ!'

'ও!' প্রিতম হেসেছিল, 'ফ্রি? টুলি?'

মুকু বলেছিল, 'নো বডি ইজ টুলি ফ্রি!'

সেই প্রথম আলাপ। মুকু একটু এড়িয়েই গিয়েছিল ওই কথাটুকুর পরে। কিন্তু বুঝতে পারছিল ও যেখানেই যাচ্ছে এক জোড়া চোখ ওকে ঠিক খুঁজে বেড়াচ্ছে ওই বড় ব্যাঙ্কোয়েটের মধ্যে!

তার ঠিক দুদিন পরে একটা ফোন পেয়েছিল মুকু। অফিসেই ছিল তখন। অজানা নাম্বার দেখে সামান্য ইতঃস্তত করেছিল ও প্রথমে। তারপর ধরেছিল ফোনটা।

প্রিতম বলেছিল, 'ইটস মি, প্রিতম। রিমেম্বার?'

'প্রিতম?' সামান্য সময় নিয়েছিল মুকু। আসলে সত্যি চট করে বুঝতে পারেনি!

'আরে আমি প্রিতম সুর। দ্যাট গাই উইথ প্রিম্যাচিওর হোয়াইট মেন! মনে পড়েছে, ফ্রি ফ্রম বন্ডেজ মানুষ?'

'ও আপনি!' অবাক হয়েছিল মুকু, 'কিন্তু আমার নাম্বার কী করে পেলেন!'

'ইচ্ছে থাকলে উপায় হয়!'

'তা ইচ্ছেটাই বা হল কেন শুনি?' মুকু হেসেছিল সামান্য।

প্রিতম সময় নিয়েছিল সামান্য, তারপর বলেছিল, 'আমার তো বন্ডেজ ভাল লাগে। তাই...'

দুদিন পরে ডিনারে দেখা করেছিল ওরা। দেখা হওয়ার আধ ঘন্টার মধ্যে নিজের সম্বন্ধে সব বলে দিয়েছিল প্রিতম! কী করে, কোথায় থাকে। আগের বিয়েটা ভাঙল কেন। সব।

খুব অবাক হয়ে গিয়েছিল মুকু। এমন একটা বড় পোস্টে চাকরি করে একজন সে এমন টিনএজারদের মতো হয় কী করে!

মুকু সব শুনে সামান্য হেসে বলেছিল, 'ইউ আর রানিং টু ফাস্ট, নো?'

প্রিতম সামনে রাখা হুউস্কিতে সামান্য চুমুক দিয়ে বলেছিল, 'আমার অনেক সময় নষ্ট হয়েছে। আর টাইম নষ্ট করতে চাই না।'

'মানে?' মুকু অবাক হয়েছিল খুব।

'মানে আমার আপনাকে ভাল লেগেছে খুব। আমি আপনার সম্বন্ধে খবর নিয়েছিলাম তাই। তাই... মানে...'

'একদিন দেখেই ভাল লেগে গেল?' অবাক হয়েছিল মুকু।

প্রিতম হেসে বলেছিল, 'হোয়াই পিপল হ্যাভ প্রবলেম উইথ দিস আই ডোন্ট নো। ভাল লাগার কোনও ফর্মুলা হয় নাকি? এতদিন, এত ঘন্টা দেখার পর ভাললাগা আসবে! তার আগে আসা বারণ। আরে সারা জীবন এক সঙ্গে থেকেও যেমন প্রেম তিরিশ হয় না, তেমন এক মিনিট দেখেও তো ভাল লাগতে পারে! মানুষ সব কিছু কেন নিয়মে বাঁধতে চায় কে জানে?'

মুকু থেমেছিল একটু। তারপর বলেছিল, 'আপনি আমার পাস্ট জানেন তো?'

প্রিতম আবার চুমুক দিয়েছিল গ্লাসে। সামনে রাখা একটা মাংসের টুকরো তুলে তাতে সস মাখিয়ে সসয় নিয়ে কামড় দিয়েছিল। তারপর ওই অবস্থাতেই বলেছিল, 'আপনি দিল্লীর মেয়ে। ইঞ্জিনিয়ারিং করে এনভায়রনমেন্টাল ম্যানেজমেন্ট পড়েছেন। আঠাশে বিয়ে করেছিলেন। লাস্ট তিন বছর আগে ডিভোর্স হয়। এখন বেঙ্গালুরুতেই থাকেন। স্টবেরি আইস্ক্রিম ভালবাসেন। ম্যাঙ্গিমাম ব্লু পড়েন! আর... আর... হ্যারি বেলাফন্টে পছন্দ! পামুকের লেখা ভালবাসেন। আর...'

'ব্যাস ব্যাস,' হাত তুলে আত্মসমর্পণের ভঙ্গী করেছিল মুকু, 'এর পর আর কী কী বলবেন কী জানি! এত করে কথা জানলেন কী করে?'

'আরে,' প্রিতম হেসেছিল, 'আপনি শুনতে পাচ্ছেন না, আমার আপনাকে ভাল লেগেছে। মানে জাস্ট ভাল লাগেনি। আন্ডার লাইনড ভাল লেগেছে! তাই খবর নিয়েছি!'

মুকুর ভাল লেগেছিল। কিন্তু সেটা বুঝতে না দিয়ে বলেছিল, 'আরে আপনি তো ডেঞ্জারাস!'

'ঠিক। আসলে মোসাডে চাকরি করার ইচ্ছে ছিল! কিন্তু এমন কপাল যে ব্যাঙ্কে আটকে গেলাম! শুধু একটা জিনিস!

মুকু নিজেও ছোট ছোট কামড়ে মাংস খাচ্ছিল। শেষের কথাটা শুনে কৌতূহলী হয়ে মুখ তুলে তাকিয়েছিল, 'কী?'

প্রিতম, পরিষ্কার করে কামানো গালে হাত বুলিয়ে বলেছিল, 'একটা জিনিস জানতে পারলাম না। আপনার এক্স এর নাম!'

চট করে এবার মুকু তাকিয়েছিল প্রিতমের দিকে। আর কেন কে জানে বুকের খুব গভীরে, কোথাও ছোট্ট এক কুচি একটা পোকা কামড়ছিল মুকুকে!

প্রিতম হাসতে হাসতে বলেছিল, 'খুব বোকা লোক। নাহলে আপনাকে ছেড়ে দেয়?'

মুকু চোয়াল শক্ত করে মাথা নামিয়ে নিয়েছিল। এক কুচি পোকাটা খুঁড়ছিল ওর বুক। কে কাকে ছেড়েছে, সেটা যদি প্রিতম জানত!

---

'ম্যাম ইওর ফ্লোর!' সামনে দাঁড়ানো স্টুয়ার্ডটির কথায় সম্বিত ফিরল মুকুর। ও লিফটের থেকে বেরিয়ে করিডোরে দাঁড়াল।

লম্বা কার্পেট পাতা করিডোর। সুন্দর করে সাজানো। স্টুয়ার্ড ছেলেটি বড় ট্রলি ব্যাগটা টেনে নিয়ে ওর রুমের সামনে দাঁড়িয়ে কার্ড পাঞ্চ করে দরজা খুলে ঢুকে গেল!

বিশাল বড় আর নামি হোটেল এটা। আরামের কোনও অসুবিধে নেই। ও ঘরে ঢুকেই বুঝল যে রুম হিটার জ্বালানো আছে। কলকাতার এই ঠান্ডাতেও রুম হিটার! হাঁয় পেল মুকুর। ও একটা একশো টাকার নোট বাড়িয়ে দিল ছেলেটির হাতে। ছেলেটি ব্যাগ রেখে মাথা ঝুঁকিয়ে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

হাত ব্যাগটা পাশের টেবলে রেখে বড় সোফাটায় আধশোয়া হয়ে সামান্য চোখ বুজল মুকু। ভাবল, কী করছে ও কলকাতায়?

প্রিতম এখন সিঙ্গাপুরে। ওকে বলেছিল চলে আসতে। দু সপ্তাহ এক সঙ্গে থাকবে। পরদে ইউরোপও ঘুরে আসবে। কী সহজেই চলে যেতে পারত, কিন্তু না গিয়ে ও কলকাতায় এসে বসে আছে। দামি হোটেলে উঠে এক গাদা টাকার গুনাগার দিচ্ছে! কেন করছে ও এসব? কার জন্য করছে? কী পাবে ও এসব করে? সব তো মরে গেছে! শেষ হয়ে গিয়েছে! তাহলে? কেন এখানে এসেছে ও? ওকে দীপন ফোন করল বলেই চলে এল খড়ের গাদায় সূঁচ খুঁজতে?

নাঃ, আর ভাববে না। কী হবে ভেবে? একবার যখন রাজি হয়ে গেছে তখন তো চেষ্টা করতেই হবে!

মুকু উঠে বাথরুমে গেল একবার। সময় নিয়ে ফ্রেশ হল। সারা দিনের ক্লান্তি গরম জলে প্লান করে কাটল কিছুটা। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে খিদেটাও যেন মাথা তুলে দাঁড়াল আবার।

ঘরে এসে সুটকেস খুলে ঢিলে ঢালা একটা ট্র্যাক প্যান্ট আর টি শার্ট বের করে পরে নিল মুকু। তারপর বিছানায় বসে টেলিফোনটা টেনে নিল। ফোনের পাশেই রুম সার্ভিসের নাম্বার দেওয়া আছে। দুটো গার্লিক ব্রেড, স্যালাড আর শ্রেডেড চিকেন বলে দিল।

আজ খেয়ে তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়বে! কাল সকালে উঠে ভাববে কী করা যায়।

বিয়ের পরপর মুকু কলকাতায় এসেছিল ওর সঙ্গে। নানান জায়গায় ঘুরেছিল ওরা। কত চেনাশুনো ছিল ওর! খুব সামান্য প্রাক্তিক মানুষ থেকে সমাজের উপরতলার মানুষ! সবার সঙ্গে কী করে এমন বন্ধুর মতো মেশে একটা লোক! মুকুর অবাক লাগত খুব। ভালও লাগত!

তারপর দশ বছর কোথা দিয়ে যে বেরিয়ে গেল! সব উল্টোপাল্টা হয়ে গেল কেমন! এত বছর পরে এই শহরে এসে এখন কেমন অচেনা লাগছে সবকিছু। এত বড় বাড়ি! এত ফ্লাইওভার! এত মানুষ! কেমন একটা তিরতিরে ভয়ে কাঁপছে যেন বুক! এর মধ্যে কী করে ওকে খুঁজে পাবে?

আচমকা মোবাইলটা বেজে উঠল। এখন আবার কে কল করছে? মা নাকি? আজ সারাদিন মাকে ফোন করা হয়নি। বাবা মারা যাওয়ার পর থেকে মা ছোট ভাই আর ভাইয়ের বউয়ের সঙ্গেই থাকে লক্ষ্ণৌয়ে।

দ্রুত মোবাইলটা তুলল মুকু। না দেখল কৃতি ফোন করেছে।

কৃতি ওদের কোম্পানিতেই আছে। ওর কোলিগ। ভাল বন্ধুও। খুব আপ রাইট মেয়ে। সোজা কথা সোজা ভাবে বলে দেয়।

'বল,' ফোনটা কানে লাগিয়ে মুকু বালিশে হেলান দিয়ে বসল।

'রিচড সেফলি না?'

'টু সেফলি!' হাসল মুকু।

'একটা হোয়াটসঅ্যাপ তো করতে পারতিস! যাই হোক। ব্যাস রিল্যাক্স কর। স্টিফ ড্রিঙ্ক নে। একটা ভাল এসকর্ট ছেলেকে ডেকে নে। হ্যাভ কাপল অব নাইস হার্ড ফাক! দেন ক্লিপ টিল নুন!'

'খালি আজেবাজে কথা! মুকু হাসল। কৃতি এমনই। ভুলভাল কথা লেগেই আছে ওর মুখে!

'নাতো কী?' আমি কোম্পানির কাজে গিয়ে রেক পেলে তো তাই করি! মাউথ অ্যান্ড ভ্যাজাইনা, বোথ হ্যাভ নিডস ইয়ার! যা বলছি শোন। তোর বেয়ারাকে ডাক। ওদের বল। ওরা জোগাড় করে দেবে!'

'আমি ফোন রাখছি!' মুকু হাসতে হাসতে বলল।

'ওকে ওকে,' কৃতি হাসল শব্দ করে, 'বাঙালী শালা! ইউ বঙ আর সো ফাকিং হিপোক্রিট?

'আর তোরা তো সুইডেনে থাকিস!'

কৃতি বলল, 'ভাল কথা বললাম আর তুই... যাক গে, শোন, স্টেস করবি না একদম কিন্তু। ইন দ্যা ফার্স্ট প্লেস এমন একটা কাজে রাজি হলি কেন কে জানে! এক্সেস ব্যাগেজ!

মুকু উত্তর দিতে গিয়েও শুনল টু টু করে একটা আওয়াজ হচ্ছে! ও ফোনটা কানের থেকে সরিয়ে স্ক্রিনটা দেখল। দীপন ফোন করছে।

মুকু বলল, 'শোন না কৃতি, দীপন ইজ কলিং। ওর সঙ্গে কথা সেরে তোকে ফোন করি?'

'একদম না!' কৃতি বলল, 'আমায় আজ আর ফোন করবি না। জয়ন্তের সঙ্গে আজ বেরিয়েছ। ডিঙ্গ, ডিনার, ডগি! আজ পুরো ডি-এর ওপর থাকব! সো ডোন্ট ডিস্টার্ব!

'ইশ্ তোর এই লেম জোকগুলো সো ডেটেড!' মুকু ইচ্ছে করে বলল।

'বেশ হয়েছে। তোর মতো তো নই! সব ছেড়ে বাঁশ নিতে গেছে!' কৃতি নিজের বিরক্তিটা লুকোলো না!

'রাখছি।' হেসে ফোন কেটে দিল মুকু। কিন্তু নামিয়ে রাখার আগেই আবার ফোনটা ঢুকল। দীপন। মুকু দীর্ঘশ্বাস চেপে ধরল ফোনটা।

'বৌদি! দীপন আলতো গলায় জিজ্ঞেস করল, 'তুমি পৌঁছে গেছ?'

বৌদি! এইটা শুনতে ভাল লাগে না মুকুর। কিন্তু কী আর করবে? এই নিয়ে কথা বাড়ালে কথাই বাড়বে। আর পাঁচটা অপ্রয়োজনীয় কথা উঠবে। তাই এই নিয়ে আর জল ঘোলা করে না ও।

'বলো দীপন। আমি হোটেলে।'

'ধ্যাত্ত কিউ বৌদি,' দীপন যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচল। বলল, 'আমি তোমায় একটা হোয়াটসঅ্যাপ করে করে কয়েকটা ঠিকানা পাঠিয়ে দিচ্ছি। মানে সাম্ভাব্য যে কটা জায়গায় থাকতে পারে আর কী! তুমি প্লিজ একটু দেখো!'

'আচ্ছা!' মুকু আবার দীর্ঘশ্বাস চাপল, 'তুমি কিন্তু এখনও বললে না তোমার দাদা কেন এখানে এসেছে! ডোন্ট ইউ থিঙ্ক য়ামার এটা জানা উচিত?'

দীপন বলল, 'আমি বলতে চাই বৌদি। কিন্তু দাদা এটা বারণ করেছিল! কথা দিয়েছিলাম!'

'তোমরা কি মহাভারতের যুগে আছো? কথা দিয়েছিলে মানে কি! মুকু রাগ লুকোল না!

দীপন বলল, 'দাদাকে খুঁজে পেলে তাকেই জিজ্ঞেস কোরো প্লিজ। প্লিজ আমায় এটা জজ্ঞেস কোরো না! তোমার কাছে আমি খুব কৃতজ্ঞ। আমি যদি সুস্থ থাকতাম তোমায় জ্বালাতাম না। কিন্তু জানোই তো আমার কী অবস্থা! তাই তোমায় কষ্ট দিচ্ছি! প্লিজ কিছু মনে কোরো না।'

'তুমি ঠিকানাটা পাঠিয়ে দাও। কেমন? আমি ডিনার করব।' মুকু ছোট করে বলল। বুঝল দীপন বলবে না! কিছুতেই! যেমন দাদা তেমন ভাই! গোঁয়ারদের ফ্যামিলি!

'শিওর শিওর। আমি তোমার ওপর ছাড়া আর কারও ওপর ভরসা করতে পারি না বৌদি! তই তোমায়...' দীপনের গলাটা কেমন যেন বুজে এল কষ্টে, 'যাক গে, ডিনার করে নাও। আমি ঠিকানাগুলো পাঠিয়ে দিচ্ছি। গুড নাইট!'

ফোনটা কেটে মাথা নিচু করে বসল মুকু। নিস্তব্ধ ঘর। ঘড়ির টিকটিক শোনা যাচ্ছে শুধু। ওর মনে হল এই শহরেরই কোথাও আছে সেই লোকটা। সেই লোক যার সঙ্গে দশ বছর আগে এই শহরে এসেছিল ও। মুকু যেন দেখতে পেল ওর দিকে বড় বড় চোখ তুলে তাকিয়ে আছে সে। আর আচমকা কোনও কারণ ছাড়াই চোখে জল চলে এল মুকুর। ও যেন শুনতে পেল, বুকের অনেক অনেক গভীরে পুচকি সেই পোকা এখনও কিটির-কিটির শব্দে কষ্টের সুড়ঙ্গ খুঁড়ে চলেছে একা!

## ॥ ৩ ॥
## স্মাহি

জটাদাদু রোজ গান করে স্টেশানের কোনায় বসে। একটা পেতলের খঞ্জনি বাজিয়ে, এক পায়ে বাঁধা একটা ঘুঙুরে তাল দিতে দিতে জটাদাদু নানান রকম গান করে।

জটাদাদুর পরণে একটা অদ্ভুত আলখাল্লা থাকে। কত রঙের যে তাতে তাপ্পি মারা তার ইয়ত্তা নেই। আর মাথায় একটা বিরাট জটা। তাতে আবার লাল কাপড় বেঁধে রাখে দাদু। গানের তালে তালে সেই জটা নাড়ায়। স্মাহির কী যে ভাল লাগে জটাদাদুর গলা, গান!

আর কেউ যদি ভেবে থাকে জটাদাদু শুধু ভক্তিমূলক গান করে তা কিন্তু নয়! জটাদাদু নানান রকমের গান গায়। এমন কী হিন্দি গানও গায় মাঝে মাঝে।

এই আজই যেমন একটা গান গাইছিল দাদু, 'চাহুঙ্গা ম্যায় তুঝে শাম সবেরে...'!

এমন করে আকাশের দিকে মুখ তুলে গানটা গাইছিল দাদু যে স্মাহির মনে হচ্ছিল কাউকে বোধহয় এই গানের মধ্যে দিয়ে খবর পাঠাতে চাইছিল মানুষটা।

জটাদাদু স্মাহিকে চেনে। প্রতি মাসে স্মাহি দাদুকে তিনশো করে টাকা দেয়। ও জানে এই সামান্য টাকায় কিছু হয় না। কিন্তু স্মাহির যে এর চেয়ে বেশি কিছু দেবার ক্ষমতা নেই! তবে এই টাকাই জটাদাদু এত আনন্দ করে নেয়! স্মাহির মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদের কীসব যেন মন্ত্র বলে! সেসব বোঝে না স্মাহি, কিন্তু ভালবাসাটা বোঝে! এখন, ভালবাসাটা খুব বুঝতে পারে ও!

অন্যদিনের মতো আজও গান শেষ হওয়া অবধি দাঁড়িয়েছিল স্মাহি।

গান শেষ করে মানুষজনের দিয়ে যাওয়া খুচরোগুলো গুছিয়ে তুলতে তুলতে জটাদাদু বলল, 'কীরে, আজ তাড়াতাড়ি?'

স্মাহি হাসল, 'ওই ছুটি হয়ে গেল। আসলে ফ্যাক্টরিতে একটা গোলমাল চলছে। তাই কীসব মিটিং আছে ইউনিয়ানের সঙ্গে মালিক পক্ষের! আমি অ্যাকাউন্টসে আছি। আমার তেমন কাজ নেই! তাই ছেড়ে দিল।'

জটাদাদু হেসে স্টেশানের রেলিঙে পিঠ লাগিয়ে বসে বলল, 'মোরব্বা খাবি? একজন দিয়েছে। দাঁড়া, দিচ্ছি!'

জটাদাদু তাম্রিমারা ঝোলার থেকে একটা প্লাস্টিকের কৌটো বের করে তার থেকে দুটো মোরব্বা বের করল। অন্য কেউ হলে স্টেশানে বসে ভিক্ষে করা এমন একটা মানুষের থেকে কিছু নিতে হয়ত দ্বিধা করত। কিন্তু স্মাহির এমন মনে হয় না। ও হাত বাড়িয়ে মোরব্বা দুটো নিল। তারপর নিজের ব্যাগের সামনের চেন খুলে স্টিলের ছোট টিফিন বাক্স বের করে তাতে ঢুকিয়ে রাখল।

জটাদাদু বলল, 'আর এখানে দাঁড়াস না। বাড়ি যা। আজ তাড়াতাড়ি ফিরেছিস। বাড়ি গিয়ে রেস্ট কর।'

হাসল স্মাহি। রেস্ট! ওর তো সারা জীবনটাই রেস্ট! ওই ছোট্ট এক কামরার ঘরেই তো এখন থমকে আছে ওর জীবনটা। ওই অফিস আর ফিরে এসে ওই ঘর! আর কী আছে!

ও মাঝে মাঝে ভাবে ডুবু না থাকলে ওর কী হত এই জীবনে!

ডুবুর বয়স দু বছর। খুব দুষ্টু ছেলে। সারাক্ষণ ছটফট করে। আদো আদো একটু কথা বলে। আর মাঝে মাঝে মোনি মোনি বলে চিৎকার করে হারমোনিয়ামের ওপর চড়ে বসে!

রিতাদি আর নানুদার ছেলে ডুবু। ওরা পাশের ঘরে ভাড়া থাকে। এই বাড়িটায় ইটের দেওয়াল, মাথায় টালির ছাদ! এখানে দুটো ঘর আছে পাশাপাশি। সামনে টানা একটা বারান্দা। বারান্দার দুদিকে দুটো ছোট্ট ঘেরা জায়গা আছে দুই ঘর ভাড়াটের রান্নার জন্য। স্নানের জায়গা আর ল্যাট্রিন একটাই। দুজনকেই ভাগ করে ব্যবহার করতে হয়।

মাঝে মাঝে বর্ষমানের ওদের বিশাল বাড়িটার কথা মনে পড়ে স্মাহির। কত বড় উঠোন ছিল! কত বিশাল সব ঘর! সেখান থেকে এই এক কামরার ঘরটা কেমন যেন অদ্ভুত! কেমন যেন অন্য একটা গ্রহ বলে মনে হয় স্মাহির!

রিতাদি আর নানুদা ভাল গান করে। কিন্তু সেভাবে কেউ সুযোগ-টুযোগ দেয়নি কোনওদিন। দুজনে বাড়ি থেকে পালিয়ে বিয়ে করেছিল। তারপর একটা দুর্ঘটনায় নানুদার চোখ দুটো চলে যায়। এখন নানুদা আর রিতাদি ট্রেনে ট্রেনে গান গেয়ে বেড়ায়। ছোট একটা সিঙ্গেলাইজার বাজায় নানুদা। আর রিতাদি মাইক ধরে গায়। পোর্টেবল একটা পিপকার গলায় ঝোলে রিতাদির!

রিতাদিরা যখন কাজে বেরয়, ওদের বাড়িওলী দিদার কাছে ডুবু থাকে। মহিলা বয়স্ক। রাগী। কিন্তু মনটা ভাল। দেড় হাজার টাকা ভাড়া নেন ওদের থেকে। স্মাহির মনে হয় এই লেক গার্ডেন্স অঞ্চলে টাকাটা খুব বেশি নয়।

চারিদিকের চকচকে বাড়ি ঘরের ভেতরে এক মুঠো, দু মুঠো করে কয়েকটা ছোট ছোট কলোনির মতো আছে এখানে। নিম্ন মধ্যবিত্ত পাড়া। স্মাহি বোঝে ওর জীবন এখানে এসেই ঠেকেছে!

বাড়িওলী দিদা প্রথমে অবাক হয়েছিল এমন একটা জায়গায় স্মাহি একা থাকবে বলে। কিন্তু যখনই শুনেছে যে মা বাবা নেই, চাকরি না

করে উপায় নেই ওর, তখন আর ওকে ঘর ভাড়া দিতে দ্বিধা করেনি।

বাবা মা মারা যাওয়ার পরে জেঠু জেঠিমার কাছেই তারপর মানুষ হয়েছে স্মাহি। জেঠিমা চিরকালই ওকে বোঝা হিসেবে দেখে এসেছে। কিন্তু জেঠু কী যে ভালবাসত ওকে! এই সব বিষয় নিয়ে কিছু কিছু তারপর যে কী হল! কেন যে ও অমন একটা লোকের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ল! তখন কি অন্ধ হয়ে গিয়েছিল স্মাহি? আর তাই কি পথ হারিয়ে এতটা দূরে এসে ছিটকে পড়ল ও!

আগে পার্ক স্ট্রীটের একটা জায়গায় ভাড়া থাকত স্মাহি। মাস তিনেক হল এখানে এসেছে। আর আসার কিছুদিনের মধ্যেই রিতাদি আর নানুদার সঙ্গে খুব ভাব হয়ে গিয়েছে ওর! তারপর ডুবু! ও বাড়িতে এলেই ডুবু পাশের ঘর থেকে চলে আসে ওর কাছে। গলা ধরে ঝুলে পড়ে। কোলের মধ্যে গুটিয়ে শুয়ে থাকে। আদো আদো গলায় মাহি মাহি করে ডাকে। আর ডুবুকে জড়িয়ে ধরে, ওর পালকের মতো শরীরে নাক ডুবিয়ে দেয় স্মাহি। ছোটবেলার গন্ধ আসে ডুবুর শরীর থেকে। আর কে যেন স্মাহির মনের ছোট্ট পুকুরটায় একটা ঢিল ছোঁড়ে। মনে মনে কেঁপে ওঠে ও। ভাবে, সে থাকলে আজ তারও তো এমন বয়সই হত!

স্টেশান থেকে বেরিয়ে ডান দিকে রাস্তা দিয়ে সোজা এগোল স্মাহি। বাঁদিকের একটা রাস্তা লর্ডস মোড়ের দিকে চলে গিয়েছে। ওই বাঁকের মুখে একটা রিক্সা স্ট্যান্ড আছে। সেই স্ট্যান্ড থেকে ডানদিকে বাঁক নিয়ে সোজা গেলে ওর বাড়ি!

ওই দিকে এগোতে এগোতে আজও আবার ঝানুকে দেখতে পেল স্মাহি। আর সঙ্গে সঙ্গে মুখটা তেতো হয়ে গেল ওর।

ঝানু ছেলেটা এলাকার উঠতি মাস্তান গোছের। শুনেছে বাড়ির দালালি করে। সঙ্গে প্রোমোটারি লাইনেও নাকি নেমেছে।

ছেলেটাকে দেখলেই বিরক্তি লাগে স্মাহির। মনে হয় পায়ের থেকে জুতো খুলে মারে। কয়েকবার তো কড়া ভাবে কথাও বলেছে। কিন্তু তাতে যেন আরও মজা পেয়েছে ঝানু।

কতগুলো রিক্সা দাঁড় করানো আছে স্ট্যান্ডে। তার পাশে একটা মোটর বাইকে বসে আছে ঝানু। সঙ্গে দুটো চামচা গোছের ছেলে দাঁড়িয়ে। ঠান্ডার মধ্যেও ঝানুর পরণে একটা হাফহাতা টাইট, কালো হলুদের ডোরাকাটা গেঞ্জি। সেখান থেকে ভুঁড়িটা ফুটবলের মতো ঝুলে আছে। দু কানে দুটো দুল। মাথার মাঝখানে চুলের ঝুড়ি! চাপা কালো প্যান্ট আর লাল রঙের একটা জুতো।

চোয়াল শক্ত হয়ে গেল স্মাহির। ও মাথা নিচু করে দ্রুত পেরিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করল মোড়টা।

'কী ম্যাডাম, আমায় দেখতে পাচ্ছেন না যে!' ঝানু এসে দাঁড়াল সামনে।

স্মাহি বিরক্ত হয়ে বলল, 'কেন আপনি আমায় ডিস্টার্ব করেন? আমি আপনার কী ক্ষতি করেছি?'

'ডিস্টার্ব? আমি?' ঝানু যেন আকাশ থেকে পড়ল, 'আমি তো আপনার খবরাখবর নিই! আপনাকে দেখলেই বোঝা যায় আপনি ভাল বাড়ির মেয়ে। কেন বেকার হাফ বস্তিতে পড়ে থাকবেন? আমার কষ্ট হয় আপনার জন্য। আমি আপনাকে ভাল বাড়ি দেখে দেব। ফ্ল্যাট। আমার চেনা জানা। টাকা পয়সাও খুব কম লাগবে। তেমন তেমন হলে দিতেও হবে না।'

'তেমন তেমন হলে মানে?' স্মাহি চোয়াল শক্ত করে তাকাল ঝানুর দিকে।

ঝানু গ্যালগ্যাল করে হাসল, 'আপনি আমার স্পেশাল লোক। আপনাকে কেন টাকা দিতে হবে? তাই...'

'প্লিজ, সরুন।' স্মাহি পাশ কাটিয়ে এগিয়ে গেল সামনে।

'ভেবে দেখবেন ম্যাডাম। আমি কিছু দিনের জন্য বাইরে যাচ্ছি! তাই কটা দিন থাকব না। এর মধ্যে ভেবে নেবেন! সবার জন্য ওয়ান টাইম অফার কিন্তু আপনার জন্য লাইফ টাইম!'

বিকেল নত হয়ে আসছে সন্ধের পায়। আশেপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে অনেক মানুষ। কেউ কেউ ফিরেও তাকাচ্ছে ঝানু আর স্মাহির দিকে। তারা বুঝতেও পারছে যে স্মাহিকে বিরক্তি করছে ছেলেটা। কিন্তু কেউ এসে প্রতিবাদ করছে না।

স্মাহি মাথা নিচু করে দ্রুত হাঁটতে লাগল। এ এক অদ্ভুত অবস্থা চলছে চারিদিকে। সারা দেশ জুড়ে লোকজন খেলা, সিনেমা, বই ইত্যাদি সমস্ত কিছু নিয়ে সোশ্যাল সাইটে বক্তব্য রাখছে। গলা ফাটিয়ে ন্যায় নীতি নিয়ে তোলপাড় করে দিচ্ছে চারিদিক। সবাই যেন প্রমাণ করতে নেমেছে কে কত সেনসেটিভ! কে কত মানুষের কথা ভাবে! কিন্তু রোজকার যে অন্যায়গুলোকে রাস্তায় নেমে আটকানো উচিত সেইসব নিয়ে কারও কোনও হুঁশ নেই! একটা মোটামুটি ভারসাম্যে থাকা পৃথিবী কী করে এমন সিলেক্টিভলি ইন্টলারেন্ট পৃথিবী হয়ে গেল বুঝতে পারে না স্মাহি। এই যে ওকে এভাবে রাস্তার মধ্যে এত গুলো মানুষের সামনে এমন করে বিরক্ত করল ঝানু, তা নিয়ে কেউ একবারও কিছু বলল না! কিন্তু স্মাহি জানে এরাই আবার সোশ্যাল মিডিয়ায় ন্যায় নীতি আর ঠিক ভুল নিয়ে খিস্যিস লেখে! কেউ সামনে থেকে দায়িত্ব নেয় না! সবাই মেঘের আড়াল থেকে ফুটো মাস্তানি করতে ব্যস্ত!

কথাটা ভেবেই আচমকা স্মাহির মনে পড়ে গেল দীপকের মুখটা! সেও তো এমন ছিল। আসল সময় কী সুন্দরভাবে পালিয়ে গেল!

আকাশের আলো নিভে গেছে। ডিসেম্বরের এই সময়টায় দিন খুব ছোট হয়ে আসে। কেমন একটা মনখারাপ লাগে স্মাহির! আশেপাশে গাছেদের কাছে ফিরে আসে পাখিরা। কত কিচিরমিচির চলে! বর্ষমানের বাড়িতে ওই বারান্দা জোড়া পাখির বিশাল বড় খাঁচাটার কথা মনে পড়ে ওর! কাজ না থাকলে স্মাহি ওই পাখির খাঁচা ধরে দাঁড়িয়ে থাকত। কী ভাল লাগত! মাঝে মাঝে ওর পাশে আরেকজনও এসে দাঁড়াত। তবে পাখি নয়, সে তাকিয়ে দেখত ওকেই। বুঝত স্মাহি। সবটাই বুঝত ও। কিন্তু কিছু বলত না। কেন বলবে! ওর তো দীপককে পছন্দ ছিল! দীপক মানে আসলে দীপককাকু। এর চেয়ে বাইশ বছরের বড়। কিন্তু একা নিভৃতে ওকে তো দীপক বলেই ডাকত! তাই আর কোনও দিকে মন দেয়নি স্মাহি! শোনেওনি কারও কথা! তাইতো ওকেও ফিরিয়ে দিয়েছিল! বলেছিল, 'দূরে থাকবে, তুমি দূরে থাকবে আমার থেকে। বুঝেছ?'

বাড়ির সামনে এসে থমকে দাঁড়াল স্মাহি। সামনের গেটটা লোহার। তাতের টিনের পাত লাগানো। দরজাটার এক পাশে ইয়েল লক আছে। বাইরে থেকে টেনে দিলে বন্ধ হয়ে যায়। ওদের কাছে চাবি থাকে। যে যার মতো চাবি খুলে ঢুকে পড়ে।

অন্যদিন দরজাটা বন্ধই থাকে। কিন্তু আজ খোলা! সামান্য ভয় লাগল স্মাহির! না, ওর তেমন কিছু নেই খবে। তাও যেঁটকু যা আছে তাও যদি চলে যায়! পনেরো হাজার টাকা মাইনে পায় ও। একার পক্ষে ঠিকই আছে। তাও সেটা তো আর অনেক টাকা নয়। সেসব দিয়ে আস্তে আস্তে জিনিসপত্র কেনে ও। জীবন গোছায়। এই যেমন গত মাসে যেমন একটা ল্যাপটপ কিনেছে টাকা জমিয়ে। সেটা যদি চুরি হয়ে যায়!

স্মাহি দ্রুত আধখোলা দরজা ঠেলে বাড়ির ভেতরে ঢুকল। সামনে একটা শ্যাওলা রাঙানো উঠোন। সেটা পার করে এক দিকে ওদের ঘর।

সাবধানে সেই উঠোনটা পার করে নিজের ঘরের দিকে এগোল স্মাহি। আর তখনই দেখল রিতাদির ঘরের থেকে হাসি ভেসে আসছে!

কারা এল ওদের ঘরে! অবাক হল স্মাহি। তেমন তো কেউ আসে না! তাহলে? কিন্তু এই কৌতূহল ভাল না। কেউ তো আসতেই পারে। ওর সঙ্গে রিতাদিদের সম্পর্ক ভাল বলেই তো আর রিতাদিদের সব জানে না ও।

নিজের ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে ও চাবি দিয়ে দরজাটা খুলল। আর তার আওয়াজেই রিতাদি বেরিয়ে এল পাশের ঘর থেকে।

'ও স্মাহি তুই এসেছিস? খুব ভাল হয়েছে। একটা হেল্প করে দিবি বোন?'

'হেল্প?' স্মাহি অবাক হল। রিতাদি হাসছে। মুখ ঝলমল করছে।

'জানি তুই অফিস থেকে আসছিস! তাও... সামনের দোকান থেকে চারটে সিঙারা এনে দিবি? একজন এসেছে! আয় তোকে আলাপ করিয়ে দিই!'

স্মাহি কিছু বলার আগেই রিতাদি ওকে টেনে নিয়ে গেল পাশের ঘরে। স্মাহি দেখল একটা ছেলে বসে রয়েছে ঘরের মধ্যে। ফিটফাট জামা কাপড়। পেতে আঁচড়ানো চুল। চোখটা কটা।

রিতাদি বলল, 'মকরন্দবাবু এই যে স্মাহি। আমার বোন।'

মকরন্দ হেসে হাত জোড় করল। স্মাহিও হাসল। দেখল, ছেলেটার দাঁতগুলো লালচে!

রিতাদি আড়ালে ওর হাতে একটা একশো টাকার নোট গুঁজে দিয়ে বলল, 'যা তাহলে। নিয়ে আয়। আর চারটে না, আটটা আনিস। তারপর বলছি সব কথা!'

স্মাহি মাথা নেড়ে কাঁধের ব্যাগ আর হাতের তালা চাবি রিতাদিকে দিয়ে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

মিষ্টির দোকানটা ছোট। বাড়ির কাছে। সকালে কচুরি ছোলার ডাল করে আর সন্ধেবেলা সিঙারা। অন্যদিন ভিড় থাকলেও আজ ফাঁকাই আছে দোকানটা। দোকানি বুড়োটা ঝিমোচ্ছে এই অসময়ে! মুখটা হাঁ হয়ে নীচের চোয়ালটা সামান্য ঝুলে আছে। এই লোকটা খুব খিচিখিচে। সারাক্ষণ পুরনো ডিসি পাখার মতো কিচিকি করেই যায়!

স্মাহি হাত বাড়িয়ে বলল, 'আমায় আটটা সিঙারা দিন!'

লোকটা ঘোলাটে চোখ মেলে তাকাল। তারপর বলল, 'আটটার দাম বত্রিশ টাকা। সেখানে একশো নাচাচ্ছ? আমার কী খুচরোর আড়ত আছে?'

স্মাহির মাথা গরম হয়ে গেল। আবার অসভ্যতা শুরু করেছে লোকটা!

ও বলল, 'আমার কাছে খুচরো নেই। আপনি দিন। আমি এনে দিচ্ছি। ওই সামনের বাড়িটায় আমি থাকি!'

'বাকিতে? ধার বাকি আমি রাখি না! সব চোরের দল চারিদিকে! হবে না যাও!'

'আরে!' স্মাহি বলল, 'আপনি এভাবে কথা বলছেন কেন? আমি তো টাকা দিচ্ছি?'

'টাকার গরম না খুব?' লোকটা খেঁকিয়ে উঠল।

স্মাহি চোয়াল শক্ত করল। কেউ কেউ এমন হয়। অগৌক্তিকভাবে অসভ্যতা করে যায়। কিন্তু এদের কীভাবে সামলাবে সেটা বুঝতে পারে না ও। ওর রাগে হাত পা কাঁপছে। কিন্তু কোনও কথা বেরচ্ছে না মুখ দিয়ে।

'এই নিন একশো টাকার খুচরো! এবার ওকে দিন যা চাইছে!'

আচমকা পেছন থেকে শব্দ আসা কথাটা শুনে বেশ ঘাবড়ে গেল স্মাহি। মুখ ঘুরিয়ে দেখল একটা লম্বা মতো লোক দাঁড়িয়ে আছে। এই দোকানের সামান্য আলোতেও বোঝা যাচ্ছে লোকটা খুব ফর্সা! কাঁচা-পাকা চুল। লম্বা ঝুলপি। নিঁখুত ভাবে দাড়ি গোঁফ কামানো। আর কী সুন্দর একটা গন্ধ আসছে লোকটার জামা থেকে!

দোকানিটা থতমত খেয়ে গিয়েছে। স্মাহি প্রাথমিক জড়তা কাটিয়ে হাসল। হাতের একশো টাকার নোটটা বাড়িয়ে দিল লোকটার দিকে। অস্ফুটে বলল, 'আপনি শুধু শুধু...'

লোকটা গভীর গলায় বলল, 'ছোটবেলায় কী পড়েছিলাম মনে নেই? সকলের তরে সকলে আমরা, প্রত্যেকে আমরা পরের তরে! মনে নেই? ঠিক কাজ কখনও শুধু শুধু হয় না!'

স্মাহি হাসল। কিন্তু আর কিছু বলার আগেই দেখল লোকটা অন্ধকারে ডুবে ভেসে মিলিয়ে যাচ্ছে ওদের গলির শেষে!

আর ওর আচমকা মনে পড়ে গেল সেই একজনের কথা! সেও এমন বলত না! মানুষের জন্য কাজ করার কথা বলত না! তাকে কোথায় যে হারিয়ে ফেলল স্মাহি! তখন যার কথা মনে নিত না, এখন এক ভাঙাচোরা পৃথিবীর নানান গলি ঘুঁজি ঘুরে বুঝতে পারছে সেই মানুষটাই ঠিক ছিল! ওর জন্য একদম ঠিক ছিল!

আবছায়া গলিতে দাঁড়িয়ে পাখির খাঁচার পাশে এসে দাঁড়ানো সেই ছেলেটার জন্য আচমকা চোখে জল এল স্মাহির! সেই শেষ দিনের মতো যেন আবার দেখতে পেল মাথা নামিয়ে, নরম আলোছায়া মোড়া গলি দিয়ে আস্তে আস্তে মিলিয়ে যাচ্ছে সে!

## ॥ ৪ ॥

### ঋত্বিজ

আজ বৃষ্টি পড়ছে খুব। চারিদিক অন্ধকার করে বৃষ্টি পড়ছে খুব। কালো, গোল্লা পাকানো মেঘ ঝুঁকে এসে ছুঁয়ে দিচ্ছে কৃষ্ণচূড়া গাছেদের মাথা। ভেজা কাক সার দিয়ে বসে আছে ভাঙা বিল বোর্ড জুড়ে। রাস্তায় জমে থাকা জল ছিটিয়ে হুশ করে চলে যাচ্ছে গাড়ি! আর এই সবের মধ্যে দিয়ে লোকটা হাঁটছে। নীল একটা ওয়াটারপ্রুফ পড়ে মাথা নিচু করে হাঁটছে। এই লোকটাই কি সে, যাকে ও খুঁজছে! সেই কি আজ আচমকা এসে ধরা দিল সামনে? এমন এক বৃষ্টির দিনে সেই কি ওভাবে হেঁটে যাচ্ছে? দ্রুত এগোল তিজু। লোকটা ক্রমশ যেন মিলিয়ে যাচ্ছে। আর অনেক অনেক মেঘ কী করে যেন নেমে আসছে মাটির কাছাকাছি। নীল ওয়াটারপ্রুফ যেন আরও ডুবে যাচ্ছে মেঘের মধ্যে! তিজু হাঁচার গতি বাড়াল। লোকটা ক্রমশ আবছা হয়ে আসছে আরও। যেন ঘষা কাচের ওপাড়ের কাল্পনিক কোনও মানুষ! তিজু জোরে দৌড় শুরু করল এবার। পিছল ফুটপাথ দিয়ে দ্রুত এগোল সামনে। বৃষ্টিটা বাড়ল আরও! আরও সূঁচের মতো এসে বিঁধল ওর মুখে, শরীরে। তবু থামল না তিজু! ওই মিলিয়ে যাচ্ছে নীল বর্ষাতি! মিলিয়ে যাচ্ছে ওর জীবন থেকে! মেঘ, আরও মেঘ এসে ঢেকে দিচ্ছে মানুষটাকে! তিজু আরও গতি বাড়াল। দ্রুত মেঘ ভেদ করে এগোতে লাগল। আরও আবছা হয়ে এল সামনের মানুষটা। তিজু প্রাণপণে এগোল মেঘের তুলো সরিয়ে। আর তারপর চিৎকার করে উঠল, 'দাঁড়াও!

ধড়ফড় করে ঘুম থেকে উঠে বসল তিজু! সারা শরীর ঘেমে গিয়েছে ওর। মাথাটা কেমন করছে! কী হল এটা? কী দেখল ও! সামনে পেয়েও কি ধরতে পারল না মানুষটাকে?

বিছানায় বসে কিছুটা সময় দিল ও নিজেকে। এমন জীবন্ত একটা স্বপ্ন হতে পারে!

মাথা নিচু করে কিছুক্ষণ বসে রইল তিজু। তারপর পাশ ফিরে ঘড়িটা দেখল। সাড়ে পাঁচটা বাজে। বালিশের পাশে একটা বই উপুড় করে রাখা। দুপুরে খাবার পরে পড়ছিল। আর কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছে বুঝতে পারেনি!

এমন করে বিকেলে ঘুমোনোর অভ্যেস নেই তিজুর। ও গায়ের থেকে পাতলা চাদরটা সরিয়ে উঠে দাঁড়াল। মাথার থেকে কিছুতেই ওই ছবিটা যাচ্ছে না। একটা লোক মেঘের মধ্যে ডুবে, হেঁটে, মিলিয়ে যাচ্ছে ওর জীবন থেকে!

তবে কি ও কিছুতেই লোকটাকে খুঁজে পাবে না? এতদিন ধরে কি তবে বৃথাই বসে আছে কলকাতায়?

দশ বছর আগে শেষ ও এসেছিল এই শহরে! তখন কী আনন্দ ছিল ওর মনে! কী ভাল ছিল জীবন! আর তারপর থেকে কী যে হল। সব কেমন ঝরা পাতার মতো ঝরে হারিয়ে গেল জীবনের হেমন্তের পথে! এই চুয়াল্লিশে আসতে আসতে আর কিছুই হাতে পড়ে নেই ওর! তবে তো ওই মানুষটাকে খুঁজে বের করা দরকার! এই জীবনে এখনও যে ওর একটা অস্তিত্ব আছে সেটা ওর নিজের কাছে একবার প্রমাণ করা দরকার!

নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে বাইরে বসার ঘরে এল তিজু। এই ফ্ল্যাটটা ছোট। একটা বেড রুম, একটা ড্রইং কাম ডাইনিং, একটা বাথরুম আর এক চিলতে বারান্দা আছে। ইচ্ছে করেই ও বড় ফ্ল্যাট নেয়নি। দরকার নেই তো! এই লেক গার্ডেন্সের ভেতরে, এক কোণায় ছোট্ট এই ফ্ল্যাটটাই ঠিক আছে। জগন একদম ওর মনের মতো ফ্ল্যাট জোগাড় করে দিয়েছে! ছেলেটা খুব এফিশিয়েন্ট! আর বিশ্বস্ত! এক সঙ্গে এমন দুটো গুণ এখন খুব একটা পাওয়া যায় না!

কলকাতায় এসে কিছুদিন থাকবে বলায় প্রথমে জগন খুব অবাক হয়েছিল। জিজ্ঞেস করেছিল, 'কেন দাদা? হঠাৎ কলকাতায় থাকবেন কেন?'

তিজু বলেছিল, 'কারণ আছে। পারসোনাল। একটা ছোট ফ্ল্যাট জোগাড় করে দিতে হবে তোকে। ভাড়ায়। আর দেখবি কেউ যেন না জানে। আমি কাউকে বলছি না কোথায় থাকব।'

জগন হেসেছিল, 'সে তো কেউ জানবে না। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। তবে একটা ব্যাপার। কোনও লাফড়া হয়নি তো? মানে আর ইউ অ্যাবস্কন্ডিং?'

'তোর মাথা খারাপ? আমি কি ক্রিমিনাল? আমার নিজের একটা কাজ আছে! তাই আই নিড স্পেস! তুই পারবি তো জোগাড় করতে?'

তা জগন পেরেছে। লেক গার্ডেন্সের ভেতরে একদম নির্জন একটা জায়গায় খুঁজে দিয়েছে মাথা গোঁজার জায়গা।

এখানে একজন কাজের দিদিও ঠিক করে দিয়েছে জগন। সে রান্না, বাসন মাজা, ঘর পরিষ্কার করা ইত্যাদি সব কিছু করে দিয়ে যায়।

জগন শুধু জিজ্ঞেস করেছিল, 'খুব পারসোনাল কাজ নাকি দাদা? মানে তেমন হলে আমায় বলতে পারেন।'

তিজু শুধু বলেছিল, 'তেমন হলে বলব।'

জগন আর কথা বাড়ায়নি। চলে গিয়েছিল।

জগন বিহারের মানুষ। কিন্তু এখানে দীর্ঘ দিন থাকার ফলে ভাল বাংলা বলে। জগন বেঁটে। মাথার চুলগুলোয় কেমন একটা লালচে রঙ করা। গাট্টাগোট্টা চেহারা। মোটা গোঁফ! সারাক্ষণ পানমশলা খায়!

জগনের সঙ্গে তিজুর যোগাযোগ বেশ কয়েক বছরের। জগন যে আসলে কী করে সঠিক করে তিজু জানে না। কেউ বলে ও পুলিশের খোড়্‌। কেউ বলে ড্রাগ সাপ্লাই করে। কেউ আবার বলে, জগন আসলে সংসার মায়ে সন্ন্যাসী! কিন্তু আসলটা কী সেটা কেউ বলতে পারে না!

তিজুও সেভাবে জিজ্ঞেস করেনি কোনওদিন! তবে জগন একবার বলেছিল, 'জীবনে তো কম কিছু কাজ করলাম না! শেষে দেখলাম কিছু না করাই সবচেয়ে ভাল! তাই আমি আর কিছু করি না! দেশে জমি আছে। বাবা দাদার টাকা পাঠিয়ে দেয়! ব্যস আমি এখন রিটায়ার্ড'

বত্রিশ বছর বয়সে রিটায়ার্ড! হাসি পায় তিজুর জগনের কথা ভেবে!

তবে সপ্তাহে একদিন করে আসে জগন। এই যেমন গত পরশু সকালেও এসেছিল।

তিজু নিজে কফি করে দিয়েছিল জগনকে। জগন কফির কাপে শব্দ করে চুমুক দিয়ে বলেছিল, 'একা কি করে থাকেন দাদা! মোবাইলও রাখেন না একটা। রাতবিরেতে বিপদ হলে কী যে হবে!'

'আমার কিছু হবে না!' তিজু হেসেছিল।

জগন বলেছিল, 'আপনি একটুও নিজের কথা ভাবেন না! এমন করলে হবে!'

নিজের কথা ভাবে না! সেকি! ওকে তো সারা জীবন সবাই বলে এল ওর মতো স্বার্থপর আর কেউ নেই! ওর মতো নিজের কথা কেউ ভাবে না! সবাই বলে এল, 'এই জন্য তোর সঙ্গে কেউ টিকতে পারবে না! এই জন্য তোর বউ তোকে ছেড়ে চলে গেছে!'

কথাটা মনে পড়তে এখন এই আধো অন্ধকার সন্ধেবেলাতেও কেমন একটা লাগল তিজুর! বসার ঘরের দেওয়ালে ঝোলানো বড় আয়নায় নিজের অস্পষ্ট ছায়া দেখল। লম্বা একটা রাক্ষস যেন! সবাইকে খেয়ে নিয়ে এখন একা হয়ে গিয়েছে!

মাথা ঝাঁকিয়ে নিজেকে ঠিক করার চেষ্টা করল তিজু। তারপর ঘরের আলো জ্বালিয়ে দিল! সন্ধেবেলা আলো জ্বালাতে হয়, মা বলত। তখন এসব মানত না তিজু! কিন্তু এখন মানে! গত দেড় মাস আগে মা মারা গিয়েছে। আর যে মানুষটা জীবিত থাকতে ওর দামালপণাকে সামলাতে পারেনি, সেই মারা যাওয়ার আগে শুধু একটা কথায়, মাত্র একটা বাক্যে পালটে দিয়ে গিয়েছে ওর সারা জীবন!

বেসিনের কল খুলে ভাল করে চোখ মুখ ধুলো তিজু। তারপর পাশে ঝোলানো তোয়ালে দিয়ে মুখটা মুছল। বেশ শীত করছে। ওকে বেরতে হবে। আন্নোয়ার শাহ রোডের কাছে একজনের সঙ্গে দেখা করতে যেতে হবে! ভদ্রলোক নাকি পুরীতে গিয়েছিলেন ঘুরতে। আজ সকালে ফেরার কথা। ওর ওড় ছেলের সঙ্গে দেখা করেছিল তিজু। সেই বলেছে আজ সন্ধেবেলা গেলে দেখা হবে। দেখা যাক তার কাছ থেকে কিছু জানা যায় কীনা!

সামান্য খিদে পেয়েছে। এখন কিছু বানাতে ইচ্ছে করছে না। বাইরে থেকে কিছু না হয় খেয়ে নেবে। ও দেওয়ালের হুক থেকে চাবিটা নিয়ে চারিদিকে দেখল। তারপর একটা জ্যাকেট চাপিয়ে বেরিয়ে এল ঘর থেকে।

ওর ফ্ল্যাটটা চার তলায়। কিন্তু কিছুতেই ও লিফট ব্যবহার করে না। সিঁড়ি দিয়ে ওঠা নামা করতে ওর ভাল লাগে। আজও সিঁড়ি দিয়ে তরতর করে নামতে লাগল তিজু। আর দোতলার বাঁকে দেখা হয়ে গেল নীপার সঙ্গে। এই ভয়টাই পাচ্ছিল তিজু।

'হাই, আজও সিঁড়ি দিয়ে? সিঁড়ির একপাশে বসে সিগারেট খাচ্ছিল নীপা। তিজু ভাবল সামান্য হেসে পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে যাবে।

কিন্তু নীপা খপ করে হাত ধরল ওর, 'নট সো ফাস্ট মিস্টার! অত তাড়া কিসের? কোথায় যাচ্ছ?'

নীপা মেয়েটা অদ্ভুত! বয়স বড় জোর কুড়ি একুশ! কেমন ছেলেদের মতো পোশাক-আশাক করে থাকে। ছোট চুল। সারা গায়ে পাঁচ ছটা ট্যাটু। তিজুর খুব একটা ভাল লাগে না এমন মানুষদের! কেমন প্রিটেন্সিশ লাগে! 'ওয়ারবি' লাগে!

নীপা বলল, 'তুমি আমার কথায় উত্তর দাও না কেন? ইউ থিঙ্ক আয়াম বিনিথ ইউ?'

'না, আয়াম ইন আ হারি! চট করে বলল তিজু।

'ইউ আর অলওয়েজ ইন আ হারি! কেন? আমাদের দেশে সবাই ইন আ হারি! কিন্তু দেখো, তাও কোনও কাজ টাইমে হয় না! কোনও প্রজেক্ট শেষ হয় না। কোনও কমিশন তার রেজাল্ট জানায় না! এই তোমরা মিডিল এজেড মানুষগুলো এমন নকল ব্যস্ততা দেখিয়ে দেশটার সর্বনাশ করলে?

'নীপা, প্লিজ হাত ছাড়ো। আই হ্যাভ টু গো। প্লিজ।' তিজু শান্ত গলায় বলল। কিন্তু ওর বলার মধ্যে এমন একটা দৃঢ়ত্ব ছিল যে নীপা ছেড়ে দিল হাতটা।

তিজু আর সময় নষ্ট না করে নেমে গেল। শুধু শুনল পেছন থেকে নীপা বলছে, 'একদিন দেখো আর ছাড়ব না!'

এখানে আসার চার দিনের মাথায় নীপার সঙ্গে আলাপ হয়েছিল তিজুর। ও আর কারও সঙ্গে কথা বলে না। নিজের মনে থাকতেই বেশি পছন্দ করে। কিন্তু নীপা শোনার মেয়ে না। গায়ের ওপর উঠে আলাপ করেছিল।

এই ফ্ল্যাটের নীচে একটা গারাজ আছে। সেখানেই এক পাশে ওর মোটর বাইকটা রাখে তিজু। অলিভ রঙের রয়্যাল এনফিল্ড মোটর বাইক। সাইডকার লাগানো। জগনের মাধ্যমেই কিনেছে ও।

সাইড কারের মধ্যেই হেলমেটটা রাখে ও। সেটা বের করে মাথায় চাপিয়ে নিল তিজু। তারপর বেরিয়ে গেল।

বাইরে ঠান্ডা আছে বেশ। এখানে গলির মধ্যে রাস্তাগুলো খুব একটা চওড়া নয়। উলটো দিক থেকে কোনও গাড়ি এসে মুশকিল হয়। তিজু দ্রুত বড় রাস্তার দিকে এগোল। ছটা বেজে গিয়েছে। একবার ওই ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা করে একটা সাইবার ক্যাফেতে যাবে। ইমেল চেক করতে হবে। ব্যারি কিছু মেল পাঠিয়েছে কীনা দেখতে হবে! বেচারা রেগে আছে খুব। এখানে মোবাইল, ল্যাপটপ কিছু নিয়ে আসেনি তিজু। ব্যারিকে আগে বলেছিল দিল্লীতে সব সেট আপ করে দেবে ও। কিন্তু এখনও সেভাবে কিছু করে দিতে পারেনি। ব্যারি তো শেষ ইমেলটায় রেগেমেগে অন্য সবার মতো ওকে সেলফিস, মেগালোম্যানিয়াক ইত্যাদি ভারি ভারি গালি দিয়েছে।

অবশ্য তাতে ব্যারিকে দোষ দেয় না তিজু। যে কেউ হলেই দিত। ট্র্যাভেলের ওপর ব্যারিদের যে আন্তর্জাতিক একটা ম্যাগাজিন আছে

তার একটা ব্রাঞ্চ ওরা খুলতে চায় দিল্লীতে।

ওইটাকে কেন্দ্র করে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় ওরা ট্র্যাভেল নিয়ে কাজ করতে চায়। তাছাড়া হিন্দিতেও একটা ট্র্যাভেল বিষয়ক চ্যানেল লঞ্চ করতে চায় ব্যারিরা। সেখানে তিজু সাহায্য করবে বলেছিল। তিজুকে ওরা চ্যানেল হেড করবে ঠিক ছিল। কিন্তু তখনই মা অসুস্থ হয়ে পড়ল। মারা গেল। আর যাওয়ার আগে এমন একটা কথা বলে দিয়ে গেল যে তিজুর এখন সবটাই গোলমাল পাকিয়ে গেছে!

রাস্তাটা এখানে সে দু ভাগ হয়ে গিয়েছে। ডান দিকে একটা বড় ছাতিম গাছ আর বাঁদিকে মাদার ডেয়ারির দুধের ডিপো! তিজু বাঁদিকে মোড় নিল। আর তখনই দেখল মেয়েটাকে। মাথা নামিয়ে কাঁধে একটা ব্যাগ নিয়ে হেঁটে যাচ্ছে। এখানে আলো কম, তাও চিনতে পারল। সেদিন ওই সিঙারার দোকানে দেখেছিল মেয়েটাকে। লোকানি বয়স্ক লোকটা কেমন একটা খিটখিট করছিল! আর মেয়েটা অসহায়ের মতো দাঁড়িয়েছিল।

তিজু দেখেছে অসভ্য, খারাপ মানুষদের সামনে ভাল মানুষেরা কেমন যেন দিশেহারা হয়ে যায়। তাই ও এগিয়ে গিয়েছিল নিজের থেকে। সামান্য একটা একশো টাকার খুচরো! সেটার জন্য কেন কেউ হেনস্থা হবে?

আজকাল রাস্তাঘাটে কাউকে না কাউকে সাহায্য করার চেষ্টা করে তিজু! মানে এক রকম গায়ে পড়েই করে! কেউ কেউ ওকে ভুল বোঝে এতে! কিন্তু তাতে কিছু মনে করে না ও! মানুষ তো এমনই! আসলে খারাপ আর নোংরামো দেখে দেখে আমরা সবাই সেটাকে স্বাভাবিক আর বাস্তব ধরে নিয়েছি। তাই কেউ কারণ ছাড়া যে আমাদের সাহায্য করতে পারে সেটাই ভুলে গিয়েছি আমরা!

তিজু সারা জীবন অন্যের কথা ভাবেনি। শুধু নিজের কষ্ট, নিজে সাফল্য নিয়েই ভেবেছে। তাই তো জীবনের সবচেয়ে প্রিয় মানুষটাও আর নেই!

এখন আশেপাশে সবাইকে সাধ্যমত সাহায্য করার চেষ্টা করে। না, তার পরিবর্তে কিছু চায় না ও। শুধু নিজের ভেতরের আসল স্বত্বিজকে বাঁচাতে চায়। ও এখন বোঝে মানুষের সবার মধ্যেই হয়ত মাঝে মাঝে এমন ইচ্ছে আসে। কিন্তু সেগুলো আমরা ক্ষণিকের দুর্বলতা ভেবে এড়িয়ে যাই। কিন্তু তিজুর মনে হয় আসলে এইসব হল আমাদের 'মানুষ' হয়ে ওঠার কলিং!

লেক গার্ডেন্স স্টেশান থেকে সার্দান এভিউনিয়ের দিকে যেতে একটা পাগলকে বসে থাকতে দেখে তিজু। লোকটা সারাক্ষণ ময়লা কাগজপত্র নিয়ে কিছু লেখে। সেই লোকটাকে একদিন টাকা দিতে গিয়েছিল তিজু।

লোকটা টাকাটা নিয়ে জামার হাতার মধ্যে গুঁজে বলেছিল, 'আর কাগজ কলম? সেটা কে দেবে? আমি না লিখলে তোমাদের কী হবে ভেবেছ? তোমাদের জীবনটা কী করে এগোবে আমি না লিখলে? আমায় কাগজ আর কলম এনে দেবে। মনে থাকে যেন।'

তা দিয়েছে তিজু। পরের দিন দুটো সাদা খাতা আর কয়েকটা পেন্সিল, ইরেজার আর পেন দিয়ে এসেছে।

লোকটা খুশি হয়ে সেসব নিয়ে বলেছিল, 'যাও, এবার তোমার গল্পটা ভাল করে লিখে দেব। চিন্তা কোরো না! সব ঠিক হয়ে যাবে!'

কেন কে জানে তিজু উত্তর দিয়েছিল, 'নাঃ, কিছু ঠিক হবে না!'

লোকটা মাথা তুলে তাকিয়েছিল সটান। তারপর আচমকা বলেছিল –

'All that is gold does not glitter,
Not all those who wander are lost;
The old that is strong does not wither,
Deep roots are not reached by the frost.

From the ashes a fire shall be woken,
A light from the shadows shall spring;
Renewed shall be blade that was broken
The crownless again shall be king.'

কী বলবে বুঝতে না পেরে অবাক হয়ে তাকিয়েছিল তিজু। এ কে!

লোকটা হাসি মুখে বলেছিল, 'যাও এবার, তোমাদের কথা লিখতে দাও আমায়!'

পাগলের ওই খুশিটকুই এখন তিজুর রোজগার। মেয়েটার সেদিনের স্বস্তির নিঃশ্বাসটুকুই ওর ভালোলাগা। ওইটুকুই তো বুঝেছে অন্যের জন্য যদি ও একটুও চিন্তা করত আজ হয়ত এমন একলা আর নিঃসঙ্গ হয়ে যেত না ও এই জীবনটা!

'দাদা!' আচমকা একটা পরিচিত ডাকে মোটর বাইকটা থামাল তিজু। জগনের গলা না!

ও ঘাড় ঘুড়িয়ে দেখল। ঠিক তাই। জগন এখন কী করছে এখানে! 'কী হয়েছে?' বাইক থামিয়ে জিজ্ঞেস করল তিজু।

জগন দৌড়ে এসে দাঁড়াল সামনে। কপালে ওর ঘাম। মোটা শরীরটা শ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে ঢেউয়ের মতো ওঠাপড়া করছে।

'আরে হাঁপাচ্ছিস কেন?' তিজু অবাক হল।

জগন বলল, 'বিশাল খবর। বৌদি এসেছে!'

'মানে?' অবাক হল তিজু। কী বলছে কি জগন!

'দাদা আপনি কেন এমন লুকিয়ে আছেন বলুন তো? কিছু হয়েছে কি? নাহলে... নাহলে নিরমুক্তা বৌদি কেন আপনাকে খুঁজতে আসবে কলকাতায়?'

## ॥ ৫ ॥
## নিরমুক্তা

আত্মীয়স্বজন ব্যাপারাটাকে চিরকাল খুব ভয় লাগে মুকুর। এরা কী শোনে, কী বোঝে আর কী বলে সেটা এরা নিজেরাও জানে না! বিয়ের পরে দেখেছিল তিজুও আত্মীয়দের এড়িয়ে থাকে। ফলে মুকুকে শ্বশুরবাড়ির আত্মীয়দের সামনেও বিশেষ যেতে হয়নি।

এমনিতেই মুকু ছোটবেলা থেকে স্বাধীনচেতা ধরণের। যেটা সত্যি মনে হয় শান্ত গলায় জানিয়ে দেয়! এমন মেয়েদের কে আর পছন্দ করে? ফলে আত্মীয়দের মধ্যে খুব একটা পপুলার নয় মুকু। আর সত্যি বলতে কী ও পুপলার হতেও চায় না। জীবন তো আর পপুলারিটি কনটেস্ট নয়! মিথ্যে করে কাউকে তোষামোদ করা মুকুর ধাতে নেই! কিন্তু এখন এমন একটা ব্যাপারে ও এসেছে যে ইচ্ছে না থাকলেও ওকে এইসব মানুষগুলোর সামনে যেতে হবে।

গাড়ির মধ্যে বসে ব্যাগ খুলে একটা ছোট আয়না বের করল মুকু। একবার দেখে নিল নিজেকে। আজ ওকে যেতে হচ্ছে কলেজ স্ট্রিটের ওদিকে। তিজু দীপনদের এক পিসি থাকেন ওখানে।

তিজুর কাছে এই পিসির কথা শুনেছিল মুকু। শুনেছিল, পিসির বিয়ে হয়েছিল উত্তর কলকাতার এক বনেদি বাড়িতে! তাঁদের বেদম পয়সা ছিল এক সময়! আর তার সঙ্গে ছিল সাজ্যাতিক গোঁড়ামি। এখন শুনেছে পয়সা কমে গেলেও গোঁড়ামি কমেনি।

মুকু প্রথমে ভেবেছিল শাড়ি পরে যাবে কীনা। কিন্তু তারপর মনে পড়েছিল ওর। আরে শাড়ি তো সঙ্গেই নিয়ে আসেনি। আসলে এখানে যে আসতে হবে তাই তো জানা ছিল না। আর শাড়িই বা পরতে যাবে কেন? কে এখন ও এই পরিবারের? কেউ না! দীপনের কথায় ও সাহায্য করছে শুধু!

দীপনের কথাতেই কি শুধু সাহায্য করছে? শেষের এই কথাটা মনে পড়তেই কেমন যেন একটা ছোট্ট ঝাঁকুনি লাগল মুকুর। ও সচকিত হয়ে উঠল। ও সত্যি কেঁপে উঠল, নাকি গাড়িটা কোনও গর্তে পড়েছিল?

ছোট্ট আয়নাটা ব্যাগের ভেতরে রেখে জানলা দিয়ে বাইরে তাকাল মুকু। শীতের কলকাতা। দুপুরের রোদটা কেমন যেন কালচে ধরণের। মনখারাপ করা! গাড়ি শিয়ালদা ফ্লাই ওভারে উঠেছে। ডান দিকে শিয়ালদা স্টেশান দেখা যাচ্ছে। ওই তো বড় ডিজিটাল ঘড়ি। আর কী সব কনস্ট্রাকশান চলছে যেন!

দশ বছর পরে কলকাতায় এসে সব খুব নতুন লাগছে মুকুর।

শহরটার এখানে ওখানে নানান ভাবে পেঁচিয়ে দেওয়া হয়েছে ফ্লাইওভারের রিবন। দৈত্যের কেটে নেওয়া পায়ের মতো বিশাল লম্বা বাড়ি উঠেছে! আর চারিদিকে কি বিশাল সব ক্রেন! যেন কোনও বড় বড় কাঁটা চামচ কেউ গেঁথে রেখেছে খাবারে!

এই হিজিবিজি ভীড়ের মধ্যে কোথায় লুকিয়ে আছে তিজু! কেন এমন সবাইকে না বলে চলে গেছে বাড়ি থেকে? কী হয়েছে? দীপন কিছু বলেছে কি? নাকি দীপনের স্ত্রী স্বপ্না কিছু বলেছিল? কিন্তু স্বপ্না তো অপমানজনক কিছু বলার মতো মেয়ে নয়। দীপনও ওর দাদাকে খুব ভালবাসে! তাহলে? মায়ের মৃত্যুর পরে কি তাহলে ডিপ্রেশানে চলে গিয়েছিল তিজু! দীপনকে এমনটাই জিজ্ঞেস করেছিল মুকু।

কাজ শেষ করে নিজের হোটেলে সেদিন একটু তাড়াতাড়িই ফিরেছিল মুকু। ভাবছিল আর দু দিন পরে কাজ সেরে ছুটি নিয়ে মায়ের কাছে থাকবে কিছু দিন। তারপর দেখবে প্রিতম যেমন বলেছে সেভাবে ছুটি কাটানো যায় কীনা!

এমন সময় ফোনটা পেয়েছিল ও। দীপন! ফোনটা ধরে অবাক হয়ে গিয়েছিল মুকু। তিন বছর হল, ওদের সঙ্গে সম্পর্ক নেই মুকুর। ডিভোর্সের পরে সব তো মিটে গেছে! আর কেন শুধু শুধু পিছুটান বাড়াবে?

তাও এত বছর পরেও ফোনে দীপনের গলাটা চিনতে অসুবিধে হয়নি ওর। আর সত্যি বলতে কী, বুকটা কেমন যেন কেঁপেও উঠেছিল। মনে খারাপ চিন্তা এসেছিল! দীপন কেন ফোন করল? কোনও খারাপ খবর নাকি?

দীপন বলেছিল, 'বৌদি কেমন আছো? আমি দীপন।'

কেমন আছো জিজ্ঞেস করতে তো আর ফোন করেনি দীপন, সেটা বাচ্চা মেয়েও বুঝতে পারবে। প্রাথমিক অস্থিরতা কাটিয়ে নিজেকে কেমন একটা খোলশের মধ্যে গুটিয়ে নিয়েছিল মুকু। কেন কে জানে ওর খুব অস্বস্তি হচ্ছিল!

ও বলেছিল, 'ভাল আছি। তোমরা?'

দীপন সময় নিয়েছিল একটু। তারপর বলেছিল, 'আমরা খুব ভাল কিছু নেই! মা তো মাস দেড়েক আগে মারা গেল। আর তারপর...'

'তারপর?' কেমন যেন গলাটা বুজে আসছিল মুকুর। কোনও খারাপ খবর কি?

দীপন সামান্য থেমে বলেছিল, 'আসলে একটা বিপদ হয়েছে। দাদাকে পাওয়া যাচ্ছে না।'

'কী?' প্রথমে বুঝতে পারেনি মুকু।

'দাদাকে পাওয়া যাচ্ছে না বলি দিদি। মোবাইল, ল্যাপটপ সব ফেলে রেখে দিয়ে দাদা চলে গিয়েছে কলকাতায়।'

'কলকাতায় গিয়েছে কেন বলছ? পাওয়া যাচ্ছে না যখন তখন এটা জানলে কেমন করে?'

দীপন বলেছিল, 'আরে যাওয়ার আগের দিন স্বপ্নাকে রাতে বলেছিল, কলকাতায় একটা কাজ আছে। ব্যাস। সকালে উঠে দেখি নেই। বেশ কয়েকদিন হয়ে গেছে। যোগাযোগও করতে পারছি না। খুবই চিন্তা হচ্ছে। তাই তোমায় ফোন করলাম!'

'আমায়?' মুকু খুব অবাক হয়েছিল।

'আর দাদার কি আছে? আমরা আর তুমি? আর কেউ তো নেই!'

দীপন এমন করে কথাটা বলেছিল যে মুকু বলতে পারেনি, তিন বছর হল সব চুকেবুকে গিয়েছে!

মুকু শুধু জিজ্ঞেস করেছিল, 'মা মারা যাওয়ার পরে কি ডিপ্রেশানে ভুগছিল তোমার দাদা? মানে এমন হঠাৎ হল কেন? কী জন্য কলকাতায় গিয়েছে?'

দীপন সামান্য থমকে গিয়ে বলেছিল, আসলে মানে... আমি ঠিক... মানে... তুমি প্রিজ একটু গিয়ে দেখবে?'

'কিন্তু আমি কী করব?' মুকু অবাক হয়েছিল।

দীপন বলেছিল, 'বৌদি আমার তো জানোই হুইলচেয়ারে জীবন কাটে। আমি যে খুঁজতে যাব সেটা সম্ভব নয়। আর আমাদের কোম্পানির লোকজনকে এতে ইনভলভ করতে পারব না। তাই তোমায় রিকোয়েস্ট করছি।'

'পুলিশে যাচ্ছ না কেন?' মুকু জিজ্ঞেস করেছিল।

'পাগল নাকি! আমাদের স্ক্যান্ডাল হয়ে যাবে। কোম্পানির রেপুটেশান ঝাড় খাবে। প্লিজ বৌদি! ফর ওল্ড টাইমস সেক! একটু দেখো প্লিজ!

'কিন্তু দীপন তুমি ভুলে যাচ্ছ, আমরা কিন্তু ডিভোর্সড। আমাদের মধ্যে আর যোগাযোগ নেই। লাস্ট তিন বছরে তো আমার জীবনটাও পালটে গিয়েছে। সেখানে আমায় কেন বলছ? আমি কে?'

'জানো বৌদি তুমি যে গোল্ড ব্যান্ডের মতো আংটিটা দাদাকে দিয়েছিলে, সেটা দাদা আজও পরে থাকে হাতে। আজও তোমার আর দাদার ছবি বেড সাইড টেবলে রেখে দিয়েছে!

'কিন্তু এসব আমায় বলছ কেন? আমি তো কেউ নই আর!' মুকু নিজেকে ছিঁড়ে আনতে চাইছিল ঘটনা থেকে।

'তাই কি?' দীপন বলেছিল, 'তুমি একবার নিজেকে জিজ্ঞেস করো! তুমি ছাড়া আর কেউ নেই বৌদি। এটা কি তুমি জানো না?'

রিজের থেকে বাঁদিকে বাঁক নিয়ে গাড়িটা আমহার্স্ট স্ট্রিটের দিকে এগোচ্ছে। এদিকে খুব ভিড়। যেন জট পড়া একটা শহর। চারিদিকে পুরোনো বাড়ি ঘর। ইট বের করা থাম! কারুকাজ খসে পড়া দেওয়াল। ভাঙা ঝরোকা। চলটা ওঠা পরীর মূর্তি! একজনের সুন্দরী এখন যেন বাতিল হয়ে ঘরের কোণায় পড়ে আছে!

মুকু কলকাতার মেয়ে নয়। কিন্তু দশ বছর আগে তিজুর সঙ্গে এসে এমন করে ঘুরেছিল ও যে এই শহরটাকে ভাল লেগে গিয়েছিল খুব! কিন্তু আজ কেমন যেন অসহায় লাগছে। নিজের ওপর রাগও হচ্ছে! কী দরকার ছিল দীপনের সেন্টিমেন্টাল কথায় কান দেবার! কেন এল ও এখানে! ছুটি পেল এত দিন পরে, সেটা কেন এভাবে নষ্ট করছে!

ভাড়ার গাড়িটা ওকে ঠিকানা অনুযায়ী বড় বাড়িটার সামনেই নামিয়ে দিল।

মুকু রাস্তায় নেমে ভাল করে দেখল বাড়িটাকে। আঁকাবাঁকা গলির মধ্যে বড় বাড়ি। দেখেই বোঝা যাচ্ছে শেষ চল্লিশ বছরে হাত পড়েনি এর গায়ে। একপাশের একটা ঝুল বারান্দা তো প্রায় ভেঙে পড়ে গিয়েছে! নানান জায়গা দিয়ে মোটা গাছ বেরিয়েছে। তবে যেটুকু কারুকাজ আর থাম-খিলান এখনও ঠিক আছে তাতে বোঝা যাচ্ছে এক সময় এই বাড়ির সৌন্দর্যই অন্যরকম ছিল।

বাড়ির সামনের দরজাটা খোলা। সেটা দিয়ে ভেতরে ঢুকল মুকু। সরু গলির মতো জায়গা দিয়ে এগিয়ে একটা খোলা চৌকোনো উঠোনে পড়ল ও। দেখল একটা লোক বসে আছে ভাঙাচোরা চেয়ারে। লোকটার গালে খোঁচা সাদা দাড়ি। পরণে নীল চেক কাটা লুঙ্গী আর একটা চা-রঙের হাই নেক সোয়েটার। লোকটার বয়স সত্তরের ওপরেই মনে হল ওর। মাথায় ঘন সাদা চুল। তেল দিয়ে পাট করে ব্যাক ব্রাশ করা।

লোকটা ঘোলাটে চোখ তুলে তাকাল ওর দিকে।

মুকু জিজ্ঞেস করল, 'বিভাবরীদেবী এখানে থাকেন?'

লোকটা সময় নিয়ে মাথা নাড়ল। তারপর হাত দিয়ে একটা সিঁড়ির দিকে দেখাল।

মুকু দেখল সরু একটা সিঁড়ি উঠোনের এক পাশ দিয়ে উঠে গিয়েছে দোতলার দিকে। এরও গ্রাস্টার খুলে গিয়েছে। চারিদিকে মরে যাওয়া শ্যাওলা খয়েরি হয়ে ছেড়ে যাওয়া সাপের খোলশের মতো লেগে আছে সিঁড়ির গায়ে!

লোকটা হাত দিয়ে সিঁড়ি দেখিয়ে দিয়ে আবার মাথা নিচু করে নিয়েছে! মুকু আর ঘাটালো না। ও সাবধানে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠল। দোতলার জানলা দেখা যাচ্ছে। ভাঙাচোরা জানলা। কোনও কোনওটা আবার দড়ি দিয়ে বাঁধা আছে।

সিঁড়ির শেষে একটা লোহার গ্রিলের দরজা। সেটা পার করে সরু বারান্দা। কী করবে বুঝতে পারল না মুকু। বারান্দায় দুটো টেবল রাখা। তারপর রাজহংস হাবিজাবি জিনিস স্তূপ করা। টেবলের ওদিকে একটা

খোলা দরজা দেখা যাচ্ছে। আর সেটা ছাড়িয়ে এই সরু দালানটা সামনে এগিয়ে গিয়েছে তিন তলায় উঠে যাওয়া আরেকটা সিঁড়ি অবধি।

'বিভাবরী দেবী!' মুকু এগিয়ে গিয়ে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ডাকল দুবার।

সামান্য সময় পরে উত্তর এল, 'কে রে? কে ডাকছিস?'

'আমি...' আর কী বলবে বুঝতে না পেরে মুকু এগিয়ে গিয়ে দরজা দিয়ে মুখ বাড়াল।

দেখল, একটা পুরোনো দিনের বড় পালঙ্ক! তাতে আরও পুরোনো একজন ভদ্রমহিলা বসে রয়েছেন। পরণে সাদা শাড়ি। চোখে মোটা কাচের চশমা। মুখে অজস্র ভাঁজ!

'কে গো তুমি? কাছে এসে বসো।' বিভাবরী হাত তুলে ডাকলেন মুকুকে।

মুকু দরজার বাইরে জুতো খুলে ভেতরে ঢুকল। পালঙ্কের এক পাশে একটা হাতল ভাঙা চেয়ার! মুকু সেটায় বসল গিয়ে। ভাবল, এই বাড়িতে কি একটা জিনিসও আস্ত নেই?

বিভাবরী সামান্য এগিয়ে এলেন খাটের কোণায়, 'কে গো মেয়ে তুমি? চিনলাম না তো? টিস্টুর কেউ?'

'পিসিমা আমি নিরমুক্তা। ওই ঋত্বিজের...' এইটুকু বলেই থমকে গেল মুকু। এই বয়সের মানুষকে কী বলবে ও! কী হয় ও ঋত্বিজের! ডিভোর্স-টিভোর্সের কথা এখানে বলার কোনও মানেই নেই!

'কে সে? ঋত্বিজ কে?' বিভাবরী অবাক হয়ে তাকালেন।

'মানে... তিজু... আমি ওর স্ত্রী।' শেষের কথাটা বলে কেমন একটা লাগল মুকুর।

'তিজু... তিজু... ও দিল্লীর তিজু! আমার রাজপুত্র!' বিভাবরী হাসলেন, 'কেমন আছে তিজু?'

'পিসিমা, আসলে ও দিল্লী থেকে কলকাতায় এসেছে। কিন্তু কোথায় এসেছে, আমরা সেসব জানি না। তাই এসেছিলাম, বাই চান্স যদি এখানে এসে থাকে। মানে...' মুকু আর কী বলবে বুঝতে পারল না।

'সেকি?' বিভাবরী উদ্বিগ্ন মুখে তাকালেন, 'তিজুকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না! ও বেশ কিছুদিন আগে একবার এসেছিল আমার কাছে। পঞ্চাশ হাজার টাকা দিয়ে গিয়েছিল আমায়। কিন্তু তারপর তো আর যোগাযোগ নেই! মানে হঠাৎ এল আর হঠাৎ চলে গেল। এখন কী হবে?'

মুকু বুঝল এখানে আসাটাই পন্ডশ্রম হয়েছে। ও আর সময় নষ্ট না করে উঠে দাঁড়াল। সত্যি এভাবে কি কাউকে খুঁজে পাওয়া যায়! পূর্ণ বয়স্ক একটা মানুষ, সে যদি লুকিয়ে থাকতে চায়, তাহলে কে তাকে খুঁজে বের করবে! তাও পুলিশকে বললে তারা পারত হয়তো খুঁজে বের করতে। কিন্তু মুকু পারবে কী করে! ও কি পুলিশ নাকি?

মুকু বলল, 'ঠিক আছে পিসিমা। সরি আপনাকে কষ্ট দিলাম। আমি আসি তাহলে?'

বিভাবরী কেমন যেন সামান্য সময়ের জন্য অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলেন। এবার ওর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আসবে? জানো তিজু আমাদের সঙ্গে তেমন যোগাযোগ রাখত না। কিন্তু সেদিন কেন যে হঠাৎ এল! টাকাটা দিল। যদিও বড় বৌমা সব নিয়ে নিয়েছে! আমায় কিছু আর দেয়নি!'

ও জিজ্ঞেস করল, 'কিছু কি বলেছে? মানে কিছু বলেছিল এসে?'

বিভাবরী আমায় দেখলেন। তারপর বললেন, নাঃ। শুধু টাকা দিয়ে চলে গেল! কিন্তু বড় বৌ মা...' বিভাবরী কথাটা শেষ না করেই হাত বাড়ালেন সামনে, 'মা-রে একটু কাছে আয়।'

মুকু কী করবে বুঝতে না পেরে তাকিয়ে রইল বৃদ্ধার শিরা ওঠা হাতের দিকে। ওর কষ্ট লাগল। এগিয়ে গিয়ে আলতো করে ধরল বিভাবরীর হাত।

বিভাবরী বললেন, 'আমায় কিছু টাকা দিয়ে যাবি মা? আমার খুব অসুবিধে চলছে!'

মুকু ঘাবড়ে গেল! কী বলছেন বিভাবরী! ও অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল।

বিভাবরী বললে, 'আমার বড় বউটা চামার। আমায় খেতে দেয় না। ওষুধ কিনে দেয় না। সারাক্ষণ গালি দেয়! আর ছেলেও হয়েছে তেমন। মাগভেড়ুয়া একদম! আমারই পাপের শাস্তি! তুই মা আমায় একটু কিছু দিয়ে যা! দয়া কর মা! তিজুর বৌ তুই! তিজু থাকলে তিজুও দিত! মা-রে বুড়িটার কথা ফেলিস না মা!'

মুকু কী বলবে বুঝতে পারল না। কষ্ট লাগল খুব। এই বয়সে এমন করে কারও সামনে হাত পাততে কতটা খারাপ লাগতে পারে ও জানে! ও নিজেও খুব সাধারণ বাড়ি থেকেই এসেছে! এক সময় ওর মাকেও খুব কষ্ট করে বড় করতে হয়েছে ওকে!

মুকু একটু সময় নিল। তারপর নিজের হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে ব্যাগটা খুলল। আসলে নিজের কাছে খুব বেশি টাকা রাখে না ও। কার্ড আছে এখন! কেনই বা টাকা নিয়ে ঘুরবে! ও তাও দেখল। আড়াই হাজার টাকার মতো আছে! সেটাই বের করল মুকু। বিভাবরীর হাতে দিয়ে দিয়ে বলল, 'এ টুকুই আছে পিসিমা। খুব বেশি নয়। তাও...'

'এই অনেক মা! এই অনেক আমার কাছে! তুই খুব ভাল। একদম তিজুর যোগ্য! তোরা খুব ভাল থাকিস। তোদের ঘর আলো করে ঠাকুর আসুন!'

মুকু দেখল টাকা ব্লাউজের মধ্যে গুঁজে রাখলেন বিভাবরী! তারপর কেমন চুপ করে গেলেন! আবার ওকে সেই পথ হারানো মানুষের মতো লাগল মুকুর! সামান্য ভয়ও পেল ও। বৃদ্ধ বয়সে কার জন্য কী অপেক্ষা করে আছে কে জানে!

রাস্তায় বেরিয়ে এদিক ওদিক তাকিয়ে এটিএম কাউন্টার খুঁজল মুকু। সব টাকা তো দিয়ে দিয়েছে। সঙ্গে কিছু ক্যাশ রাখা দরকার। ও দেখল বেশ কিছুটা দূরে একটা কাউন্টার আছে। ও সেইদিকে পা বাড়াতে যাবে এমন সময় ব্যাগের ভেতর থেকে ফোনটা বেজে উঠল।

এখন আবার কে! সামান্য বিরক্ত হল মুকু। ফোনটা বের করে থমকে গেল ও। প্রিতম! গত দুদিন ও ফোন করেনি প্রিতমকে। ওর ফোনও ধরেনি। মেসেজেরও উত্তর দেয়নি!

কেন এমন করছে ও সেটা নিজেই যেন বুঝতে পারছে না! মুকু সামান্য থমকে গেল! ও কি জানতে দিতে চায় না যে কেন ও এসেছে এখানে? নাকি প্রিতম জানলে কষ্ট পাবে বলে বলছে না? মুকু চোয়াল শক্ত করে ফোনটা ধরে দাঁড়িয়ে রইল।

বিঠোফেনের নাইন্থ সিমফনি বেজে যাচ্ছে ফোনে! মুকু যেন মনে মনে দেখতে পাচ্ছে ফোনের ওই পাড়ে চোয়াল শক্ত করে ভুরু কুঁচকে বসে আছে প্রিতম।

আচমকা রাস্তার উলটো দিকে একটা শব্দ হল। আর মুকু চমকে উঠে দেখল সামান্য দূরে একটা সাইকেল ধাক্কা মেরেছে একটা লোককে। সাইকেল চালক নেমে খুব চিৎকার করছে। আর অন্য লোকটা ড্যাবড্যাব করে তাকিয়ে রয়েছে চালকের দিকে। লোকটা বেঁটে খাটো। শক্ত পোক্ত চেহারা। মুখ চোখ বেশ শান্ত! লোকটা কিছুক্ষণ সাইকেল চালকের চিৎকার শুনল। তারপর যেন কিছুই হয়নি এমন মুখ করে পকেট থেকে একটা চিরুনী বের করে লাল রঙের চুলগুলো আঁচড়াতে লাগল!

মুকু তাকিয়ে দেখল ঘটনাটা। তারপর আচমকা যেন মনে পড়ে গেল হাতে ধরা মোবাইলের কথা। দেখল প্রিতম আবার ফোন করছে! বিঠোফেনের নাইন্থ সিম্ফনি ছোট ছোট ক্যাভিঞ্জসেস মতো ভেসে যাচ্ছে কলকাতার কালচে হলুদ রোদে! কী বলতে এতবার ফোন করছে প্রিতম!

## ॥ ৬ ॥

### আদিত

এখানে আকাশ অনেক বেশি নীল। সকালে ট্রেন থেকে নেমে সেটাই প্রথম মনে হয়েছিল আদিতের। আর এখন সন্ধের মুখে ট্রেনে করে ফেরার সময় মনে হচ্ছে এখানে আকাশ অনেক বেশি গোলাপী।

মফসসলের শীতকালের একটা মজা আছে। দুপুর আর সন্ধের মাঝের বিকেলটা খুব অদ্ভুত একটা ঢালু বেয়ে ছড়িয়ে থাকে। আর আকাশ আগেই কেমন যেন মিলিয়ে যায়!

জানলা দিয়ে আকাশের দিকে তাকাল আদিত। ট্রেন চলছে দ্রুত গতিতে। রেল লাইনের পাশের পোস্ট, গাছপালা পেছনে ছিটকে যাচ্ছে তত। যেন কেউ ছুঁড়ে ফেলছে তাদের! কিন্তু দূরের ধান কাটা মাঠ কেমন যেন শান্ত! তার ওপর কুয়াশা জমে আছে আইসক্রিমের মতো। যেন ইচ্ছে করলেই চামচ দিয়ে কেটে খেয়ে নেওয়া যায়! আর তারওপরে ছড়িয়ে আছে গোলাপী আকাশ! দেখলেই কেমন একটা মনখারাপ হয় আদিতের। বর্ধমানের সেই সময়গুলো মনে পড়ে যায়!

আর সেই সঙ্গে বিরাট বাড়িটাকেও। তার সেই লম্বা বারান্দা! রঙবেরঙের কাগজফুচির মতো পাখি। আর নরম হাওয়াই চটি পরে সেই নিঃশব্দে এসে পাশে দাঁড়ানো সেই মেয়েটি!

আজও পাখির খাঁচায় আঁকড়ে ধরা সেই হাতের আঙুল ফিরে আসে। ফিরে আসে ওই ছোট্ট রঙ্গন ফুলের পাঁপড়ির মতো ঠোঁট! ছোট্ট মুকুট কপাল! আর আজও কী নিশ্চিন্ততাবে মরে যায় ও! নিজেকে বোঝায় আদিত। বলে, তোকে তো ফিরিয়ে দিয়েছে! তোকে তো তাড়িয়ে দিয়েছে! অপমান করেছে! তাহলে কেন? কেন মনে করিস আজও? মনে নেই শেষের দিনে কী বলেছিল? কী করে ঘুরিয়ে নিয়েছিল মুখ! 'অন্য একজন' ওর সব বলে কেমন করে তোকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল অন্ধকার একটা কুয়োর মধ্যে! তাহলে কীসের জন্য এমন করে আজও মনে করিস ওকে? কেন আজও কষ্ট পাশ? কেন বারবার মনে মনে ফিরে যাস সেই লম্বা টানা বারান্দায়? কী আছে সেখানে? খাঁচা? কী আছে সেই খাঁচায়? নানান রঙের পাখি না তুই নিজে?

আদিতের মনে হল, ওই পেছন দিকে ছিটকে যাওয়া পোস্ট আর গাছপালার মতো নিজের অতীতটাকেও যদি এমন করে উপড়ে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিতে পারত!

'মাইরি তুই আমার লন করিয়ে দিলি?' পাশের থেকে মাকু চাপা গলায় বলল।

'লস কীসের?' আদিত দীর্ঘশ্বাস চেপে পাশে তাকাল।

মাকু ভুরু কুঁচকে বলল, 'ফালতু ট্রেনের টিকিট কাটালি! এই সময় চেকার দেয়? টাকাটা গেল আমার! শালা একটা পান হয়ে যেত ওটা দিয়ে!'

আদিত তাকাল মাকুর দিকে। রাজুদাকে বলে একটা কোম্পানিতে মাকুকে ছয় হাজার টাকার চাকরি করে দিয়েছিল। কিন্তু পাগলটা যায়নি। ও নাকি পার্টি করবে! আরে এটা কি পেজ থ্রির পার্টি নাকি? বুঝিয়েছে ও মাকুকে। কিন্তু মাকুর মাথা ওয়ান ওয়ে ট্রাফিকের মতো। ও বলে, কিন্তু শোনে না কিছু! তাই আদিতের কথাও শোনেনি!

আজও ওর পেছন পেছন এসেছে এই ফ্যাক্টরিতে। রাজুদা বলেছিল, 'মালটাকে নিয়ে যাচ্ছিস? দেখিস যেন ভুলভাল কিছু না বলে!'

আদিত মাকুকে পাখি পড়ানোর মতো করে বলেছিল যেন ফ্যাক্টরিতে গিয়ে কিছু না বলে। তা বলেনি কিছু মাকু। চুপচাপই ছিল। শুধু একবারই ফ্যাক্টরি ইউনিয়নের সেক্রেটারি বাবলদাকে বলেছিল, 'আপনারা কিন্তু ষ্টাইক করবেন না যেন। দেশের খুব বিপদ হয়ে যাবে!'

আদিত ঘাবড়ে গিয়ে তাকিয়েছিল মাকুর দিকে। ফ্যাক্টরির মালিকরা ঠিক মতো মাইনে দিচ্ছে না। বোনাস দিচ্ছে না। এমন কী ই.এস.আই., পি.এফ. পর্যন্ত ঠিক মতো জমা দিচ্ছে না। এ ব্যাপারে কী করা যায় সেই নিয়েই কথা বলতে গিয়েছিল আদিত। ইউনিয়ান রুমে বসেই কথা হচ্ছিল। সেখানে আচমকা মাকু এই 'ষ্টাইক করবেন না' বলে পুরো আবহাওয়াটাকেই কেমন যেন ঘোঁটে দিয়েছিল।

বাবলদাও ঘাবড়ে গিয়েছিল। আসলে সামনে বহুর ইউনিয়ানের নির্বাচন আছে। ফলে বাবলদার অনেক কিছু নির্ভর করে আছে এই দাবি আদায় আর শ্রমিক স্বার্থ রক্ষার ব্যাপারে! আর আসেপাশে প্রায় জনা চল্লিশেক লোক ঘিরে বসে শুনছিল ওদের আলোচনা! সবার মুখে চোখেই কেমন একটা থমথমে ভাব ছিল। সেখানে কেউ ফস করে অমন কথা বলে!

বাবলদা প্রাথমিক থতমত ভাব কাটিয়ে উঠে জিজ্ঞেস করেছিল, 'মানে? আপনি ঠিক কী বলতে চাইছেন? আমাদের রুজি রুটির ব্যাপার! মালিক এক কোটি টাকার গাড়ি চড়ে ঘোরেন। সেখানে আমাদের বাচ্চাদের স্কুল ফি বাকি পড়ছে। এত টাকা তো এই ফ্যাক্টরি থেকেই আসে। তাহলে? সেটা বন্ধ হয়ে গেলে মালিকরাও বুঝবে কত ধানে কত চাল! আমরা তো মরেই আছি! আর কত মরব!

আদিত মাকুর হাতে চিমটি কেটে চাপা গলায় বলেছিল, 'তুই চুপ কর। বলেছি না কথা বলবি না!'

'না ওকে বলতে দিন!' বাবলদা ভুরু কুঁচকে সাংঘাতিক একটা যুক্তি তর্কের জন্য তৈরি হচ্ছিল। সবার সামনে কেউ এমন একটা কথা বলে যাবে, আর ইউনিয়ানের সেক্রেটারি হয়ে সেটা কেমালুম হজম করে নিলে তো আর নিজের সম্মান থাকে না!

বাবলদা চায়ের গ্লাসটা পাশে সরিয়ে রেখে সামনে ঝুঁকে বসেছিল। আজ একটা এসপার-ওসপার না করে ছাড়বে না।

মাকু পান চিবোতে চিবোতে বলেছিল, 'আরে, বললাম তো। ষ্টাইক করবেন না! দেশের ক্ষতি হয়ে যাবে!'

'কীসের ক্ষতি হবে? দেশ কিন্তু এক শতাংশ বড়লোকদের নিয়ে তৈরি নয়। দেশে আমাদের মতো খেটে খাওয়া, পরিশ্রমী মানুষদের দিয়ে তৈরি হয়। আমাদের কাঁধে চড়েই দেশ এগোয়। সেখানে আমরা জীবনের বেসিক নিডগুলোই যদি না পাই! যদি বেসিক নিডগুলোই ফুলফিল না হয় তাহলে দেশ এগোবে কী করে? ষ্টাইক করতে আমাদের ভাল লাগে ভেবেছেন? না লাগে না। কিন্তু জীবনে মাঝে মাঝে উপায় থাকে না। আমাদের এই পথ নিতেই হয়। বুঝলেন?' এবার পাশের থেকে বলাই নামে একটা ছেলে বলেছিল কথাগুলো। ছেলেটা যে বাবলদার কাছের মানুষ সেটা প্রথমেই বুঝে গিয়েছিল আদিত।

মাকু মুখের মধ্যে আঙুল ঢুকিয়ে একটা সুপুরির কুচি বের করে এনে সেটাকে টোকা দিয়ে ফেলে বলেছিল, 'না না। আমি বলছি দেশের পপুলেশান বেড়ে যাবে খুব। কেস পুরো কেলো হয়ে যাবে। তাই ষ্টাইক-ফাইক করবেন না!'

'পপুলেশান! কেলো!' বাবলদা কিছুতেই যেন হিসেব মেলাতে পারছিল না! কী বলছে কী ছেলেটা! বাবলদা হাঁ করে তাকিয়েছিল মাকুর দিকে।

মাকু বলেছিল, 'আপনারা তো কন্ডোম তৈরি করেন, তাই না?'

'কন্ডোম?' বাবলদার সঙ্গে আদিতও এবার হাঁ করে তাকিয়েছিল মাকুর দিকে।

'ফ্যাক্টরি গেটের পাশে দেখলাম একটা বিজ্ঞাপণ। লাল একটা ত্রিকোণ। আপনারা কন্ডোম বানানো বন্ধ করলে কী হবে বলুন তো? পপুলেশান পাই পাই করে বেড়ে যাব না! লোকজন ইয়ে করে করে একদম ইয়ে করে দেবে না দেশের!' মাকু আদিতের দিকে ফিরে চাপা গলায় বলেছিল, 'অনেক লোকজন আছে এখানে। তাই লাগানো-টাগানোর মতো টার্ম আর ইউজ করলাম না!'

বাবলদা অবাক গলায় বলেছিল, 'আমরা কন্ডোম তৈরি করি কে বলল?'

'সেকি করেন না? ওই যে গেটের পাশে দেখলাম। গ্লাস রাবারের ফ্যাক্টরি! বিদেশী সিনেমায় দেখি যে কন্ডোমকে রাবার বুলে! তাই ভাবলাম!' মাকু উঠে দাঁড়িয়ে প্যান্টটা ঠিক করতে করতে বলেছিল, 'তা কন্ডোম তৈরি করেন না কেন? করে ফেলুন। দেশের উপকার করুন! কী যে করেন না আপনারা! দেশের কথা ভাববেন না?'

এখনও এমন করে কথাটা বলল মাকু যে প্রাথমিক ভাবে কী বলবে আদিত বুঝতে পারল না। ও একটু সময় নিল। তারপর বলল, 'রেল চলবেটা কী করে আমরা সবাই যদি উইথাউট টিকিটে যাতায়াত করি? এটা ভেবেছিস?'

মাকু বলল, 'আমি পাঁচ টাকার টিকিট না কাটলে রেল বন্ধ হয়ে যাবে! পাগল নাকি? আমার পাড়ার গরীব পানওয়ালাটার লস হবে আমি ওই টাকার পান না কিনলে! একে বলে ইকোনমিক্স। বুঝলি! কিছুই তো পড়াশুনো করিস না! অমর্ত্য সেনের বই পড়। জানতে পারবি?

আদিত বলল, 'তুই পড়েছিস? আর উনি কী লিখেছেন, ট্রেনের টিকিট না কেটে সেই টাকায় পান খাও?'

'বই পড় জানতে পারবি। তবে উনি পান খান না বোধহয়। ফরেনে পান পাওয়া যায় না বলেই মনে হয়। সেই জন্য তো শালা আমি কোনওদিন ডায়মন্ড হারবার ক্রস করিনি!'

আদিত আর কথা বাড়াল না। মাকু এবার আর কাকে কাকে ডেকে আনবে এইসব কথায় কে জানে! ও শুনল মাকু আরও কিছু বলছে কিন্তু স্পষ্ট বুঝতে পারল না। আদি গঙ্গার ওপর দিয়ে ট্রেন যাচ্ছে। ওরা চলতি কথায় এটাকে কালিঘাট ব্রিজ বলে। আগে ব্রিজের লোহার হ্যাঙারের ওপর সার সার শকুন বসে থাকতে দেখত আদিত। কিন্তু এখন আর দেখে না! শকুন জিনিসটাই যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গিয়েছে। এর মাঝে মাঝে মনে হয় সেসব পাখিরাই বোধহয় মানুষ হয়ে সমাজে ছড়িয়ে পড়েছে!

ঘড়ি দেখল আদিত। ঘড়িটা নতুন। ছোট মামা এনে দিয়েছে নেপাল থেকে। গতকাল এসেছিল ছোটমামা বাড়িতে।

ছোটমামা লোকটা ভাল। খুব ভালবাসে আদিতকে। মা যে আজকাল সারাক্ষণ ওকে বকাবকি করে সেটা থেকে ছোটমামাই যা ওকে রক্ষা করে বাড়ি এলে।

মা বাবার দুশ্চিন্তার কথাটা বোঝে আদিত। কিন্তু সবাই যদি নিজের কথা চিন্তা করে তাহলে কী করে দেশ চলবে?

ছোটমামা ওকে কাল আড়ালে নিয়ে গিয়েছিল। বলেছিল, 'সাতাশ বছর তো হল। চোখের পলক ফেলতে ফেলতে দেখবি চল্লিশ হয়ে গিয়েছে। আর কতদিন এমন করে থাকবি বুড়ো? শোন, একটা ভাল কাজ আছে। নয়ডায়। ওদের এমন ছেলে চাই যে লিখতে জানবে। এডিট করতে জানবে। আমায় বলেছে খুঁজে দিতে। তুই বললে এখনই কাজটা তোর!'

'চাকরি?' ছোটমামার দিকে তাকিয়েছিল আদিত। এই ভারতবর্ষে এভাবে এখনও কাজ পাওয়া যায়?

ছোটমামা বলেছিল, 'দেখ এখনও মাসখানেক সময় আছে। একটা ট্যাভেল অ্যান্ড টুরিস্ট ম্যাগাজিন খুলবে ওরা। সঙ্গে চ্যানেল লঞ্চ করবে। ডিজিটালে যাবে। ভাল কাজ। ভাল টাকা। আমায় ওরা বলেছে। ব্যারি সিমন্স আমার বিশেষ পরিচিত! তুই বল। দিদির বয়স হচ্ছে। জামাইবাবুর পেনশান আছে এখন। কিন্তু জামাইবাবু তো অসুস্থ। কত খরচ বলত! সমাজের দায়িত্ব পরে পালন করবি, ঠিক আছে, আগে নিজের কাছের লোকদের দায়িত্ব পালন কর। চ্যারিটি বিগিন্স অ্যাট হোম জানিস তো? প্লাস বিয়ে শাদি করবি তো নাকি?'

আদিত কিছু বলেনি। আচমকাই মনের মধ্যে ফিরে এসেছিল একটা ছবি! অনেক আনকি পাখির সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে একজন! তার মুকুট কপাল! রঙ্গন ফুলের পাঁপড়ির মতো ঠোঁট! তার ওপরে ছোট্ট একটা কাটা দাগ!

কেমন যেন শীত করে উঠেছিল আদিতের। ওদের বাড়ির ক্ষয়াটে বারান্দায় শীতে কুঁকড়ে আসা আকাশের দিকে তাকিয়েছিল ও। মনে পড়েছিল, সে এমন শীতের দিনে রোদের ঝালরের নীচে দাঁড়িয়ে সে বলত, 'আমার খুব শীত পাচ্ছে!'

কিন্তু কাল ছোটমামার কথা শোনার পর থেকে কেমন যেন অস্বস্তি হয়েছিল! আচ্ছা, ও কি সত্যি এমন জীবনে আসত যদি না সেদিন অমন করে ওকে তাড়িয়ে দিত স্মাহি! ও কি আসলে নিজের কষ্টের থেকে বাঁচতে এভাবে অন্যদিকে ঠেলে দিচ্ছে জীবন? আসলে কি ও ভিতু? জীবনকে সামনে থেকে মুখোমুখি হতে ভয় পায়? মানুষের মন গোলকধাঁধাঁর মতো! নিজের অনেক প্রশ্নই সে এড়িয়ে যায়!

ছোটমামা বলেছিল, 'বুড়ো, আমি জানি না তোর কী কষ্ট। কিন্তু জানবি আজ যেটাকে কষ্ট বলে মনে করে তুই সব কিছু থেকে সরে থাকছিস, আজ থেকে তিরিশ বছর পরে কিন্তু সেই জন্য তোকে আফশোষ করতে হবে। জানবি, একটাই জীবন বুড়ো। আদিত কিন্তু আর ফিরে আসবে না এই পৃথিবীতে!'

আদিত তাও হাসার চেষ্টা করেছিল। বলেছিল, 'কীসের কষ্ট! দূর কী যে বলো!'

ছোটমামা হেসেছিল খুব। তারপর ওর মাথায় হাত দিয়ে চুলটা ঘেঁটে দিয়ে বলেছিল, 'আমার এখন একাঘ। কিন্তু আমার কি কোনওদিন সাতাশ ছিল না? আমি কি এমনি চিরকুমার! ঘড়িটা পরিস। সময়ের দামটা মাথায় রাখিস!'

টালিগঞ্জ স্টেশানে ট্রেনটা দাঁড়িয়েছে। লেক গার্ডেন্স স্টেশানটা এখান থেকে দেখা যায়, এত কাছে! এই স্টেশান থেকে সিঁড়ি দিয়ে নামলেই রবীন্দ্র সরোবর মেট্রো স্টেশান! তাছাড়া, ট্রাম, বাস, ট্যাক্সি, অটো, সব আছে। তাই ট্রেনের বেশির ভাগ ভীড় এখানেই খালি হয়ে যায়।

মাকু জিজ্ঞেস করল, 'তুই কি বালিগঞ্জে নামবি না লেক গার্ডেন্সে! মানে রাজুদার কাছে যাবি?'

'হ্যাঁ রাজুদার সঙ্গে দেখা করতে হবে। বাদলদার সঙ্গে কী কথা হল জানানো দরকার!' আদিত আর কথা না বাড়িয়ে জানলা দিয়ে বাইরে তাকাল। ভিড় স্টেশান। তবে অন্ধকার হয়ে যাওয়ায় সব কেমন অবছা লাগছে।

ও ভাবল রাজুদা কি পার্টি অফিসে চলে গিয়েছে নাকি বাড়িতেই আছে। রাজুদার সামান্য জ্বর হয়েছে। নিশ্চয় বাড়িতেই থাকবে। কার যেন একটা আসার কথা। কোন এক ভদ্রমহিলার। আজ রাজুদা বলেছিল সকালে।

'কে আসবে? ইমপরট্যান্ট কেউ?' আদিত জানতে চেয়েছিল।

'আরে না! প্রিতমদার গার্ল ফ্রেন্ড? রাজুদা মুখ বিকৃত করে নিয়েছিল।

'সে কে?' অবাক হয়েছিল আদিত। নাম শোনেনি আগে এই লোকটার।

রাজুদা বলেছিল, 'সে আমার কলেজের সিনিয়ার! বিশাল টাকা। ব্যাঙ্কার না কী যেন। আমি ফরেনে গেলে টুকটাক হেল্প করে। ডিভোর্সী। আরেকজনের সঙ্গে এখন প্রেম করছে। তো সেই ম্যাডাম আসবে। কী কাজ ভগবান জানে!

আদিত কিছু বলেনি। পুশি বৌদি, মানে রাজুদার বৌ এসে চা দিয়ে গিয়েছিল রাজুদাকে।

রাজুদা জিজ্ঞেস করেছিল, 'আদা দিয়েছ তো?'

বৌদি হেসেছিল, 'দিয়েছি! তারপর আদিতকে জিজ্ঞেস করেছিল, 'তুমি আজ লাঞ্চ করবে এখানে?'

'না না,' রাজুদা নিজের উত্তর দিয়েছিল, 'ও সারেঙ্গাবাদ যাবে। কাজ আছে।'

বৌদি আর কথা না বাড়িয়ে চলে গিয়েছিল।

রাজুদা বৌদির চলে যাওয়া দেখে আদিতের দিকে ঘুরে তাকিয়ে বলেছিল, 'পুশি কেমন হয়ে যাচ্ছে জানিস! বাচ্চা কি হাতের মোয়া বল!'

আদিত মাথা নামিয়ে নিয়েছিল। এসব ওর জানার কথা নয়। রাজুদারা নিঃসন্তান। কিন্তু সেই নিয়ে রাজুদা কোনওদিন কিছু বলেনি। আজ কেন যে বলেছিল!

রাজুদা স্থির ভাবে চায়ের কাপের দিকে তাকিয়েছিল কিছুক্ষণ। তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেছিল, 'তুই কিন্তু করে ঘুরে আয় সারেঙ্গাবাদ থেকে। কী হচ্ছে এসে খবর দে আমায়। আর তোর সঙ্গে একটা কথা আছে আমার। পরে বলব!'

লেক গার্ডেন্স স্টেশানে নেমে এদিক ওদিক তাকাল আদিত। মাকু নামেনি। ও বালিগঞ্জ যাবে কী একটা কাজে।

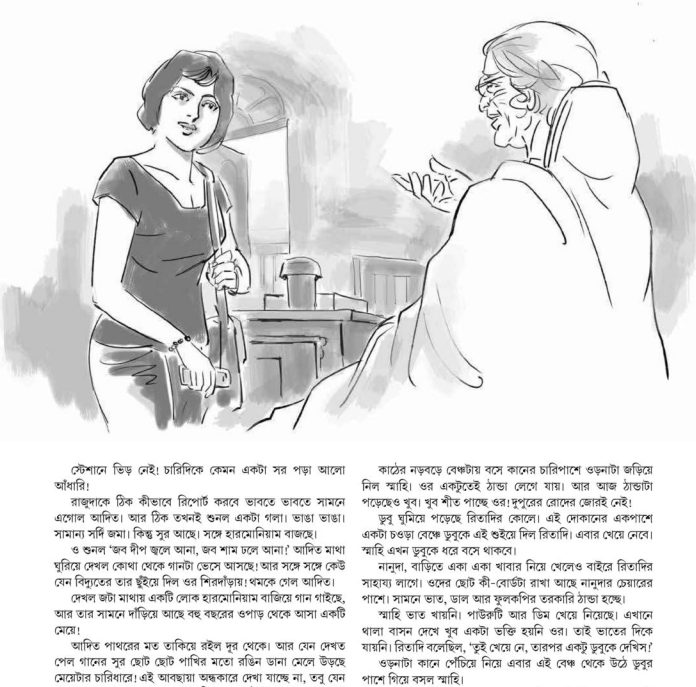

স্টেশানে ভিড় নেই! চারিদিকে কেমন একটা সর পড়া আলো আঁধারি!

রাজুদাকে ঠিক কীভাবে রিপোর্ট করবে ভাবতে ভাবতে সামনে এগোল আদিত। আর ঠিক তখনই শুনল একটা গলা। ভাঙা ভাঙা। সামান্য সর্দি জমা। কিন্তু সুর আছে। সঙ্গে হারমোনিয়াম বাজছে।

ও শুনল 'জব দীপ জ্বলে আনা, জব শাম ঢলে আনা?' আদিত মাথা ঘুরিয়ে দেখল কোথা থেকে গানটা ভেসে আসছে! আর সঙ্গে সঙ্গে কেউ যেন বিদ্যুতের তার ছুঁইয়ে দিল ওর শিরদাঁড়ায়! থমকে গেল আদিত।

দেখল জটা মাথায় একটি লোক হারমোনিয়াম বাজিয়ে গান গাইছে, আর তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে বহু বছরের ওপাড় থেকে আসা একটি মেয়ে!

আদিত পাথরের মত তাকিয়ে রইল দূর থেকে। আর যেন দেখত পেল গানের সুর ছোট ছোট পাখির মতো রঙিন ডানা মেলে উড়ছে মেয়েটার চারিধারে! এই আবছায়া অন্ধকারে দেখা যাচ্ছে না, তবু যেন এত বছর পরেও রঙ্গন ফুলের পাঁপড়ির মতো ঠোঁটের ওপর সেই কাটা দাগটা নিজের বুকের মধ্যে দেখতে পেল আদিত!

## ॥ ৭ ॥

## স্মাহি

শীতের এই ছুটির দুপুরগুলোয় কেমন যেন মনখারাপ লাগে স্মাহির। ঠান্ডা একটা হাওয়া যেন পুরোনো জীবনের সব কথা মনে পড়িয়ে দেয়। যেন ছোটবেলার পাড়া থেকে সব পরিচিত মানুষদের গন্ধ নিয়ে আসে এই হাওয়া! আজও সেই হাওয়ায় মনখারাপ করছে স্মাহির। মনে পড়ে যাচ্ছে এই দিনটায় কী আনন্দই না হত আগে! মা বাবা যে নেই সেটা বুঝতেই দিত না জেঠু। সারা বাড়ি সাজিয়ে, লোকজনদের নেমন্তন্ন করে, কেক কেটে কত আনন্দ করত ওরা! জেঠু বলত, 'আজ মনখারাপ করে থাকবি না পাগলি! জন্মদিনে মনখারাপ করতে নেই!'

কাঠের নড়বড়ে বেঞ্চটায় বসে কানের চারিপাশে ওড়নাটা জড়িয়ে নিল স্মাহি। ওর একটুতেই ঠান্ডা লেগে যায়। আর আজ ঠান্ডাটা পড়েছেও খুব। খুব শীত পাচ্ছে ওর! দুপুরের রোদের জোরই নেই!

ডুবু ঘুমিয়ে পড়েছে রিতাদির কোলে। এই দোকানের একপাশে একটা চওড়া বেঞ্চে ডুবুকে এই শুইয়ে দিল রিতাদি। এবার খেয়ে নেবে। স্মাহি এখন ডুবুকে ধরে বসে থাকবে।

নানুদা, বাড়িতে একা একা খাবার নিয়ে খেলেও বাইরে রিতাদির সাহায্য লাগে। ওদের ছোট কী-বোর্ডটা রাখা আছে নানুদার চেয়ারের পাশে। সামনে ভাত, ডাল আর ফুলকপির তরকারি ঠান্ডা হচ্ছে।

স্মাহি ভাত খায়নি। পাউরুটি আর ডিম খেয়ে নিয়েছে। এখানে থালা বাসন দেখে খুব একটা ভক্তি হয়নি ওর। তাই ভাতের দিকে যায়নি। রিতাদি বলেছিল, 'তুই খেয়ে নে, তারপর একটু ডুবুকে দেখিস!'

ওড়নাটা কানে পেঁচিয়ে নিয়ে এবার এই বেঞ্চ থেকে উঠে ডুবুর পাশে গিয়ে বসল স্মাহি।

এখন প্রায় তিনটে বাজে। দুপুর একটু পড়েই মিশে যাবে ছোট্ট বিকেলে। আকাশের দিকে তাকাল স্মাহি। জেঠুর কি মনে আছে আজ ওর জন্মদিন! জেঠিমা, দাদা, বোন, ওদের মনে আছে?

রিতাদি বা নানুদাকে ও বলেনি এই দিনটার কথা। কাউকেই ও আর বলে না এই নিয়ে। কী হবে? এই চব্বিশে আসতে আসতে সবাই তো হারিয়ে গিয়েছে ওর জীবন থেকে! মা, বাবা, জেঠু বা দীপক, কেউ নেই!

দীপকের নামটা মনে এলে এখন কেমন যেন গা গুলিয়ে ওঠে স্মাহির! কতটা বোকা হলে ও এমন একটা লোকের সঙ্গে জড়িয়ে পড়তে পারে! আর শুধু জড়িয়ে পড়া নয়, ওই চরম অবধি যেতে পারে! সেই বছর দুয়েক আগের দিনগুলো কেমন দুঃস্বপ্নের মতো লাগে স্মাহির! কী জীবন কী হয়ে গেল!

বাবা মায়ের ভাব করে বিয়ে হয়েছিল। মায়ের বাড়ির অনুমতি ছিল না এই বিয়েতে। তাই বিয়ের পর মায়ের বাড়ির লোকজন কোনও

সম্পর্ক রাখেনি ওদের সঙ্গে। মামাবাড়ি বলে কোনও ব্যাপারই ছিল না স্মাহির জীবনে। যা ছিল সবটাই ছিল জেঠু!

বাবা মা মারা গিয়েছিল একটা দুর্ঘটনায়। তখন ক্লাস সিক্সে পড়ে স্মাহি। আজও সেই দিনটার কথা মনে আছে। স্কুল থেকে ফিরে দেখেছিল ওদের বিরাট বড় বাড়ির সামনে প্রচুর মানুষ ভেঙে পড়েছে! একটা অ্যাম্বুলেন্স আর পুলিশের দুটো গাড়ি দাঁড়িয়ে! স্মাহি তো প্রথমে বুঝতেই পারেনি কী হল! এত লোক কেন বাড়িতে! আর পুলিশ! তারাই বা কী করছে!

বাড়ির সামনে পিঠে ব্যাগ নিয়ে স্থির হয়ে দাঁড়িয়েছিল স্মাহি! আর দেখছিল আশেপাশের লোকজন কেমন একটা অদ্ভুত চোখে তাকিয়ে রয়েছে ওর দিকে! স্মাহি বুঝতে পারছিল কিছু একটা হয়েছে! সাংঘাতিক কিছু একটা ঘটে গিয়েছে! ও দৌড়ে ঢুকে গিয়েছিল বাড়ির মধ্যে। আর দেখেছিল ওদের বড় উঠোনটায় শোয়ানো ছিল বাবা মা! চোখ বন্ধ। নিথর! নিমেষে সব কিছু স্থির হয়ে গিয়েছিল ওর! চারিদিক জনশূন্য হয়ে গিয়েছিল! কোনও শব্দ শুনতে পাচ্ছিল না! কাউকে যেন চিনতে পারছিল না! বাবা মা নেই! তাহলে এবার কী হবে? সামনের জীবনটা এবার কী ভাবে কার সঙ্গে কাটাবে ও!

থরথর করে কাঁপছিল স্মাহি! আর তখনই জেঠু এসে জড়িয়ে ধরে নিজের বুকের মধ্যে লুকিয়ে নিয়েছিল স্মাহিকে। কানের কাছে মুখ নিয়ে বলেছিল, 'এসব দেখিস না মা, ভুলে যা এই ছবি। আর তয় পাবি না। একদম ভয় পাবি না। আমি আছি। আমি সারা জীবন আছি তোর সঙ্গে!'

সারা জীবন? সারা জীবন মানে কতটা জীবন! সারা জীবন কেউ থাকে না! মানুষ আসলে একাই! নিজের ওপর ছাড়া তার আর কারও পর ভরসা করার নেই! যেদিন ওকে সবাই বাড়ি থেকে বের করে দিল সেদিন ওপরের বারান্দা থেকে জেঠু দাঁড়িয়ে দেখছিল ওকে! কেমন একটা পাথরের মূর্তির মতো লাগছিল মানুষটাকে। এই লোকটাই যে এত দিন ওকে বুক দিয়ে আগলেছে সেটা বোঝাই যাচ্ছিল না। বাড়ি থেকে বেরবার সময় মাথা নিচু করে হাঁটতে থাকা স্মাহির কানে যেন বাজছিল বহু বছর আগের সেই কথাগুলো, 'ভয় পাবি না। একদম ভয় পাবি না। আমি আছি। আমি সারা জীবন আছি তোর সঙ্গে!' কিছুটা গিয়ে ও মাথা ঘুরিয়ে শেষ বারের মতো তাকিয়েছিল বারান্দার দিকে। দেখেছিল আর জেঠু দাঁড়িয়ে নেই। শূন্য বারান্দায় সকালবেলার রোদ পড়ে আছে শুধু!

নীলাঞ্জনা তখন সাহায্য করেছিল খুব। ওর কলেজের বান্ধবী নীলাঞ্জনা, নীলু। ওর আর দীপকের ব্যাপারটা জানত নীলু। ওকে বলত, 'একটা এমন লোকের সঙ্গে লাইফ নেই কিন্তু। দেখবি পস্তবি তুই!'

সেই সময়ে নীলু ওকে নিজেদের বাড়িতে রেখেছিল মাস দুয়েক। নিজের এক কাকাকে দিয়ে এই চাকরিটা জোগাড় করে দিয়েছিল। কলকাতায় পার্ক সার্কাসের কাছে একটা মহিলাদের মেসও জোগাড় করে দিয়েছিল।

যেদিন নীলুর বাড়ি থেকে শেষবারের মতো বেরিয়ে আসছে ও, সেদিন নীলু বলেছিল, 'শোন স্মাহি, জীবনে তুই কিন্তু একা এখন। ফলে নিজেরটা নিজে দেখে নিবি। মুখচোরা হয়ে থাকবি না! আর দীপকের সঙ্গে যোগাযোগ রাখবি না কিন্তু! শক্ত হ। এবার থেকে মাথা দিয়ে মানুষ চেনার চেষ্টা কর! বুঝলি?'

নীলু বিয়ে হয়ে গিয়েছিল তার মাস দেড়েক বাদে। এখন ও বিদেশে থাকে। সুইডেনের কোন একটা শহরে। মাঝে মাঝে ওকে মেসেজ করে। কিন্তু তাও ক্ষীণ হয়ে এসেছে! এটাই স্বাভাবিক। সবারই জীবন আছে। কে আর কার জন্য অপেক্ষা করে এটাই!

অপেক্ষা! সে কি অপেক্ষা করত! এই সব হিজিবিজি চিন্তার মধ্যে আজ হঠাৎ তার কথা মনে পড়ে গেল স্মাহির! যেন দেখতে পেল বড় বড় চোখ তুলে তাকিয়ে আছে সে! সামান্য জোড়া ভুরু! কপালে একটা ছোট্ট তিল! পাতলা মোম কাগজের মতো কান! সে যেন আজও তাকিয়ে আছে স্মাহির দিকে!

কেন কে জানে আজকাল মাঝে মাঝেই তার কথা মনে পড়ে স্মাহির! মনে পড়ে কী করে তাকে তাড়িয়ে দিয়েছিল ও! আর কীভাবে মাথা নামিয়ে ওদের আলো ছায়ার ঢোরাকাটা পথ দিয়ে চলে গিয়েছিল সে। যেতে যেতে একবারও আর পিছনে ফিরে তাকায়নি!

কোথায় গেল নীলুবৌ? ওদের বর্ধমান শহরে এসেছিল খবর কাগজের চাকরি নিয়ে। সেটা ছেড়ে কোথায় মিলিয়ে গেল মানুষটা! আগে বুঝত না, কিন্তু আজকাল কেমন একটা কষ্ট হয় স্মাহির। নিজের ওপর রাগ হয়! কী করল এটা ও! আরেকবার কি কোনওভাবে দেখা হবে না। আবার পাশে এসে দাঁড়াবে না! আবার তাকাবে না অমন বড় বড় চোখ তুলে!

'কী রে আজ বড্ড চুপচাপ, কী হয়েছে তোর?' শাড়ির আঁচল দিয়ে মুখ মুছে ওর সামনে এসে দাঁড়াল রিতাদি! স্মাহি মাথাতুলে হাসল সামান্য। তারপর আলতো করে পাশের চওড়া বেঞ্চে শুয়ে থাকা ডুবুর মাথায় হাত বুলিয়ে দিল!

রিতাদিকে ও বলছে নিজের জীবনের কিছু কথা। কিন্তু সবটা বলেনি। দীপকের ব্যাপারটা বলেনি। কেন ও বাড়ি ছাড়া সেটা বলেনি। আর রিতাদিও জিজ্ঞেস করেনি কিছু। আসলে রিতাদি খুব একটা ব্যাক্তিগত কথা জিজ্ঞেস করে না। কৌতূহল খুব কম। বলে, 'তুই আমার বোনের মতো এই শহরে একাই আছ অনেক। এমন পৃথিবীতে কী করে যে একা বেঁচে আছিস ভেবে অবাক লাগে আমার। কত বড় বাড়ির মেয়ে তুই!'

বড় বাড়ি না ছোট বাড়ি সেসব কিছু বলেনি স্মাহি। কিন্তু ওকে দেখে কেন কে জানে রিতাদি এমনটাই বলে নিয়েছে!

স্মাহি বলল, 'নানুদার খাওয়া হয়ে গিয়েছে, না?'

'হ্যাঁ রে। ওর শরীরটা ভাল লাগছে না বলছে। জ্বর জ্বর লাগছে নাকি! বাড়ি চলে যাই আজ। প্রায় সাড়ে তিনশো টাকা হয়েছে। খারাপ না, বল?'

স্মাহি হাসল। কিছু বলল না। ছুটির দিন মাঝে মাঝে রিতাদি আর নানুদার সঙ্গে ও বেরিয়ে পড়ে। ও এলে ডুবুও আসে। রিতাদিরা ট্রেনে গান গায়। আর ও ডুবুকে কোলে করে দাঁড়িয়ে থাকে।

স্মাহি বলেছিল, 'আমি কি পয়সা তুলব?'

রিতাদি হেসেছিল ওর কথায়, 'পাগল। এমন করে আমাদের সঙ্গে সঙ্গে তুই ট্রেনে ট্রেনে ঘুরিস এতেই আমি লজ্জায় মরে যাই! কত বড় বাড়ির মেয়ে তুই। আর তোকে দিয়ে আমি পয়সা তোলাবো! আমি কি অমানুষ?'

অমানুষ কি মানুষ সেটা তো বৃত্তি দিয়ে বা সামাজিক অবস্থান দিয়ে হয় না! কিন্তু সেসব আর বলেনি স্মাহি। কী হবে! ও শুধু মাঝে মাঝে ছুটির দিনে বেরয় ওদের সঙ্গে। ট্রেনের কামরার এক পাশে ডুবুকে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। ডুবুও ওর গায়ের সঙ্গে লেপ্টে থাকে একদম। আর ও দেখে, রিতাদি কঞ্জিরা বাজাচ্ছে। নানুদা পাথরের মতো চোখ নিয়ে কী-বোর্ডে সুর তুলছে। আর ওর গলা দিয়ে বেরিয়ে আসছে কিশোর, মান্না, রফি আর মুকেশ! খিদের সঙ্গে সুর মিশে লোকাল ট্রেনের মধ্যে দিয়ে গান ছড়িয়ে পড়ছে শহরতলির শিরা-উপশিরায়!

স্মাহি বলল, 'তাহলে ফিরে চল। সোনারপুর স্টেশান থেকে এখনই একটা ট্রেন আছে না?'

সারা সকাল আজ দক্ষিণ শহরতলির ট্রেনে ঘুরে ঘুরে গান গেয়েছে ওরা। তারপর দুপুরে খাবে বলে সোনারপুর স্টেশানের পাশে একটা দোকানে এসেছিল। খাবার বাবদ নব্বই টাকা হয়েছে। সেটা আর রিতাদিদের দিতে দেয়নি স্মাহি।

ও ঘুমন্ত ডুবুর দিকে তাকাল। অকাতরে ঘুমোচ্ছে ছেলেটা। এমনিতে খুব দামাল। কিন্তু একবার ঘুমিয়ে পড়লে আর সাড় থাকে না। পৃথিবী উলটে গেলেও ঘুম ভাঙে না।

এই ছোট্ট ছেলেটাকে কেন যে এত ভাল লাগে ওর! দেখলেই মন কেমন একটা করে! কী একটা নেই নেই মনে হয়! মনে হয় সাদা

চুনকাম করে একটা বিশাল বড় দেওয়ালের সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে ও! মনে হয় এমন তো ওরও হতে পারত! সেই একাই যখন হল, তখন ও কি দোষ করেছিল!

'চল তাহলে। আর দেরি করব না।'

রিতাদির কথায় মুখ তুলে তাকাল স্মাহি। আর তখনই মোবাইলটা বাজল। ও আবার! বিরক্ত হল স্মাহি। এই ছেলেটা কদিন হল ওর গায়ে পড়ছে না? স্মাহি ভদ্রভাবে কতবার বুঝিয়েছে যে ও আগ্রহী নয়! কিন্তু কেমন একটা মুখ করে তাকায় ছেলেটা। রিতাদিকে ছেলেটার ব্যাপারে বলেছে স্মাহি।

'ভাল তো! ভাল চাকরি করে! অসুবিধে কোথায়! তবে নামটা একটু সেকেলে, না? বলাই? রিতাদি কথাটা বলে খুব হেসেছিল!

ওদের কাটি ডিপার্টমেন্টের কাজ করে বলাই। ইউনিয়ানও করে। ভাল ছেলে। কিন্তু সারাক্ষণ আজকাল পেছনে ঘুরঘুর করে ওর। ভাল লাগে না একদম।

একদিন তো বলেছিল, 'তোমার কথা আমি মাকে বলেছি।'

'প্লিজ কাউকে বোলো না আমার কথা।' স্মাহি বিরক্ত হয়েছিল, 'প্লিজ এসব ভেব না। আমার পক্ষে কিছু সম্ভব নয়!'

তারপর থেকে আর সেভাবে সরাসরি কিছু বলে না বলাই। কিন্তু যোগাযোগ রেখে যায়। এক অফিসেই আছে। কী আর করে স্মাহি।

সামান্য চিন্তা করে ফোনটা ধরল স্মাহি।

'হ্যালো,' বলাই বলল, 'তুমি কোথায়?'

'কেন?' স্মাহি শুকনো গলায় বলল, 'কী হবে জেনে?'

'না মানে,' বলাই খুশির গলায় বলল, 'আমি কাকে আর বলব আমার আনন্দের কথা! তাই ভাবলাম... মানে...'

'আবার?' স্মাহি সামান্য কড়া গলায় বলল।

'আমি মানে...' বলাই ঢোঁক গিলল, 'সামনের বছর ইলেকশানে আমায় অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারির জন্য দাঁড় করাবে দল। আজই আমায় বলল বাদলদা। তাই মানে...'

'আচ্ছা,' স্মাহি বলল, 'ঠিক আছে আমি রাখছি। পরে কথা হবে।'

বলাইকে আর কিছু বলতে না দিয়ে ফোনটা কেটে দিল স্মাহি। পাগল যত সব। এমন করে বলছে যেন ইন্ডিয়ান ক্রিকেট টিমের ক্যাপ্টেন হয়েছে! আসলে স্মাহি বোঝে সবই ছুতো! নানান ভাবে যোগাযোগ করার ছুতো! কিন্তু কী করবে ও? উপায় তো নেই! বলাইকে ভাল লাগে না ওর। এ তো আর গড়িয়াহাটার মোড়ের ধুপকাঠি কেনা নয়! যে জোর করল বলে কিনে নেবে এক প্যাকেট!

ফোনটা জিনসের পকেটে রেখে ডুবুকে কোলে তুলে নিল স্মাহি। ওর মাথাটাকে নিজের কাঁধে সাবধানে রেখে তাকাল রিতাদির দিকে। দেখল রিতাদি হাসছে।

'কী হল? চলো!' স্মাহি ভুরু কুঁচকে বলল।

রিতাদি বলল, 'সেই বলাই, না?'

স্মাহি বলল, 'তো?'

রিতাদি খিলখিল করে হেসে বলল, 'শিত্রামের মতো বলতে হয়, তোর জীবনে বলাই বাহুল্য!'

লেক গার্ডেন্স স্টেশানে ট্রেন থেকে নেমে বাড়ির দিকে এগোল স্মাহিরা। রোদ পড়ে এসেছে। তবে সেই পাতলা সেলোফেনের মতো ঠান্ডা হাওয়াটা আছে। কেমন একটা সিরসিরে ভাব যেন।

ট্রেনে থাকতেই নানুদার জ্বরটা বেড়েছে।

স্মাহি প্ল্যাটফর্মের এক পাশে দাঁড়িয়ে বলল, 'তোমরা আর হেঁটো না। রিক্সা করে চলে যাও। আমি ক্রোসিন কিনে নিয়ে যাচ্ছি। আজ তো আর ডাক্তার পাবে না। কাল সকালেই নাহয় একবার ব্যানার্জি ডাক্তারকে দেখিয়ে নিও। আমি একটু পরে আসছি।'

রিতাদি সামান্য ঘাবড়ে গেছে। তাই আর কিছু আপত্তি করল না। ডুবুকে কোলে নিয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে গেল স্টেশানের শেষ মাথার দিকে। ওদিকে রিক্সা স্ট্যান্ড আছে।

স্মাহি বোঝে রিতাদির চিন্তার ব্যাপারটা। নানুদা খুব ভাল গান করে। ট্রেনে মোটামুটি রোজগার হয়। কিন্তু তার মধ্যে যদি আচমকা বসে যায় কয়েকটা দিন তাহলে সত্যি খুব মুশকিল!

স্মাহি দেখল রিতাদিরা আস্তে আস্তে প্ল্যাটফর্মের ঢাল বেয়ে নেমে গেল। ও এবার ডান দিকে কিছুটা এগিয়ে গেল।

লম্বা শেডের পাশের বড় পিলারটার কাছে বসে আছে জটাদাদু। স্মাহি গিয়ে দাঁড়াল ওর সামনে। জটাদাদু আজ সবে এসেছে। ঝোলা খুলে একটা আসন বের করে পাততে। পাশে পুরনো হারমোনিয়ামটা রাখা।

ও দাঁড়াতেই জটাদাদু মুখ তুলে তাকাল, 'কীরে আজ এখন?'

স্মাহি কিছু না বলে হাসল। তারপর ব্যাগের থেকে একটা একশো টাকার নোট বের করে এগিয়ে দিল, 'এটা রাখো আজ। কিছু কিনে খেও!'

জটাদাদু দেখল নোটটা। তারপর মুচকি হেসে বলল, 'হ্যাপি বার্থ ডে!'

কী! চমকে উঠল স্মাহি! কী বলল দাদু! আজ জন্মদিন জানল কী করে? ও অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল।

জটাদাদু পাশের ঝোলার থেকে একটা প্যাকেট বের করল। সুন্দর করে প্যাক করা একটা বাক্স! কী আছে এতে? জটাদাদু এটা দিচ্ছে ওকে?

জটাদাদু বলল, 'আমি দিচ্ছি না। একজন দিয়ে গিয়েছে। বলেছে আজ তোর জন্মদিন। যেদিন দেখা হবে সেদিন যেন তোকে দিয়ে দেই!'

স্মাহি তাকাল জটাদাদুর দিকে, 'কে দিয়েছে এটা? কেউ তো জানে না আমার আজ জন্মদিন! কেউ তো নেই আমার!'

জটাদাদু হাসল সামান্য। তারপর মাথা নেড়ে বলল, 'জানে রে জানে। যে জানার সে জানে। যে মনে রাখার সে রাখে! সব সময় তো বলার সুযোগ থাকে না। এবার সুযোগ পেয়েছে, তাই দিয়ে দেছি!'

'কিন্তু কে দিল?' স্মাহি অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল জটাদাদুর দিকে!

জটাদাদু হাসল আবার। বলল, 'সে বলা বারণ। কথার খেলাপ আমি করতে পারব না। শুধু এটুকু বলি তোর কেউ নেই এটা ভাবিস না! আমাদের সামনে কেউ না থাকলেও আড়ালে আড়ালে কেউ না কেউ আমাদের হয়েই থাকে যাও সারা জীবন! জানান দেয় না। কিন্তু থেকেই যায়। বুঝলি পাগলী?'

## ॥ ৮ ॥

### খাত্তিজ

ঘরের বাইরে বেরিয়ে একবার পেছন ফিরে তাকাল তিজু। এমন করে হুট করে না বলে এসে পড়ায় কি রেগে গিয়েছেন মানুষটা। তাই কি এমন করে প্রায় কোনও কথাই বললেন না? সারাক্ষণ শুধু হুঁ হাঁ করে গেলেন নিজের ওই চেয়ারটায় বসে!

তিজুর খারাপ লাগল। ব্যাপারটা ঠিক হয়নি। এভাবে হুট করে চলে আসার আগে একবার ফোন করে জিজ্ঞেস করে নেওয়া উচিত ছিল। মোবাইল নাম্বার তো দিয়েইছেন রাধুবাবু। বলেওছিলেন ফোন করে যেতে। কিন্তু তিজু এতটাই উত্তেজিত ছিল সেই হারিয়ে যাওয়া মানুষটার ঠিকানা পাবার জন্য চলে এসেছিল না বলেই!

'সরি স্যার, আসলে, সাহেবের আজ শরীরটা ভাল নেই। ক্যান্সার পেশেন্ট, বোঝেন তো! নাহলে কিন্তু এমন করেন না। আপনি পরেরদিন আগের থেকে ফোন করে নেবেন। তাহলে দেখবেন আর সমস্যা হবে না।'

তিজু ছেলেটার দিকে তাকাল। লজ্জিত মুখ। অল্প বয়স। বড় জোড় উনিশ কী কুড়ি হবে! দেখে মনে হচ্ছে ছেলেটাই কোনও অপরাধ করেছে!

তিজু হেসে ছেলেটার কাঁধে হাত দিয়ে আলতো করে চাপড় মারল। তারপর জিজ্ঞেস করল, 'উনি কি একাই থাকেন?'

'হ্যাঁ স্যার। একাই। আসলে আমি সারাদিন থাকি। তারপর রাত

আটটা নাগাদ চলে যাই। নীচের সিকিউরিটি ডেস্কে থাকেন মহাবীরদা উনি রাতে দরকার পড়লে সাহেবের কাজ করে দেন। তেমনই বলা আছে।'

'থ্যাঙ্কস,' তিজু হাসল, 'আমি পরের দিন নাহয় ফোন করেই আসব। আসলে তোমার বাবুর থেকে আমার অনেক কিছু জানার আছে! তাই... মানে... বাই দ্য ওয়ে তোমার নাম কী?'

'কার্তিক! আর নিশ্চয় আসবেন স্যার। সাহেব খুব ভাল মানুষ! আজ শুধু কী যে হয়েছে!' কার্তিক আমতা আমতা করল আবার।

তিজু আর সময় নষ্ট না করে পেছন ফিরে সিঁড়ির দিকে এগিয়ে গেল।

এলগিন রোডের কাছে এই ফ্ল্যাটটা বেশ উঁচু। পনেরো তলা। যদিও অভিনব রাওয়াত থাকেন দোতলায়। গোটা বাড়িটার জন্য চারটে লিফট আছে। কিন্তু তিজু আর লিফটে চড়েনি! দোতলায় ওঠার জন্য অমন কল বাটন টিপে দাঁড়িয়ে থাকার কোনও মানে হয় না!

নামার সময়ও লিফট ব্যবহার করল না তিজু। ধীর পায়ে নেমে এল নীচে।

সিঁড়ি দিয়ে নেমে রিসেপশান কাম সিকিউরিটি ডেস্ক। সেখানে গোমড়া মুখে দুজন সিকিউরিটি উর্দি পরে বসে রয়েছে। তিজুর দিকে ভারি চোখ তুলে অনিচ্ছুক ভাবে তাকাল তাদের একজন। তিজু ভেবেছিল একটু কথা বলবে। কিন্তু লোক দুটোর মুখ দেখে ভক্তি চটকে গেল।

সিঁড়ি দিয়ে নেমে এই লাউঞ্জের মতো জায়গাটা বেশ বড়। সুন্দর করে সাজানো। যেন কোনও হোটেল! ও দেখল এক পাশের সোফায় জগন বসে রয়েছে। হাতে ধরা মোবাইলটা নিয়ে কীসব খুট খুট করছে।

ওকে দেখেই উঠে দাঁড়াল, 'কথা হল দাদা? যাকে খুঁজছেন তার ঠিকানা পেলেন?'

তিজু মাথা নাড়ল, 'আসলে না বলে এসেছি তো। দেখলাম কেমন একটা অসন্তুষ্ট যেন! পরের দিন ফোন করে আসব।'

'ফোন করবেন কী করে! যাক গে! তবে আর কী! চলুন! বাড়ি যাবেন তো? নাকি...'

তিজু ঘড়ি দেখল। সন্ধে হয়ে গিয়েছে অনেকক্ষণ। আজ ঠান্ডাটাও পড়েছে বেশ। সাড়ে সাতটা বাজে। আর কোথায়ই বা যাবে! বাড়ি গেলেই হয়!

'কী দাদা, বৌদির সঙ্গে দেখা করতে যাবেন না একদিনও!' কথাটা খুব সাবধানে বলল জগন, 'না মানে দেখা করতেই পারেন। আপনাকে খুঁজতে এসেছে!'

ওকে খুঁজতে মুকু এসেছে! এটা ভাবতেই কেমন একটা লাগছে তিজুর। মধ্য কলকাতার একটা বড় হোটেলে উঠেছে। জগনের থেকে শুনেছে, কলেজ স্ট্রিটে পিসির বাড়িতেও গিয়েছিল। কিন্তু কেন!

তিজু বোঝে যে মুকু নিজে আসেনি। নিশ্চয় দীপন বলে-কয়ে রাজি করে পাঠিয়েছে! লোক জানা-জানি যাতে না হয়! যাতে ওদের বদনাম না হয় তাই মুকুকেই পাঠিয়েছে! কিন্তু মুকু কেন রাজি হল আসতে! মুকু তো বলেইছিল তিজুর মতো আত্মকেন্দ্রিক আর স্বার্থপর একটা মানুষের সঙ্গে ও আর কোনও যোগাযোগ রাখতে চায় না!

তিজু বড় বাড়িটা থেকে বেরিয়ে রাস্তায় এসে দাঁড়াল। এক পাশে অলিভ রঙের মোটর বাইকটা রাখা আছে। ও আকাশের দিকে তাকাল। কেমন একটা পাতলা সর পড়ে আছে শহরে মাথায়। ধোঁয়াশা!

মুকু বিয়ের পরপর বলত, 'আমরা কেন দিল্লী ছেড়ে অন্য কোথায় যাচ্ছি না! ভাল লাগে না এখানে থাকতে আমার?

সেই কলেজ জীবনের প্রেম ওদের। কয়েক বছরের সিনিয়ার ছিল তিজু। কলেজে প্রথম দিন দেখেই মুকুকে ভাল লেগে গিয়েছিল ওর। কেন কে জানে মনে মনে বলেছিল, 'এই মেয়েটাকেই আমার চাই!'

মুকু সহজে যদিও রাজি হয়নি। প্রায় দু বছর চেষ্টা করার পরে রাজি হয়েছিল। সেদিন ওরা কুতুব মিনারের কাছে বসে ছিল। আকাশ ফুঁড়ে উঠে যাওয়া পাথরের মিনারটাকে চিরকাল রকেট মনে হয়েছে তিজুর। কিন্তু সেদিন ওইদিকে মন ছিল না! ও মুকুর দিকে তাকিয়েছিল হাঁ করে!

মুকু আলতো করে ওর হাতে চিমটি কেটে বলেছিল, 'আমার মা কিন্তু তোকে পছন্দ করে না। আমি মায়ের অমতেই এই সম্পর্ক করছি। আমায় কিন্তু কষ্ট দিবি না!'

'দেব না!' মুকুর হাত দুটো শক্ত করে ধরে বলেছিল তিজু। মুকুর হাত দুটো কী যে সুন্দর ছিল! ছোট ঝিনুকের মতো নখ! ককি রঙের নেলপলিশ! মুকুর সামনে বসলে সব গুলিয়ে যেত তিজুর।

মুকু বলেছিল, 'এই হাত ছুঁয়ে বললি কিন্তু! মনে থাকে যেন। মিথ্যে বললে আমি মরে যাব!

'আর তুই? তুই দিবি কষ্ট?' তিজু আগ্রহ নিয়ে তাকিয়েছিল।

মুকু হাত ছাড়িয়ে নিয়ে কপালের ওপর এসে পড়া চুল সরিয়ে দিয়ে বলেছিল, 'গ্যারান্টি দিতে পারছি না! দিতেও পারি! এখনও ভেবে নে! টাইম আছে। কষ্ট দিতে পারি কিন্তু!'

তিজু হেসে বলেছিল, 'ভাবনা সব হয়ে গিয়েছে! আর টাইম নেই ব্যাক গিয়ারের। কষ্ট দিলে সামলে নেব ঠিক!'

সামলে নেবে কষ্ট! ঠিক সামলে নেবে? সামলাতে পারল কী! সামলাতে পারলে আজও কেন মুকুর মুখ মনে পড়লে এমন করে কাঁটা বিঁধে যায় মনের মধ্যে! চোখ ছালা করে! কষ্ট আর অভিমানে বুজে আসে পৃথিবী!

মিনারের থেকে সামান্য দূরে একটা জায়গায়, ভাঙাচোরা একটা দেওয়ালে অনেকের মতো ও নিজেও ইট দিয়ে লিখেছিল 'তিজু প্লাস মুকু'!

আজ এতদিন পরে কলকাতা শহরের এই রাস্তায়, সন্ধ্যের আবছায়ায় মধ্যে দাঁড়িয়ে সেই দেওয়ালটার কথা মনে পড়ে গেল তিজুর! মনে হল যতদিন না ওই দেওয়ালটা কেউ ভেঙে ফেলছে অন্তত ওইখানে মুকুর পাশে থেকে কেউ সরাতে পারবে না ওকে!

'আমায় একটু ছেড়ে দেবেন রাসবিহারী মোড়ে?' জগন তাকাল তিজুর দিকে।

তিজু হেসে 'ঠিক আছে' বলতে গেল। কিন্তু পারল না। তার আগেই জগনের ফোনটা বেজে উঠল।

জগন ফোনটা দেখে 'একটু আসছি' বলে সরে গেল এক পাশে। তারপর নিচু গলায় কীসব কথা বলতে লাগল।

এই ছেলেটা সত্যি খুব অদ্ভুত। কী যে কাজ করে এখনও জানতে পারল না। জিজ্ঞেস করলেই বলে, 'আমি কাজ করি না দাদা। বসে খাই। বাবা দাদা টাকা পাঠায় গ্রাম থেকে! গজব লাইফ! রিটায়ার্ড আমি!'

এমন একটা ছেলেকে যদি ব্যারির ওই চ্যানেলের জন্য পাওয়া যায়!

ব্যারির কথা মনে পড়তেই হাসি পেল। লোকটা রেগে গিয়েছে খুব। ভুবন গোঁসাই বলে একজনের সঙ্গে নাকি কথা বলছে ব্যারি। এই ফিল্ডের বহু দিনের লোক। কিন্তু তাও তিজুর কথা জানতে চাইছে ব্যারি। কবে থেকে কাজে যোগ দেবে জানতে চাইছে।

তিজু এখনও স্পষ্ট কিছু বলতে পারেনি। আসলে যাঁকে খুঁজতে দুম করে বেরিয়ে এসেছে তার খবর না পেয়ে যায় কী করে! ওর যে কী হচ্ছে মনের মধ্যে সেটা ব্যারিকে বোঝানো সম্ভব নয়! আসলে কাউকেই সম্ভব নয়! দীপন পর্যন্ত বুঝতে পারেনি!

এখনও তো দীপনের অবাক মুখটা দেখতে পায় ও। দীপন বড্ড ভালবাসে ওকে। বয়সে বেশ কিছুটা ছোট। তারওপর স্পাইনে চোট পেয়ে এখন হুইল চেয়ার বাউন্ড হয়ে গিয়েছে। ডাক্তার বলেছে যদিও সব ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু সময় লাগবে! এই সময়ে হয়ত এভাবে ওকে না জানিয়ে এভাবে চলে আসাটা ঠিক হয়নি! হয়ত মুকুর, 'তুই স্বার্থপর' কথাটাই আবার নতুন করে ওর ওপর প্রযোজ্য। কিন্তু উপায় কী! এই ব্যাপারটা তো জানতেই হবে ওকে! এই লোকটা কে না জানলে তো সারা জীবনেও শান্তি পাবে না!

মায়ের সেই সময়ে কথাটা তো এখনও কানে বাজে! একটা মাত্র কথা! কিন্তু কী ভাবেই না পালটে দিল সব!

'কেন তুমি খুঁজতে চাইছ তাকে? কী হবে?' রাধুবাবু অবাক হয়ে তাকিয়েছিলেন ওর দিকে।

সেদিন আনোয়ার শা রোডে রাধুবাবু বাড়িতে গিয়েছিল তিজু।

দোতলা বাড়ি। সামান্য পুরনো। কিন্তু বেশ অনেকটা জায়গা নিয়ে তৈরি করা!

আগের দিন শুনেছিল রাধুবাবু পুরী গিয়েছেন। তাই ওকে অপেক্ষা করতে হয়েছিল।

সেদিন সন্ধ্যেবেলা রাধুবাবুর বড় ছেলে নিজেই দরজা খুলে দিয়েছিল। তিজুকে চিনতে পেরে বলেছিল, 'আসুন। বাবা এসে গেছেন। আমি বলেছিলাম আপনার কথা। আপনি বসুন এক্টু।'

বসার ঘরটা বেশ বড়। পুরনো দিনের আসবাবে সাজানো। তবে সবটাই ঝকঝকে পরিষ্কার! চারিদিকে নানান ছবি টাঙানো! পেইন্টিং! কয়েকটা 'আসল' যামিনী রায় নকে হয়েছিল তিজুর।

'হ্যাঁ ভাই বলুন।' সাদা লেসের পর্দা সরিয়ে একজন বয়স্ক মানুষ ঢুকে এসেছিলেন ঘরে! তিজু উঠে দাঁড়িয়ে নমস্কার করেছিল। মানুষটা তিজুকে দেখে কেমন যেন থমকে গিয়েছিলেন!

ফর্সা, বেঁটে মানুষ! উলটো করে আঁচড়ানো চুল। অবাক হয়ে তাকিয়েছিলেন তিজুর দিকে!

তিজু নিজের পরিচিয় দিয়ে বলেছিলেন, 'আমি দিল্লী থেকে আসছি। আমার নাম ঋত্বিজ মুখার্জি! আসলে আমার মাকে আপনি বোধহয় চিনবেন! কমলিনী মুখার্জি। বিয়ের আগে সান্যাল ছিল! আমি মায়ের কাছ থেকে আপনার কথা শুনেছি। তাই...'

রাধুবাবু ধীর পায়ে এসে বসেছিলেন সামনের চেয়ারে। তারপর সময় নিয়ে বলেছিলেন, 'কমলিনী! সে পাঠিয়েছে? কেন? ও কেমন আছে?'

কেন! কীভাবে এবার বলবে ও! তাও বলেছিল, 'আমি... মানে... আপনি তো এক সময় মায়ের খুব ভাল বন্ধু ছিলেন! তাই মা বলল... মানে বলেছিল...। আসলে মা আর নেই। মারা গিয়েছেন। আর যাওয়ার আগে বলে গিয়েছেন আমায়! বলেছেন আপনি জানেন সবটা। মানে ওই ব্যাপারটা। তাই...'

রাধুবাবু মাথা নামিয়ে নিয়েছিলেন। তারপর খানিক ভেবে বলেছিলেন, 'সব কী আর আমি জানি! যে সময়ে আমরা যুবক ছিলাম, কলকাতা খুব একটা শান্ত শহর ছিল না। সেই সত্তর একাত্তর খুব কঠিন সময় ছিল আমাদের। কমলিনী ফিজিক্স নিয়ে পড়ত। খুব দামাল ছিল। জড়িয়ে পড়েছিল আন্দোলনে! আমাদের চারজনের গ্রুপ ছিল একটা। আমি, কমলিনী, অভিনব আর লব! তারপর... আমি তো চলে গিয়েছিলাম বিদেশে। পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল আসলে আমায়। ওদের তিনজনের যোগাযোগ ছিল। পরে আমি খবর পাই যে কমলিনী নানান বিপদে আছে। ওর বাড়ির লোকেরা ওকে একরকম বাঁচাতেই দিল্লীতে বিয়ে দিয়ে দিয়েছিল জোর করে! সরি, জোর করে কথাটা আমার বলা ঠিক হয়নি!

'না না, ইটস অল রাইট।' তিজু বলেছিল সঙ্গে সঙ্গে।

আসলে মায়ের সঙ্গে বাবার বিয়েটা সম্বন্ধ করেই দেওয়া হয়েছিল। বাবা কলকাতার ছেলে হলেও দিল্লীতে সেক্রেটারি লেভেলে বড় চাকরি করত। খুব সাহেবী ধাঁচের মানুষ ছিল। পরে বড় ব্যবসাও করেছিল। কিন্তু মায়ের সঙ্গে তেমন ভাল কিছু সম্পর্ক ছিল না। সেটা ওরা দুই ভাই-ই বুঝতে পারত! তবে বাবার অন্য মহিলার সঙ্গেও সম্পর্ক ছিল না। সারাক্ষণ কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকত। মা কেমন যেন আনমনা ধরনের ছিল। ছোটবেলায় কয়েকবার লুকিয়ে মাকে কাঁদতেও দেখেছে তিজু। কিন্তু কেন সেটা বোঝেনি।

একবার তো ও জিজ্ঞেস করেছিল, 'কেন তুমি কাঁদো মা? বাবা বকেছে?'

'না সোনা! ক্লাস ফাইতে পড়া ছোট্ট তিজুকে জড়িয়ে ধরেছিল মা।

'তবে তোমার কীসের কষ্ট মা?' তিজু মায়ের গায়ের থেকে ভেসে আসা কর্পূর-চন্দনের গন্ধে ডুবে যেতে যেতে জিজ্ঞেস করেছিল।

মা আলতো ভাবে ওর মাথায় হাত বুলিয়ে বলেছিল, 'এখন বললে তুই বুঝবি না বাবা!

'কেন বুঝব না! আমি বড় হয়ে গিয়েছি! তুমি বলে দেখো! আমি বুঝব ঠিক।' জেদ করেছিল তিজু!

মা সামান্য সময় নিয়েছিল। তারপর বলেছিল, ' "He was my North, my South, my East and West, / My working week and Sunday rest, / My noon, my midnight, my talk, my song; / I thought that love would last for ever : I was wrong." বুঝলি কিছু?'

তিজু তাকিয়েছিল মায়ের দিকে। আবছা মতো কিছু একটা বুঝেও যেন বুঝতে পারছিল না ও।

মা বলেছিল, 'বলব তোকে। ঠিক সময়ে একদিন বলব। দেখিস!'

রাধুবাবুর কথায় আবার সেই বিকেলবেলাটা মনে পড়ে গিয়েছিল ওর।

রাধুবাবু বলেছিলেন, 'তোমায় অভিনবের নাম্বার আর ঠিকানা আমি দিচ্ছি। ওকে ফোন করে যেও। ও বলতে পারবে তুমি যা জানতে চাইছ! তবে ও খুবই অসুস্থ মানুষ। সেটা মাথায় রেখো!'

'অনেক ধন্যবাদ!' তিজু হেসেছিল সামান্য।

রাধুবাবু তাকিয়েছিলেন ওর মুখের দিকে। তারপর বলেছিলেন, 'কমলিনী আমার বোনের মতো ছিল। ও নেই জেনে খুব কষ্ট পেলাম। কিন্তু তোমায় বলছি, কী দরকার পুরোনো ভিনিস খুঁড়ে বের করার। যেভাবে আছে সেভাবে থাকতে দাও না।'

তিজু সামান্য হেসে বলেছিল, 'আমার এটা জানা দরকার! সত্যি বলছি!

রাধুবাবু মাথা নামিয়ে বলেছিলেন, 'অভিনবের কাছে যেও। দেখো যদি গুপ্তধন খুঁজে পাও!

'দাদা,' জগন এসে দাঁড়াল সামনে, 'যাবেন না?'

'হ্যাঁ।' তিজু বাইকে বসল।

'একটা কথা!' জগন আবার বলল।

'কী?'

'দাদা আপনার শাশুড়ি মা এন্ট্রি নিয়েছেন, খবর পেলাম!

'মানে?' বুঝতে পারল না তিজু।

'আরে আপনার শাশুড়ি। বৌদির মা। লক্ষ্ণৌ থেকে এসে হাজির হয়েছেন! জগন বলল।

'তুই এখনও এসব করছিস!' অবাক হয়ে তাকাল তিজু!

'আরে দাদা আমি রিটায়ার্ড মানুষ। কী করব আর! ওই টাইম পাস করি। তা কেসটা কী দাদা? এদিকে আপনি কিছু খুঁজছেন! ওদিকে আপনাকে কেউ খুঁজছে! ভুলভুলাইয়া পুরো!'

তিজু মোটর বাইকে স্টার্ট দিয়ে বলল, 'বেস পড়। সব কিছু বোঝার মতো বয়স তোর হয়নি!

'সেকি! আমি থার্টি টু! বুঝব না!' জগন অবাক হল।

'নকশাল। দিল্লী! ডাব্লিউ.এইচ. অডেন। বুঝলি কিছু?' তিজু তাকাল।

জগন হাসল, 'আমায় ভাল মানুষ পেয়ে গাল্ডু বানাচ্ছেন!

'মানে?' হাসল তিজু।

জগন বাইকের পেছনে বসে মাথায় হেলমেট পরে বলল, 'আজকালকার দিনে ভাল মানুষদের ডাকনাম গাল্ডু, জানেন না?'

## ॥ ৯ ॥

### আদিত

কাকুলিয়া রোডের এই গলির পেটের মধ্যে পাক খাওয়া আরও সব ছোট সরু গলি যেন কলকাতার নাড়িভুড়ি! বাবাকে নিয়ে বাড়ি ফেরার পথে এমনটায় মনে হয়েছিল আদিতের।

আজ বাবাকে নিয়ে সকালবেলা ডাক্তার দেখাতে নিয়ে গিয়েছিল। হার্টের পেশেন্ট। তার সঙ্গে আরও নানান সমস্যা আছে। সারাক্ষণ

বিছানাতেই শুয়ে থাকে। দেখলে কে বলবে এক সময় এই মানুষটা এত কাজ করত!

স্নান হয়ে গিয়েছে আজ আদিতের। সকাল সকালই করে নিয়েছে! বাবাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যেতে মাকুও সঙ্গ দিয়েছিল। ছেলেটা এখন বাবার ঘরে বসে খবর কাগজ পড়ছে!

বাবাকে বাড়িতে এনে আদিত একটু বাজার করে এনেছে। সামান্যই সবজি বাজার। মা ফ্রিজে রেখে খেতে পছন্দ করে না! ওদের ফ্রিজটা বহু পুরোনো। সেই আশি সালে কেনা! 'জেব' বলে একটা কোম্পানির! সে কোম্পানি এখন আর নেই নিশ্চয়। নিরামিষ জিনিস রাখা হয় ওতে। মা গোপালের পুজো করে। তার জন্যই ফ্রিজটা ব্যবহার করা হয়।

বাজার করে দিয়ে রান্না ঘরে বসেই রুটি তরকারি খেয়ে নিয়েছে আদিত। ওর খাবারের ঝামেলা নেই। কিছু একটা হলেই হল। মা মাকুকে ঘরেই দিয়েছে খাবার। ওদের রান্নাঘরটা ছোট। পাশাপাশি দুজন বসে খেতে পারে না!

খাওয়া শেষ করে বারান্দার পাশের ছোট বেসিনে হাত মুখ ধুয়ে নিল আদিত। এখান থেকে ওর ঘরের দেওয়ালে ঝোলানো ঘড়িটা দেখা যায়। ও তাকাল সেই দিকে। সাড়ে নটা বাজে। বেশ দেরি হয়ে গেল। রাজুদা দশটার সময় পৌঁছতে বলেছিল। এখান থেকে লেক গার্ডেন্স যাওয়ার সোজা কোনও পথ নেই!

আজ একবার সাদেক্সবাদ যাওয়ার কথা। অক্টোবর আর নভেম্বরের মাইনে এখনও দেওয়া হয়নি ফ্যাক্টরিতে। পুজোর বোনাসও দেওয়া হয়নি। এটা ঠিক হচ্ছে না। রাজুদা ওকে বলেছে ব্যাপারটা দেখতে। আজ একটা মিটিং করে নেবে। সেখানে কোম্পানির চিফ অ্যাকাউনটেন্ট আর ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার থাকবেন। আজ ওদের অফিসিয়াল দিয়ে দেওয়া হবে। সাত দিনের মধ্যে সব বকেয়া মিটিয়ে না দিলে লাগাতার ধর্মঘট চলবে!

মুখ ধুয়ে নিজের ঘরে গিয়ে জুতা মানিব্যাগ আর ঘড়িটা নিয়ে নিল। আর দেরি করা যাবে না। এখান থেকে হেঁটে গোলপার্ক। সেখান থেকে অটো ধরে রবীন্দ্রসরোবর স্টেডিয়াম। তারপর বাকিটুকু হাঁটা। সময় লাগবে।

একবার আয়নার সামনে দাঁড়াল আদিত। চুলটা আঁচড়ে নিল। বড় হয়েছে সামান্য। কাটিয়ে নিতে হবে। সাধারনত ছোট চুল রাখে আদিত। স্মাহি বলত, 'তুমি এত ছোট করে চুল কাট কেন? কেমন লাগে!'

কেমন লাগে? নিশ্চয় খারাপ লাগে! মানে লাগত। তাই তো ওভাবে তাড়িয়ে দিয়েছিল!

ভাবলেই এখনও চোখের কোণাটা জ্বালা করে ওর। কেমন কষ্ট হয় শ্বাস নিতে! রাগও হয় নাকি! হয় তো! রাগও হয়! বাবা যে বলে 'জয়' সেটা এখনও পারেনি! নিজেকে 'জয়' করতে পারেনি আদিত!

বাবা সারাদিন বিছানায় শুয়ে থাকে। আর নানান বই পড়ে। খুব কম কথা বলে মানুষটা। কিন্তু যেটুকু বলে তাতেই জীবনের অনেক কিছু স্পষ্ট হয়ে যায় আদিতের।

কয়েকদিন আগে খুব মনখারাপ ছিল ওর। রবিবার ছিল তাই। স্মাহির জন্মদিন ছিল। ওই দিনটা এলেই কেমন যেন লাগে ওর। কোথায় যেন মনে মনে মরে যায় ও। আর এই বার তো আরওই কষ্ট হয়েছিল। এতদিন কোথায় ছিল মেয়েটা জানত না। কিন্তু এখন যেই জেনে গিয়েছে তাই মনখারাপটা বেশি।

সেদিন ট্রেন থেকে নেমে স্মাহিকে দেখে তো অবাক হয়ে গিয়েছিল। তারপর মনে হয়েছিল কী করছে এখানে ও! সেদিন স্মাহি আর ওই ঝট পরা চুলের মানুষটার মধ্যের কথাবার্তা আড়াল থেকে যেটুকু শুনেছিল তাতে বুঝেছিল ওদের ভালই যোগযোগ আছে!

তাই জন্মদিনের আগের দিন বিকেলে একটা ছোট্ট উপহার প্যাক করে ও নিয়ে গিয়েছিল স্টেশানের সেই মানুষটার কাছে।

লোকটা তখন হারমোনিয়াম বাজিয়ে গান গাইছিল। আসা যাওয়ার পথে সামান্য পয়সাও পড়ছিল বাটিতে। গানটা শেষ হওয়া অবধি ও দাঁড়িয়েছিল দূরে। তারপর গান শেষ হলে পায়ে পায়ে গিয়েছিল সামনে।

লোকটি হয়ত ভেবেছিল আদিত কিছু পয়সা দিয়ে এসেছে। কিন্তু কিছু না বলে আদিত যখন সামনে হাঁটু মুড়ে বসেছিল, তখন লোকটি নিজেই জিজ্ঞেস করেছিল, 'কিছু বলবে ভাই?'

আদিত তাও ইতঃস্তত করেছিল। তারপর দ্বিধার সঙ্গে বলেছিল, 'আসলে আমার একটা অনুরোধ আছে!'

'বলো।' লোকটি হাসি মুখে তাকিয়েছিল ওর দিকে।

'আপনার কাছে সেদিন একটি মেয়েকে দেখেছিলাম। মানে সন্ধের মুখে। ফর্সা। দোহারা চেহারা। বাঁ হাতের অনামিকায় একটা সবুজ আংটি পরে। ঠোঁটের ওপর কাটা দাগ! মানে...'

'স্মাহি...' হেসেছিল লোকটা।

'এটা তার জন্য। ওকে কি আপনি দিয়ে দিতে পারবেন? সেদিন কথা শুনে মনে হল আপনাদের মাঝে মাঝে দেখা হয়।'

লোকটা ওর হাতে ধরা প্যাকেটটা দেখেছিল। তারপর হেসে বলেছিল, 'তুমি ওকে চেনো? নাকি...'

'না না। আমি চিনি। অনেক দিন আগে থেকে চিনি। কিন্তু আর যোগযোগ নেই। আসলে...' কী বলবে বুঝতে না পেরে সামান্য থমকে গিয়েছিল আদিত। তারপর বলেছিল, 'কাল ওর জন্মদিন। তাই... প্লিজ দিন দিয়ে দেন। কিন্তু বলবেন না আমি দিয়েছি। এটাই আমার অনুরোধ।'

লোকটা কী ভেবেছিল কে জানে। সামান্য চিন্তা করেছিল। তারপর হাত বাড়িয়ে প্যাকেটটা নিয়ে বলেছিল, 'এসব নিজেকেই দিতে হয়। যা ঝামেলা হয়েছে মিটিয়ে নিতে হয়। স্মাহি খুব দুঃখী মেয়ে। একা থাকে। কেউ নেই ওর। ওরও তো কাউকে দরকার!'

আয়নায় নিজের দিকে তাকাল আদিত। এখন কষ্টে আছে স্মাহি। এখন কেউ নেই ওর! কেন নেই! জেঠু, জেঠিমা, দাদা, বোন পিসিরা, সবাই তো ছিল! সবাই গেল কোথায়! আর সেই ব্যাপারটা! সেটার কী হল! আচ্ছা স্মাহি ভাল নেই জেনে ওর কি কোথাও একটা ভাললাগা এসেছিল! কোথাও কি মনে হয়েছিল, ওকে কষ্ট দেবার ফল পেয়েছে স্মাহি!

সেই প্যাকেটটা দিয়ে আসার পর থেকে খুব মনখারাপ ছিল আদিতের। দু তিনদিন বাড়ি থেকে বেরয়নি। নিজের ঘরেই বই নিয়ে বসেছিল। কিন্তু আসলে বই পড়ছিল না। শুধু বসেই ছিল।

বাবা পুরো ব্যাপারটাই লক্ষ্য করেছিল। দুই ঘরের মাঝের জানলা দিয়ে বাবা দেখছিল আদিতকে। তারপর একদিন রাতে ডেকে নিয়ে বসিয়েছিল নিজের পাশে।

আদিত ঘরে এসে স্বাভাবিক ভাবে তাকিয়েছিল বাবার দিকে। জিজ্ঞেস করেছিল, 'কিছু বলবে?'

বাবা সামান্য সময় নিয়ে হাতের ভর দিয়ে উঠে হেলান দিয়েছিল বালিশে। তারপর দুর্বল গলায় বলেছিল, 'আমাদের ভাষায় জানিস তো দুটো শব্দ আছে। জয় আর বিজয়! দুটোর পার্থক্য জানিস?'

'নাতো।' আদিত তাকিয়েছিল বাবার দিকে।

বাবা বলেছিল, 'বিজয় মানে এমন একটা অবস্থা, যেখানে একজন জিততে আর অন্য জন পরাজিত হবে। মানে এটা একটা এক্সটারনাল ব্যাপার। দুজন আলাদা মানুষের ব্যাপার। আর জয় হল মানুষের নিজের ব্যাপার। একার ব্যাপার। তার রিপু, তার ইচ্ছে, তার মনের ন্যায় অন্যায়ের ব্যাপার। সেটাকে হারিয়ে দেওয়াটাই জয়। এই জয় সকলের কাম্য। তোরও এটা মনে রাখা উচিত। এমন করে মনমরা হয়ে থাকিস না। যে জন্য তোর মনখারাপ, সেটা জয় করার চেষ্টা কর।'

'বুড়ো,' মা এসে ঘরে ঢুকল এবার।

আদিত ঘুরে তাকাল।

মা বলল, 'ভুবন ফোন করেছিল। কিছু ঠিক করলি চাকরির ব্যাপারে? ভুবন বলছিল তোকে যেন বলি। পার্টি পলিটিক্সের কী অবস্থা তুই দেখছিস তো! কটা ভাল লোক আছে বল! এখানে তো টিকে থাকবি কী করে? তুই কাজটা নে বুড়ো!

আদিত দীর্ঘ শ্বাস ফেলল শুধু, মাকে কিছু বলার মানে হয় না। মা বুঝবে না। জানে ওই সংসারে টাকার দরকার। কিন্তু এই জায়গা থেকে বেরতে গেলে ওর টাকার চেয়েও আরও বেশি কিছু কারণ দরকার। তাছাড়া স্মাহি এসে গেছে এই অঞ্চলে! সেখানে কী করে এখন ও নয়ডা চলে যাবে? না স্মাহির সামনে ও যাবে না। কথাও হবে না। কিন্তু একই জায়গায় তো থাকবে! কাছাকাছি তো থাকবে! দূর থেকে হঠাৎ কোনও কোনও দিন তো দেখাও হয়ে যাবে। ওর এই সামান্য জীবনে সেটাই তো একটি মাত্র সুখ!

উত্তর না দিয়ে আদিত পাশের ঘরে গেল। মাকু বাবার পাশে পড়ে থাকা রেডিওটা নিয়ে কীসব খুটখাট করছে। ওকে দেখে রেডিওটা রেখে উঠে দাঁড়াল।

দুজনে মিলে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ল এবার। এই গলির পাশে বড় বড় পুরোনো দিনের বাড়ি আছে। রোদ খুব একটা আসে না। জ্যাকেটের পকেটে হাত ঢুকিয়ে জুতে হাঁটতে লাগল আদিত। শীতটা ভালই পড়েছে এবার। রাস্তাঘাট বেশ ভেজা ভেজা। রাতের দিকে কাল খুব কুয়াশা পড়েছিল। আজ ভোরেও বাবাকে নিয়ে ট্যাক্সি করে বেরবার সময় চারিদিক আবছা হয়েছিল কুয়াশায়!

পকেটে ফোনটা বাজে উউল এবার। কে আবার ফোন করল এখন! ও ফোনটা বের করল। একটা অচেনা নাম্বার। ফোনটা কানে ধরল আদিত, 'কে বলছেন?'

'তুই কোথায়!' রাজুদার গলা! কিন্তু এই নাম্বারটা তো ও চেনে না!

'আমি আসছি রাজুদা। রাস্তায় আছি। এই গোলপার্ক থেকে অটো ধরব।'

রাজুদা বলল, 'তাড়াতাড়ি আয়। ট্যাক্সি, ওলা, উবার, যাহোক করে নে। আমি টাকা দিয়ে দেব। দরকার আছে। কুইক।'

কথাটা বলে আর উত্তরের অপেক্ষা না করে ফোনটা কেটে দিল রাজুদা। অবাক লাগল আদিতের। কিছু হয়েছে নাকি! এভাবে তো রাজুদা ডাকে না!

মাকু বলল, 'রাজুদা ডাকছে? চল চল তাড়াতাড়ি চল।'

আদিত তাকাল মাকুর দিকে। হাসি পেয়ে গেল। ভাবটা এমন যেন মাকুকেই ডেকেছে! ও কিছু না বলে পা চালাল দ্রুত।

গোলপার্ক থেকে ট্যাক্সি পেতে অসুবিধে হল না। আজকাল হলুদ ট্যাক্সি খুব একটা বায়না করে না!

কোথায় যাবে বলে পেছনের সিটে গুছিয়ে বসল আদিত।

মাকু পকেট থেকে একটা পান বের করে মুখে পুড়ে চিবোল কিছুক্ষণ। তারপর জানলা দিয়ে পিক ফেলল বাইরে। বলল, 'তোকে ওই ব্যাপারটা বলেছিলাম। সেটা কিছু করলি নাতো!

'কোনটা?' অবাক হল আদিত। মাকু তো সারাদিন কিছু না কিছু বলেই যায়। সব তো মন দিয়ে শোনেই না!

মাকু বলল, 'আরে ওই যে রে। ট্রেনে আলাপ হয়েছিল আমার সঙ্গে। গান গেয়ে বেড়ায় একজন অন্ধ মানুষ! সঙ্গে তার স্ত্রী আছে! নানুদা আর রিতাদি। বলেছি না! আমি বাড়িতেও গিয়েছিলাম কিছুদিন আগে। আময় সিঙারা আর চা খাইয়েছিল। ওদের কথা বলছি!'

আদিতের মনে পড়ে গেল। সত্যি বলেছিল বটে একবার। কিন্তু মনে ছিল না এর।

ও জিজ্ঞেস করল, 'কী হয়েছে?'

'রাজুদাকে বলে ওদের কিছু একটা করে দে না! দারুণ গায় ওরা!'

'কী করবে রাজুদা?' আদিত অবাক হয়ে তাকাল।

'দু:স্থ শিল্পী! একটা কিছু করা। একটা বাচ্চা আছে ওদের। ভারি মিষ্টি! প্লিজ বল না। প্লিজ!'

আদিত হাসল। আর সত্যি বলতে কী ভালও লাগল। এই যে মাকু, ক্ষ্যাপাটে টাইপ। ভুলভাল বলে। এই যে ওর বাবা মা আদিতকে বলে রাজুদাকে বলে ওর কিছু একটা করে দিতে। মাকু কিন্তু একবারও কিছু বলে না সেসব। ও নিজের আনন্দে থাকে। নিজের জন্য ভাবেও না। মনখারাপ করে না। এই যে ট্রেনে আলাপ হওয়া সম্পূর্ণ অপরিচিত মানুষের জন্য কিছু করতে চাইছে এটাতেই বোঝা যায় ছেলেটা কত ভাল! বোঝা যায় এর 'জয়' হয়েছে!

আদিত বলল, 'ঠিক আছে। আমি বলব। জানি না কিছু হবে কীনা। তবে বলব।'

মাকু বলল, 'জানিস ওদের বাড়ির পাশে একটা মেয়ে থাকে। সেদিন আলাপ হল একটু। কী একটা যুক্তাক্ষর দিয়ে নাম। কী দেখতে রে! ব্যাপক! সাংঘাতিক!'

আদিত হেসে বলল, 'সেই জন্য হেল্প করতে চাইছিস নাকি?'

'পাগল! আমার কুত্তার পেট। অত দামি খী হজম হবে না।' মাকু হি হি করে হাসল. 'এসব আমার জন্য নয়। ভাল কোনও ছেলের জন্য। আমি জাস্ট বললাম। তুই চল। তোর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেব। রিতাদি আমায় ফোন করে মাঝে মাঝে। যেতে বলে। ওই মেয়েটার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেব তোর। তোদের দারুণ মানাবে। যাবি?'

আদিত হাসল। বলল, 'আমার জীবনে আর যুক্তাক্ষরের জায়গা নেই। বুঝলি?'

মাকু হেসে বলল, 'বুঝেছি! তুই গুল্লি খাওয়া বাঘ! লাথ খাওয়া প্রেমিক! তুই গ্যাও কেস!'

মাকুকে বাইরে রেখে রাজুদার বাড়িতে ঢুকল আদিত। মাকু বাইরের পার্টির ছেলেদের সঙ্গে গল্প শুরু করেছে। ওকে সবাই বেশ পছন্দ করে। ওর হাবিজাবি কথা শুনতে ভালবাসে সবাই!

রাজুদা নিজের ঘরে বসেছিল। ওকে দেখে ইশারায় আসতে বলল ঘরে। হাত দিয়ে দেখাল দরজাটা বন্ধ করে দিতে।

আদিত দরজা বন্ধ করে একটা বেতের মোড়া টেনে নিয়ে বসল সামনে। ব্যাপারটা কী বুঝতে পারছে না। বাদলদারা অপেক্ষা করে আছে। রাজুদা কী বলতে চায়!

রাজুদা সময় নিল একটু। পাশে রাখা গ্লাস তুলে জল খেল। রুমাল দিয়ে ঠোঁট মুছল। তারপর শান্ত গলায় বলল, 'যে ফোনটা থেকে কল করেছিলাম, সেটা পুশি মানে তোর বৌদির?

'ও!' আদিত কী বলবে বুঝতে পারল না। বৌদির নাম্বার ওর কাছে নেই। থাকার কথাও নয়।

রাজুদা চোয়াল শক্ত করে মাথা নিচু করল। যেন নিজের সঙ্গে কিছু একটা বোঝাপড়া করছে। তারপর মাথা তুলে বলল, 'পুশির ডিপ্রেশানটা বাড়ছে আদিত। ডাক্তার বলছে এটা ভাল লক্ষণ নয়। আমাদের উনি দত্তক নিতে বলছেন! পুশিও রাজি ছিল। কিন্তু সমস্যা হল, ইদানিং ও অন্য কারও বাচ্চা নিতে চাইছে না। সব রকম ট্রিটমেন্ট ফেল করছে। আমি বাবা হতে পারব না। কিন্তু পুশি মা হতে পারবে। তাই... তাই...'

আদিত তাকিয়ে রইল রাজুদার দিকে।

রাজুদা আবার জল খেল একটু। তারপর ঝুঁকে পড়ে আদিতর হাতটা ধরে বলল, 'আমাকে একটা হেল্প কর ভাই। পুশি বলেছে আময়। তাই তোকে বলছি। খুব ভেবেই বলছি। প্লিজ একটু শোন। তোকে দেখতে এত ভাল। তুই সৎ। ভাল বাড়ির ছেলে। পুশি চায়, তোর থেকে বাচ্চা নিতে। তারপর তোকে আমি ভাল কাজের জোগাড় করে দেব। তোকে অন্য কোথাও পাঠিয়ে দেব। টাকা পয়সাও দেব। না না, জানি তুই এসব চাস না। আমি আমাদের জন্য বলছি। তুই পুশিকে একটা বাচ্চা দে! ও নাহলে পাগল হয়ে যাবে এবার! সুইসাইড করবে! প্লিজ আদিত। আমি আমার সব সংস্কার, লজ্জা, দ্বিধা পার করে তোর কাছে হাত পাতলাম। আমি পুশিকে খুব ভালবাসি। ও কষ্ট পাচ্ছে! আমি দেখতে পাচ্ছি না! ও খুব চাইছে। তাই তোকে ফোন করে এমন করে ডেকে আনলাম। কেউ জানবে না। কেউ না। কথা দিচ্ছি! তুই প্লিজ না করিস না! আময় এটা ভিক্ষে দে ভাই! প্লিজ!'

আদিত তাকিয়ে রইল সামনে। কিন্তু রাজুদাকে যেন দেখতে পেল না! ও দেখতে পেল বহু বছর আগে একটা লম্বা টানা বারান্দা! আর সেখানে আলোর নীচে দাঁড়িয়ে ওর দিকে তাকিয়ে রয়েছে একটা মেয়ে! আদিত কী করে, কী বলে সেটার জন্যই যেন অপেক্ষা করছে! মেয়েটার রঙ্গন ফুলের পাঁপড়ির মতো ঠোঁট! আর তার ওপরে ভীষণ অভিমানী

একটা কাটা দাগ!

## ॥ ১০ ॥
## স্মাহি

রেস্টুরেন্টটা বেশ বড়। আর পুরনো। পার্কস্ট্রিটের যে কটা পুরনো খাবারের জায়গা আছে এটা তার মধ্যে একটা। বড় রাস্তা থেকে কাঠের দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকলেই জীবনটা যেন লুডোর সাপের মুখে পড়ে এক ধাক্কায় ষাট দশকের কলকাতায় নেমে যায়!

এখানে চারিদিকে পুরনো কাজ করা চেয়ার টেবল। সিলিঙে কল্কা। লম্বা ঝুলের নক্সাকাটা টেবল ক্লথ। এক পাশে মাছের অ্যাকোরিয়াম! আর সঙ্গে ওয়েটারদের উর্দিটাতেও কেমন যেন উত্তম কুমারের কলকাতার ছাপ!

স্মাহি ঘড়ি দেখে তাকাল। সাড়ে তিনটে বাজে। এবার উঠে পড়তে হবে। না, ফ্যাক্টরিতে আজ যেতে হবে না। কিন্তু বাড়িতে যাবে। শরীরটা ভাল লাগছে না। এমন রেস্টুরেন্টে আসার অভ্যেস নেই। এমন খাবার-দাবার খুব কিছু ভাল লাগে না ওর। তাও আসতে হয়েছে!

স্মাহি আনমনে ঘড়িটা ধরে ডায়ালের ওপরের আলগা রিংটা ঘোরাল। কিটকিট শব্দে ঘুরল ডায়ালটা! ঘড়িটা বেশ সুন্দর। কালো আর লাল রঙের ডিজাইন করা ডায়াল। ওয়েলক্রো দেওয়া বেল্ট! ও হাত দিয়ে ঘড়িটা চেপে ধরে ভাবল, কে দিল এটা ওকে!

জটাদাদু তো কিছুতেই বলল না। এমন কী যে দিয়েছে তাকে কেমন দেখতে সেটাও একবার বলল না! কতবার যে জিজ্ঞেস করেছে! কিন্তু তাও বলল না! শুধু মিটিমিটি হেসে বলেছে, 'কী হবে সব জেনে? জীবনের রহস্য সব জানতে নেই! যদি কপালে থাকে তোর, তবে একদিন ঠিক জেনে যাবি!'

বাড়ি ফিরে, নিজের ঘরের দরজা বন্ধ করে প্যাকেটটা খুলেছিল স্মাহি। দেখেছিল, একটা বাক্স! তার ভেতরে এই ঘড়িটা রাখা! আর রাখা আছে একটা পালক! হলুদ রঙের একটা পালক!

ব্যাস আর কিচ্ছু নেই! প্যাকেটটা উলটে পালটে নানান ভাবে দেখেছিল স্মাহি, যদি কিছু পাওয়া যায়! কিন্তু কিচ্ছু পাওয়া যায়নি! কে দিল এমন একটা জিনিস! কে জানে ওর জন্মদিনের কথা! সারারাত কেমন একটা অস্বস্তি নিয়ে এপাশ ওপাশ করেছিল লেপের মধ্যে! মনে হচ্ছিল কুয়াশার অন্য পাড়ে কেউ একটা দাঁড়িয়ে আছে! তাকিয়ে আছে ওর দিকে। কিন্তু ও তাকে দেখতে পাচ্ছে না!

তবে ঘড়িটা পরেছে ও। সুন্দর ছিমছাম ঘড়ি! ভাল দেখতে! জটাদাদু দেখে বলেছে, 'এই তো। ঠিক করেছিস! সে জানলে খুব খুশি হবে!'

'কে জানলে জটাদাদু?' শেষবারের মতো চেষ্টা করেছিল স্মাহি।

জটাদাদু হেসে বলেছিল, 'সে আছে একজন। প্রাণের মানুষ!'

আবার ঘড়িটা দেখল স্মাহি। কোথায় গেল নীলু! একটা ফোন এসেছে বলে সেই যে বেরিয়ে গেল বাইরে, আর আসার নাম নেই! এখানে এভাবে ও একা আর কতক্ষণ বসে থাকবে!

নীলু, মানে নীলাঞ্জনার ফোন কলটা গতকাল পেয়ে খুব অবাক হয়ে গিয়েছিল স্মাহি। বলেছিল, 'এটা কার নাম্বার! কোন নাম্বার থেকে ফোন করছিস তুই?'

নীলু হেসেছিল, 'আরে আমি কলকাতায় এসেছি। রিতেশের তো ছুটি পড়েছে! ওদেশে ক্রিসমাস একটা বড় ব্যাপার। জানিস নিশ্চয়!'

ভাল লেগেছিল স্মাহির। কতদিন পড়ে কথা হচ্ছে নীলু সঙ্গে! মেসেজে ওই যা একটু টুকটাক কথা হয়। কিন্তু এভাবে কথা হওয়াটা কী যে ভাল লাগছিল ওর! যেন বহু বছর পর ও নিজের কারও কথা শুনছিল! যেন নিজের হারিয়ে যাওয়া জীবনটা আবার ফিরে এসেছিল ওর কাছে।

ও বলেছিল, 'কবে এলি তুই?'

'চার পাঁচদিন হল। কিছু কাজ ছিল তাই আগে যোগাযোগ করতে পারিনি। সরি রে! কাল কিন্তু দেখা করব আমরা। লাঞ্চ করব এক সঙ্গে! পার্ক স্ট্রিটে! মনে থাকে যেন!'

স্মাহি বলেছিল, 'দূর, সরি কীসের! আমার সঙ্গে যোগাযোগ করলি এটাই অনেক!'

নীলু বলেছিল, 'কীসব বলছিস! এখানে এলে তোর সঙ্গে যোগাযোগ করব না! পাগলী তুই! কিন্তু কাল দুটো নাগাদ চলে আসবি কিন্তু!'

'কাল!' সামান্য ইতঃস্তত করেছিল স্মাহি, 'আমার তো অফিস আছে!'

'ম্যানেজ কর। ছুটি নে! খুন কর। ডাকাতি কর। ডু হোয়াট এভার ইউ ক্যান! কিন্তু কাল দুটো। না করলে এটাই আমার আর তোর মধ্যে শেষ ফোন কল!'

ছুটি নেয়নি স্মাহি। ম্যানেজ করেছে। অফিস থেকে সব হিসেবনিকেশ নিয়ে সপ্তাহে একদিন অ্যাকাউন্টস অফিসারের সঙ্গে বসতে হয় ওকে। সেটাই আজকের জন্য ম্যানেজ করে নিয়েছিল ও। সকাল সকাল ও এসে পড়েছিল ক্যামাক স্ট্রিটে ওদের হেড অফিসে! এমনিতেই ফ্যাক্টরিতে টেনশান চলছে! সেই নিয়েই হেড অফিসে সবাই বেশ চিন্তিত ছিল। তাই বেশি সময় হিসেবপত্তর নিয়ে বসতে হয়নি ওকে। একটার মধ্যেই কাজ মিটে গিয়েছিল! হাতে সময় নিয়ে ধীরে সুস্থে হেঁটেই ও এসে পৌঁছেছিল এই রেস্টুরেন্টে। আজ সকালে মেসেজে এখানে দেখা করার কথা বলেছিল নীলু!

আধ ঘণ্টা অপেক্ষা করার পড়ে, স্মাহি দেখেছিল হন্তদন্ত হয়ে নীলু এসে ঢুকল দরজা ঠেলে। টি শার্ট, উইন্ডচিটার আর জিনস! ভাল লাগছিল নীলুকে দেখে। উঠে দাঁড়িয়ে নীলুকে জড়িয়ে ধরেছিল স্মাহি। আর কেন কে জানে আচমকা কোন এক ভুলে যাওয়া ঘরের দরজা খুলে গিয়েছিল যেন! ধরবর করে জল এসে গিয়েছিল ওর চোখে! কতদিন পরে নিজের কোন চেনা স্পর্শ পেয়েছিল ও! নিজের পুরনো জীবনের একটা টুকরো ফিরে এসেছিল ওর কাছে!

নীলু চোখ মুছিয়ে দিয়েছিল ওর। তারপর বসেছিল পাশে। কত কথা যে জমেছিল সেটা নিজেই বুঝতে পারেনি স্মাহি। পাথর সরিয়ে কতদিন পরে যে ফেটে পড়েছিল ঝরণা! প্রজাপতি উড়ছিল সেই ঝরণার পাশে। পাহাড়ি কুয়াশাও যেন জড়িয়েছিল ওড়নার মতো! আর রুক স্যাক কাঁধে দুই ট্রেকারের মতো পাহাড়, ঝরণা, প্রজাপতি আর কুয়াশা ছাড়িয়ে পুরনো দিনের দিকে উঠে যাচ্ছিল দুই বাদ্ধবী!

নীলু একনমষ খাবারের অর্ডার দিয়েছিল। তারপর বলেছিল, 'সব তো হল। তোকে একটা কথা বলব?'

'কী?' তাকিয়েছিল স্মাহি!

নীলু বলেছিল, 'এবার কাউকে নিয়ে আয় নিজের জীবনে!'

স্মাহি কী বলবে বুঝতে না পেরে চুপ করেছিল সামান্য। তারপর বলেছিল, 'তুই জানিস তো কী হয়েছে! কী হয়েছিল?'

'হ্যাঁ বলছি! কেন বলব না?' নীলু বলেছিল, 'জীবন তাতে শেষ হয়ে যায় না! এমন ছেলেমানুষী করিস না! ওই তোর দীপকআকুকে এখনও ধরে রেখেছিস?'

'না, তাকে আর ধরে রাখিনি! সত্যি বলছি রে!' স্মাহি ক্লান্ত গলায় বলেছিল, 'আসলে আমি আর কাউকে বিশ্বাস করতে পারি না! কেউ যে আবার অমন করবে না তার গ্যারান্টি কী! আর আমি নিতে পারব নারে! প্লাস দেখলি তো সবাই কেমন আমায় ভুলে গিয়েছে!'

'তুই জানিস খবর?' এবার যেন সামান্য সাবধান হয়ে গিয়েছিল নীলু!

'কীসের খবর!' অবাক হয়ে তাকিয়েছিল স্মাহি।

'তোর জেঠিমা আর নেই। গত ছমাস আগে মারা গিয়েছে!'

'কী!' স্মাহি স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল শুনে! জেঠিমা নেই! মারা গিয়েছে! কেমন একটা লাগছিল ওর। সামনে রেখে যাওয়া খাবার যেন নামছিল না গলা দিয়ে। জেঠিমা নেই! মানুষটা কোনওদিন খুব কিছু পছন্দ করত না স্মাহিকে। এমন কী এই যে ওর এখনকার এমন একাকী জীবন সেটাও মূলত জেঠিমার জন্য! তাও মানুষটাকে ছোট থেকে দেখে এসেছে! সে নেই জেনে কেমন একটা ভোঁতা কষ্ট হচ্ছিল স্মাহির! কিন্তু কান্না আসেনি। ও হতভম্বের মতো তাকিয়েছিল নীলুর দিকে।

নীলু বলেছিল, 'তোর দাদা দুবাই চলে গিয়েছে। চাকরি নিয়ে। জেঠু আর বোন এখন খড়দায় থাকে। ওই বাড়ি বিক্রি করে দিয়ে চলে এসেছে ওরা।'

স্মাহি কী বলবে বুঝতে পারছিল না। জেঠুদের জীবনে এতটা বদল এসে গিয়েছে! কী করে হল এত কিছু!

ও বলেছিল, 'তুই এখন বলছিস আমায়!'

নীলু বলেছিল, 'আমি দু সপ্তাহ আগে জানলাম। তোর জেঠু ফোন করেছিলেন আমায়। আমাদের পুরনো বন্ধু প্রাণেশকে মনে আছে তোর! তার থেকে আমার নাম্বার পেয়েছিল! আমি আর ওই দেশ থেকে তোকে জানাতে চাইনি। কী রিঅ্যাক্ট করবে কে জানে! তাই সামনে জানালাম!'

স্মাহি মাথা নামিয়ে নিয়েছিল। জেঠুকে খুব ভালবাসে ও! সেই বাবা মা মারা যাওয়ার পরে সেই লোকটাই ওকে আগলে রেখেছিল! বাড়ি থেকে চলে আসার সময় পেছন ফিরে একমাত্র ওই লোকটার জন্যই ওর কষ্ট হয়েছিল! আর আজ সেই লোকটাই এমন করে বেঁচে আছে! ও মাথা নামিয়ে নিয়েছিল। আর যেন দেখতে পেয়েছিল একটা রোদ ছায়ার ডোরাকাটা বারান্দা! শূন্য, একাকী, পরিত্যক্ত!

'সরি সরি,' নীলু এসে বসল এবার সামনে, 'আরে দেখ না ছোট মাসি ফোন করেছিল। রেস্ট্রেন্টের ভেতরে টাওয়ার পাচ্ছিলাম না। তাই বাইরে বেরিয়ে গেলাম। কাল নেমন্তন্ন করেছে। আরে বাবা, তা কথাবার্তা কলকেট তো বলতে পারে। সে না, এখনই বকবক করছে! রাজ্যের কথা এখনই বলতে হবে তাকে!'

স্মাহি হাসল। কী আর বলবে। দেখল, ওয়েটার লোকটি একটা কালো বাঁধানো ডাইরির মতো দেখতে বইয়ের মধ্যে বিল রেখে গেল সামনে। স্মাহির খুব ইচ্ছে করছিল টাকাটা দিতে। কিন্তু ও জানে যা বিল হয়েছে সেটা দেবার মতো টাকা ওর নেই সঙ্গে। নানুদার ছুর হওয়ায় রিতাদিরা কাজে বেরতে পারছে না। গত পরশুই রিতাদি তিন হাজার টাকা ধার নিয়েছে ওর কাছ থেকে। হাত একেবারেই খালি ওর! তাই মাথা নিচু করে বসে রইল স্মাহি।

নীলু বিলটা টেনে দেখে নিল একবার। তারপর একটা কার্ড বের করে ওই ডাইরির মতো দেখতে বইয়ের মধ্যে গুঁজে দিল। হাত তুলে ওয়েটারটির দিকে ইঙ্গিত করল!

স্মাহি বলল, 'তোর কালতু কতগুলো টাকা নষ্ট হল!'

'ভাগ্য! হাসল নীলু, 'খালি বাজে কথা!'

ওয়েটারটি একটা সোয়াইপ মেশিন নিয়ে এল কাছে। পেমেন্ট করে দিয়ে নীলু একটা একশো টাকার নোট রেখে দিল টেবলে। তারপর উঠে পড়ল।

ক্রিস মাস আসছে। ধীরে ধীরে সেজে উঠছে পার্ক স্ট্রিট! রোদ নেই এইদিকে। লম্বা টানা একটা ছায়া সেই হবি স্টেটার থেকে ছড়িয়ে আছে এই ফুরিসেন্স সামনে অবধি! ছানা কাটা একটা ভিড় চারিদিকে। বেশ কিছু বিদেশী মানুষজন ঘুরে বেড়াচ্ছে! অল্প বয়সী ছেলে মেয়েরা বলমলে পোশাক পরে উড়ছে! আর এদের মধ্যেই ময়লা জামা কাপড় পরা, লাল-লাল জট পড়া চুলের কয়েকটা বাচ্চা বেলুন বিক্রি করছে। বিদেশীদের ধাওয়া করে পয়সা চাইছে! স্মাহির মনে হল, এরাই এই শহরের ফুলস্টপ, কমা, সেমিকোলন আর বানান ভুল!

নীলু ফোন করে নিজের গাড়িটা ডেকে পাঠাল। কাছেই কোথাও একটা পার্ক করা ছিল গাড়িটা। ডাকার মিনিট দুয়েকের মধ্যে চলে এল।

লাল রঙের সেডান। দেখেই বোঝা যায় দামি গাড়ি! ড্রাইভারটি বয়স্ক লোক। রিতেশ মানে, নীলুর হাজবেন্ড ডাক্তার। ওই দেশে ভাল প্র্যাকটিস। এখানেও ওদের নার্সিংহোম আছে। নীলু শ্বশুরমশাইও ডাক্তার! ওদের এমন গাড়ি থাকটা তাই আশ্চর্যের নয়!

স্মাহি বলল, 'ঠিক আছে তুই যা তাহলে। আমি আসি?'

'আসবি মানে?' নীলু খপ্ করে ধরল ওর হাত, 'আমি চালিগঞ্জের ওদিকে যাব। ওই উত্তম কুমারের স্ট্যাচুর পাশ দিয়ে হরিদেবপুরের দিকে। তোকে ছেড়ে দেব। তুই লেক গার্ডেন্স স্টেশানের কাছে থাকিস, না?'

স্মাহি সংকুচিত হয়ে গেল সামান্য। ও কোথায় থাকে সেখানে নীলুকে নিয়ে যেতে চায় না। বাড়িটা খুব সাধারণ। একটামাত্র ঘরে ওর যা কিছু বেঁচে থাকা। ইটের দেওয়াল হলেও মাথায় টালি দেওয়া! সেখানে ও কিছুতেই নিয়ে যেতে পারবে না নীলুকে।

ও বলল, 'কী যে বলিস! আমি চলে যাব।'

'মারব ধরে, বস।' নীলু ওকে এক রকম ঠেলেই ঢুকিয়ে দিল গাড়ির পেছনের সিটে। বলল, 'আমি লেক গার্ডেন্স ফ্লাই ওভারে ওঠার মুখে ছেড়ে দেব তোকে! তুই লেভেল ক্রসিং পার করে চলে যাস! আমি বেরিয়ে যাব। কেমন!'

কলকাতার রাস্তার জ্যাম কাটিয়ে এগোতে লাগল গাড়িটা। স্মাহি জানলা দিয়ে বাইরে তাকাল। নীলু হাতের একটা ট্যাব খুলে কীসব করছে! আজকাল এই একটা ব্যাপার হয়েছে। স্মাহি দেখেছে, এক সঙ্গে হয়ত আড্ডা দিতে জড়ো হয়েছে সবাই, কিন্তু সেখানেও যে যার মতো নিজের নিজের মোবাইলে ঢুকে পড়ে আছে! ওর মনে হয় মানুষ চিরকাল 'আন-রিয়াল' বা ভারচুয়ালের দিকে আকৃষ্ট হয়!

গাড়িটা যখন বালিগঞ্জের কাছে পৌঁছল, নীলু ট্যাব থেকে মুখ তুলে বলল, 'সেই ছেলেটার কী খবর রে, যোগাযোগ আছে?'

'কোন ছেলেটা?' স্মাহি তাকাল।

'আরে সেই যে রে, সাংবাদিক। বর্ধমানে পোস্টিং ছিল! তোকে প্রোপোজ করেছিল। বড় বড় চোখ। ভাল দেখতে! কী যেন নাম! আদিত্য না কী!'

'আদিত্য!' কতদিন পরে নামটা বলল স্মাহি। আর ওর মনে হল টুপ করে মনের মধ্যে খশে পড়ে শব্দটা একটা ঢেউ তুলল যেন! কেমন একটা কেঁপে গেল ও। আজকাল মাঝে মাঝেই ওর কথা মনে পড়ে স্মাহির! অদ্ভুত একটা ভাল লাগা আসে! কেমন একটা এলাচ লবঙ্গের গন্ধ পায় ও! কেন মনে আসে আদিত্যর কথা? ও তো নিজেই তাড়িয়ে দিয়েছিল! তাহলে! নিজেকেই যেন মাঝে মাঝে জিগ্যেস করে না স্মাহি!

নীলু বলল, 'ভাল ছিল ছেলেটা। যোগাযোগ করলে তো পারিস। নিজের লাইফ নিজেই কমপ্লিকেটড করে বসে আছিস! একটাই লাইফ রাজকুমারী, এভাবে ছন্নবেশে থেকে সেটি নষ্ট করবেন না!'

নীলু রিজের কাছে ওকে নামিয়ে দিয়ে চলে গেল। স্মাহি ঘড়ি দেখল। সাড়ে চারটে বাজে। বাড়িতে গিয়ে একটু শোবে! ভাল লাগছে না কিছু। কেন নীলু আবার মনে করিয়ে দিল ওর কথা! কেমন একটা অস্থিরতা লাগছে। এলাচ-লবঙ্গের গন্ধটা যেন তীব্র হচ্ছে ক্রমে! শরীরের ভেতরে আচমকা অন্য একটা মানুষ জাগছে!

স্মাহি মাথা ঝাঁকিয়ে নিজেকে ঠিক করার চেষ্টা করল। তারপর পা বাড়াল। আর হঠাৎ চোখ গেল সামান্য দূরে বসে থাকা পাগলটার দিকে। গত মাস কয়েক হল পাগলটাকে এখানে বসে থাকতে দেখছে ও। কোনও দিকে তাকায় না মানুষটা! মাথা নিচু করে কীসব যেন লেখে সারাক্ষণ।

আজ দেখল পাগলটার সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে একটা লোক। লম্বা, ফর্সা টকটকে চেহারা। লোকটা পাগলটাকে কয়েকটা খাতা, পেন আর একটা প্যাকেট দিল! আরে এতো সেই লোকটা। যে ওকে একদিন সিঙারার দোকানে খুচরো দিয়েছিল! লোকটা কী দিচ্ছে পাগলটাকে?

স্মাহির হঠাৎ ইচ্ছে হল লোকটার সঙ্গে কথা বলার। কিন্তু পারল বরং আচমকা এমন একটা জিনিস দেখল যে মনে হল কে যেন আচমকা ওকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিল অতলান্ত কোনও খাদে!

ও দেখল ওর থেকে কিছুটা দূরে একটা অটোর থেকে নামল একটা ছেলে। মকরন্দ! একে তো ও দেখেছিল রিতাদিদের ঘরে। আর তার সঙ্গে নামল দোহারা চেহারার আরেকজন। তার বড় বড় চোখ! প্রজাপতির ডানার মতো পাতলা কান! কপালে একটা তিল!

আর স্মাহি যেন দেখতে পেল বহু বছর পরে আবার অসংখ্য পাখির পালক তুষারের মতো ঝরে পড়ছে আকাশ থেকে! যেন দেখতে পেল একটি ছেলে চলে যাচ্ছে আলোছায়ার গলি পেরিয়ে। চলে যাচ্ছে

মাথা নিচু করে! চলে যাচ্ছে, কিন্তু ফিরে তাকাচ্ছে না একবারও!

### ঈশ্বরের ডাইরি – ২

এবার আমার লাঞ্চ টাইম! ঈশ্বর এখন লাঞ্চ করবে। মানে আমি লাঞ্চ করব। এটা আমার লেখা গল্প। তাই আমি যেখানে চাইব সেখানে লাঞ্চ টাইম হবে। না পোষালে, নিজেরা নিজেদের গল্প লিখে নাও! এখন আমি প্লাস্টিকের প্যাকেটটা খুলে হাইরাইজারের মতো গজা, স্টেডিয়ামের মতো কচুরি, লেকের মতো পাতলা ছোলার ডাল আর ছোট ছোট মানুষের মতো বোঁদে খেয়ে লাঞ্চ করব। ততক্ষণে তোমরাও নিজেদের কাজ, অকাজ, পিং, প্রোফাইল হপিং, লাইক কমেন্ট, ট্যাগ শেয়ার ইত্যাদি সমস্ত পৈশ্লবিক কাজ কম্ম সেরে নাও। ঈশ্বরের খাবার সময়ে তাকে বিরক্ত করতে নেই! আমায় বিরক্ত করতে নেই! আমি খাই, এই শহরকে খাই। এই শহরের কিছু মানুষজনকে বেছে বেছে খাই। আর বাকিদের অবাক হয়ে দেখি! দেখি সবাই এই সময়ে চলে ফিরে বেরালেও আসলে তারা এই সময়ে বেঁচে নেই কেউ। তারা বেঁচে আছে অতীতে। তাদের জীবন নিয়ন্ত্রণ করছে অতীতের কোনও এক ভূত! আমি যেন তাদের সবার গলায় পুরনো বৃদ্ধ নাবিকের মতো মৃত অ্যালবেট্রস পাখিটিকে দেখতে পাই। এই যেমন, আমায় যে লম্বা লোকটা এই মাত্র খাবার দিয়ে গেল, আমি সেই লোকটার গলাতেও অ্যালবেট্রস পাখিটাকে দেখতে পেলাম! ওই দূরে দাঁড়িয়ে যে মেয়েটা অবাক হয়ে একটা অটোর দিকে তাকিয়ে আছে, তার গলাতেও দেখত পেলাম অদৃশ্য অ্যালবেট্রস ঝুলে আছে! কিম্বা ওই যে দোহারা চেহারার ছেলেটা অটোর থেকে নেমে ভাড়া মেটাচ্ছে তারও গলাতেও ঝুলছে ওই অ্যালবেট্রস! সবাই অতীতে আটকে পড়ে আছে! সবাই যেন দিকভ্রান্ত, ক্লান্ত, তৃষ্ণার্ত! জল, চারিদিকে জল তবু তাদের পান করার মতো জল যেন নেই কোথাও! শুধু মানুষের রক্ত আছে! তাদের শিরায় ষ্ট্র ডুবিয়ে টেনে নেওয়ার মতো জন্তু জানোয়ার আছে! ক্ষমতার পায়ে উপুড় হয়ে পড়া হাইড্রেনের পোকা আছে! তবু কেন কে জানে, আমার বিশ্বাস একদিন সেই পাখি আসবে। অন্ধ বোটম দাদুর পতাকা দেখে, আমাদের খুঁজে খুঁজে আসবে ঠিক! আমাদের নিজেদের মধ্যে থেকেই জাগিয়ে তুলবে সমস্ত মৃত অ্যালবেট্রসকে। আর তারপর সে আমাদের পৌঁছে দেবে একটা সকালবেলার দ্বীপে! কিন্তু যতক্ষণ না তা হচ্ছে, ততক্ষণ আমায় খেতে দাও তো বাপু! ফালতু ঝামেলা কোরো না! বেকার ভাট বোকো না! তার চেয়ে নেমে পড়ো গল্পে। এই শহরের আরেক দিকে এই গল্পের আরেকটা সুতোয় কী হচ্ছে সেদিকে চোখ দাও! দেখা যাক তার গলাতে ঝুলে থাকা মৃত পাখিটা প্রাণ পেয়ে তাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে আসে কীনা ডাঙার কাছে!

॥ ১১ ॥

### নিরমুক্তা

সিগনালে দাঁড়িয়ে রয়েছে গাড়িটা। সামনে কাউন্টার চলছে। একশো পঞ্চাশ সেকেন্ড! বাপ রে! এতক্ষণ! ছোটবেলা থেকেই সিগনালে, স্টেশানে, লাইনে অপেক্ষা করতে গেলেই বিরক্তি লাগে মুকুর। অন্য সময়ে কোনও অসুবিধে নেই, কিন্তু এইসব জায়গায় অপেক্ষা করতে হলেই কেমন যেন ধৈর্যচ্যুতি ঘটে ওঠে মনের ভেতর ঘুমিয়ে থাকা সমস্ত চঞ্চল হরিণ জেগে ওঠে এক সঙ্গে! মনে হয় কত কাজ আটকে আছে। কত কাজ এখনও বাকি! কতজন অপেক্ষা করে আছে! মনে হয়, কত কত সময় নষ্ট হয়ে গেল জীবনের থেকে! ওর এমন বিরক্তি দেখে তিজু ওকে গাগাত খুব।

বলত, 'তোর এই স্বভাবটা আর গেল না! এদিকে বিছানা থেকে উঠবি সকাল এগারোটায়! আর রাস্তায় বেরিয়ে সব কাজ এক্ষুনি করে ফেলতে হবে! পাগলী তুই!'

'পাগলীই তো! বেশ করব পাগলী হব!' রাগ করত মুকু। এই একজনের ওপরই কারণ ছাড়া, মাত্রা-ছাড়া রাগ করত ও! বলত, 'পাগলী যখন, তখন কেন আমায় বিয়ে করতে চাস? করতে হবে না বিয়ে!'

তিজু হাসত। সামান্য লম্বা কোঁকড়া চুলগুলোয় আঙুল চালিয়ে বলত, 'সমাজসেবা করছি! পাগলী অন্য কারও কাছে গেলে কী না কী ক্ষতি করে দেবে কে জানে!'

'অত সমাজসেবা করতে হবে না তোকে!' আবার রাগ করত মুকু। মুখ ঘুরিয়ে অন্যদিকে তাকিয়ে বলত, 'তোরা দিল্লীর লোকজন এমনই হোস। ওভার গ্রোন ভিলেজ এই দিল্লী! তেমনই ফিউডাল মেন্টালিটি! ধর দেঙ্গে! কান কে নীচে বাজায়েঙ্গে! জানতা হ্যায় মেরা বাপ কৌন হ্যায়? একটা শহর উইথ মোর সারপঞ্চ দ্যান ভিলেজার্স! ইউ পিপল ইকুয়েট ষ্ট্রিট স্মার্টনেস উইথ ইন্টালিজেন্স! মানি উইথ সফিস্টিকেশান! গ্র্যামার উইথ গ্রেস! রিচেস উইথ রিচনেস! তোরা সবাই হিরো! আই অ্যাম ইওর সেভিয়ার টাইপ! সব ফুটো কাপ্তান! করতে হবে না বিয়ে!'

হা হা করে হাসত তিজু! বলত, 'দিল্লী ওভার গ্রোন ভিলেজ! কীসব বলছিস! এখানের বেস্ট ইউনিভার্সিটিতে পড়ছিস! তাও এসব বলছিস! নমক-হারাম! জানতে পারলে না তোকে পেটাবে সবাই!'

'তবে তো তুই বেঁচেই গেলি! আমায় পেটাবে আর তুই হাসছিস! মা ঠিক বলে, ছেলেটা জাস্ট টাইম পাস করছে!' সামান্য কথার থেকে ইচ্ছে করেই অন্য দিকে, অন্য কথায় চলে যেত মুকু। ইচ্ছে করে তিজুকে

কোণায় ঠেলে দেবার চেষ্টা করত! ও জানত সব রকম ইয়ার্কি মেনে নিতে পারত তিজু, কিন্তু ওকে ছেড়ে দেবার কথা বললে সেটা একদম নিতে পারত না ও!

'তোর মা অমন বলেছে?' তিজু জিজ্ঞেস করত।

'হ্যাঁ তো! কত ভাল ভাল সম্বন্ধ আসছে জানিস তো লক্ষ্মৌয় আমার জন্য? প্রোফেসর, এঞ্জিনিয়ার! ডাক্তার! মায়ের ডাক্তার পছন্দ! আমার না! কোথায় কখন ছুরি কাঁচি চালিয়ে দেবে কে জানে বাবা!'

তিজু কিছু না বলে মাথা নামিয়ে নিত। মুকু তাকিয়ে থাকত তিজুর দিকে। আবছা রোদে লাল হয়ে যাওয়া তিজুর মুখ দেখে কেমন একটা ভাললাগা আসত। মনে হত জড়িয়ে ধরে ওইখানেই। হাওয়ায় ওর গায়ের থেকে ভেসে আসা হাল্কা পারফিউমের গন্ধ কেমন যেন ধীরে ধীরে অবশ করে দিত ওকে। মনে মনে তিজুর কপালের তিলে আঙুল ছোঁয়াত ও।

কিন্তু সামনে সেটা দেখাত না। বরং বলত, 'মা তো বলে, তুই যেন আমার পেছনে না পড়িস। যেন আমায় একা ছেড়ে দিস! মা বলে, মামা বলে, মামাতো বোন বলে। সবাই বলে! সব্বাই চায় তুই আমার থেকে দূরে চলে যাস!'

তিজু মাথা তুলে তাকাত ওর দিকে। তারপর আলতো গলায় বলত, 'বলুক। সবাই বলুক। কিন্তু আমি কারও কথা শুনব না। কিছুতেই যাব না তোকে ছেড়ে! শুধু, তুই যদি কখনও চলে যেতে বলিস তবে, আই প্রমিস, আর খুঁজে পাবি না আমায়!'

এভাবে যে কথা রাখবে তিজু সেটা বুঝতে পারেনি মুকু! জানলা দিয়ে চারিপাশে ছড়িয়ে থাকা অনন্ত গাড়ির মিছিল আর মাথার ওপর টাঙানো ধূসর-নীলচে রঙের আকাশের দিকে তাকিয়ে মুকুর মনে হল এই বিশাল জট পাকানো শহরে কোথায় যে হারিয়ে গেল মানুষটা! এভাবে কথা রাখতে কে বলেছিল ওকে!

চিরকাল তিজু এমন। কী ভয়ঙ্কর জেদ! কী স্বার্থপর! নিজের কথা ছাড়া আর কারও কথা মনেই রাখে না। বোঝার চেষ্টাও করে না। নাহলে অমন ভাবে রাজি হয়ে যায় ডিভোর্সের জন্য! অমন একটা ঘটনার পড়ে যখন মুকুর পাশে দাঁড়াবার কথা ছিল ওর, তখন কীনা নিজের মধ্যে গুটিয়ে গেল! 'লস'-টা কি একার ওর ছিল? মুকুর সারা জীবনটা যে টলে গেল সেটা দেখল না! সেই দিক থেকে মুকু তো ঠিকই করেছিল ডিভোর্স চেয়ে! আর সেটা কি না ও মেনে নিল! মুকু চলে যেতে বলেছিল বলেই চলে গেল একবারে! আর পেছনে ফিরে তাকাল না!

ঘড়িটা দেখল মুকু। সোয়া চারটে বাজে। কথা বলে সাড়ে পাঁচটার মধ্যে হোটেলে ফিরতে হবে ওকে। মাকে একজন ডাক্তার দেখতে

আসবে। কী যে বিপদে পড়েছে ও! দীপনের কথাটা মানাই ঠিক হয়নি ওর!

আচ্ছা কেন আজও তিজুকে মন থেকে একদম বেঢ়ে ফেলতে পারে না ও! কেন এখনও মনের মধ্যে সেই আবছা রোদে কুতুব মিনারের সামনের ফাঁকা জায়গায় আজও মাথা নিচু করে বসে রয়েছে একটা ছেলে!

মাতো এটাই নিয়েই বলছিল সেদিন!

মা যে এমন করে লক্ষ্যে থেকে একদম কলকাতায় চলে আসবে ভাবতে পারেনি মুকু। ওকে যখন হোটেলের রিসেপশন থেকে ফোন করে মায়ের কথা বলা হয়েছিল, মুকু তো আকাশ থেকে পড়েছিল! মা এখানে কী করছে? ওকে তো জানায়নি! কিন্তু কিছু বলেনি ও। মাকে এই বয়সেও সময়ে চলে মুকু। মা এখনও কী যে রাগী!

মা এসেছিল ওর কাছে। হোটেলের বয়টি মায়ের ব্যাগ রেখে ঘর থেকে বেরনোমাত্র মা ঝাঁপিয়ে পড়েছিল ওর ওপর!

মা বলেছিল, 'কী শুরু করেছিস তুই? আবার এইসবে জড়িয়েছিস নিজেকে! আমি তো দীপনকে ফোন করব এবার। ওই জানোয়ারটার জন্য তোকে কেন ফোন করেছে ও! প্রিতম ইজ আপসেট! আমাকে ফোন করে প্রিতম বলেছে যে মুকু কীসব শুরু করেছে! সত্যি, তুই কী শুরু করেছিস? লস্ট অ্যান্ড ফাউন্ড বিভাগে আছিস তুই! নাকি ডিটেক্টিভ ডিপার্টমেন্টে! তোর না ছুটিতে প্রিতমের কাছে যাওয়ার কথা ছিল! ওর বাবা মাও যেত। ওরা সামনের মাঘে বিয়ে দিয়ে দিতে চাইছে। থার্ড ফেব্রুয়ারি খুব ভাল একটা বিয়ের দিন আছে! ওরা দেখেওছে। এতসব প্ল্যান করা হয়ে গেছে! আর সেখানে তুই কলকাতায় এসে একটা বাউন্ডুলেকে খুঁজছিস!

মুকু অবাক হয়ে গিয়েছিল! বিয়ে! সামনের মাঘে! ফেব্রুয়ারির তিন তারিখ! ও প্রিতমের কাছে গেলে সেখানে প্রিতমের বাবা মা আসত! এসব তো জানে না ও! ওকে না জানিয়ে কী করে সব ঠিক করে নিল! সেদিন যখন রাস্তায় ফোন করেছিল প্রিতম, ও তো সবটাই বলে দিয়েছিল প্রিতমকে। তখন তো প্রিতম কিছু বলেনি! আর এখন দেখছে পুরো উলটো ছবি! প্রিতম যে বলে, মুকু নিজের ইচ্ছে মতো থাকতে পারবে! নিজের ডিসেশান নিজে নিতে পারবে সেটা তাহলে শুধুমাত্র একটা ভান! আসলে ও অন্য পুরুষদের মতো সেই নিয়ন্ত্রণই করতে চায়!

ও মাকে বলেছিল, 'তোমায় প্রিতম আসতে বলেছে এখানে? আমার ওপর নজরদারি করতে ও পাঠিয়েছে?'

'বেশ করেছে!' মা ভুলে গিয়েছিল এটা একটা হোটেল। আরও জোরে চেঁচিয়ে বলেছিল, 'কেন বলবে না! নিজের দিকে তাকিয়েছিস? জীবনটা তো ওই জানোয়ারটাকে বিয়ে করে নষ্ট করতে বসেছিলি! নেহাত প্রিতম এসে পড়েছে! সারা জীবন কী ভেবেছিস এভাবেই কাটবে? বয়স হবে না তোর! শরীরের এমন জোরই থাকবে? প্রিতম খুব ভাল ছেলে! ওর সঙ্গে আবার শুরু করার একটা চান্স পেয়েছিস জীবন। আর সেটাকেও এভাবে নষ্ট করছিস! তোর বাবা কতদিন আগে মারা গিয়েছে। আমায় কিন্তু কেউ সেকেন্ড চান্স দেয়নি! আমি জীবন দেখেছি, তাই বলছি! এসব ভুলভাল কাজ বন্ধ কর। ব্যাগ গুছিয়ে কালকেই চলে যাব আমরা। তোর এইসব কান্ডকারখানা দেখে প্রিতম যদি চলে যায়, জানবি তোর জীবন শেষ!'

মুকু কিছু বলতে পারছিল না। মাথা নিচু করে বসেছিল বিছানায়! একটা লোক চলে গেলে ওর জীবন শেষ হয়ে যাবে? কেন? এখনও কেন এমন ভাবে মানুষজন! মা, নিজে একজন মেয়ে হয়ে এভাবে কী করে ভাবতে পারে! প্রিতম আসার আগে কি ও বেঁচে ছিল না! একটা জিনিস মুকু বুঝে গিয়েছে, আমরাই অন্যদের নিজেদের জীবনে অপরিহার্য করে তুলি! আমরাই তাদের গুরুত্ব বাড়াই! মনের মধ্যে তাদের ঘিরে একটা কল্পনার পৃথিবী বানাই। আসলে সেসব কিছু খাকে না! শেষ পর্যন্ত কেউ থাকে না! সত্যি বলতে কী, প্রিতম খুব ভাল মানুষ। ডিসেন্ট! কিন্তু মুকু কোনওদিন প্রিতমের প্রেমে পড়েনি! ওকে ভাল লেগেছে! এইটুকুই। ও শুধু ভেবেছিল একটা সময় পরে জীবনের সঙ্গে মানিয়ে নিতে হয়। মানুষকে বুঝে নিতে হয় যে জীবনে সব কিছু পাওয়া যায় না! তাই সাম্ভাব্যটুকু দিয়েই নিজের জীবন সাজিয়ে তুলতে হয়। মনকে মানিয়ে নিতে হয়। প্রিতম হল ওর জীবনে সেই মানিয়ে নেওয়া।

তবে বুকের গভীরে তো জানে আসলে কী চায় ও! প্রিতম যখন ওকে আদর করে। ওর মধ্যে নিজেকে প্রবেশ করিয়ে প্রবল ওঠাপড়ার মাঝে ওর বুকটা কামড়ে ধরে, কাঁধে, গলায় অদৃশ্য কিছু খোঁজে, তখন কিন্তু খুব লঘু স্বরে, শ্বাসের সঙ্গে মিশে আচমকা তিজুর নামটাই বেরিয়ে আসে মুকুর! চোখেও জল চলে আসে মাঝে মাঝে! মনে হয় কোথায় যেন তিজুর বিশ্বাস ভাঙছে ও! কোথায় যেন তিজুর পিঠে ছুরি মারছে!

আর সেদিন মায়ের কথা শোনার পড়ে প্রিতমের ওপর কেমন যেন একটা বিতৃষ্ণা আসতে শুরু করেছে মুকুর! মাকে পাঠিয়েছে ওর পেছনে গোয়েন্দাগিরি করার জন্য! কিন্তু নিজের সেটা বলার সাহস ছিল না! প্রিতম তো ওই রাজু নামে একজনের ঠিকানা আর ফোন নাম্বার দিয়েছিল তিজুকে খুঁজে বের করার জন্য। তখনও তো একবারও বলেনি যে এমন করে মাকে ও বলেছে, বা মা আসছে!

মা চিৎকার চেঁচামেচি করে নিজেই সব্বাই সেরে পড়েছিল! মায়ের চিরকাল হাই প্রেশার। রোজ ওষুধ খেতে হয়। তাই মুকু যত দূর পারে মাকে রাগায় না। কিন্তু মা নিজেই যদি কথায় কথায় এমন করে তাহলে আর কে কী করতে পারে!

মুকু নিজে একটা সিঙ্গল রুম নিয়ে ছিল। মা আসায় ডাবল রুম করে নিয়েছিল হোটেলে বলে। ডাক্তারও মাকে বলেছিলেন, মা যেন আর উত্তেজিত না হয়।

সেদিন রাতে প্রিতম ফোন করেছিল। মুকু কিন্তু একবারও এসব নিয়ে কিছু বলেনি। খামোখা আর অশান্তি ভাল লাগছিল না। শুধু বলেছিল, রাজুর সঙ্গে দেখা করতে যাবে বলে কথা দিয়েও যেতে পারেনি মা এসে যাওয়ায়! রাজু দুদিন পরে সময় দিয়েছে! প্রিতম নিজেও আর ঘটিয়ানি করেনি। মুকু যতই লুকোতে চাক, তাও কিছু একটা তো আন্দাজ করেইছিল নিশ্চিত! প্রিতম তো আর বোকা নয়! তাই খুব পাতলা কাচের আতর-শিশি ধরার মতো গলায় কথা বলেছিল।

সেদিন রাতে ঘুমোনোর আগে মা ক্লান্ত গলায় জিজ্ঞেস করেছিল, 'তোকে এত বললাম তাও তুই ওকে খোঁজা বাদ দিবি না, না?'

মুকু ছোট করে বলেছিল, 'আরেকটু চেষ্টা করে নিই! দীপনের শরীর খারাপ। হুইল চেয়ারে করে ঘোরে। ওর উপায় থাকলে আমায় বলত না!'

মা তাকিয়েছিল মুকুর দিকে। তারপর কেমন যেন আবছা গলায় বলেছিল, 'ও আজও তোর মন থেকে সরেনি, নারে? তাহলে কেন ডিভোর্স নিলি? তোদের যা হয়, সেকি আর কারও হয়নি! যাকে মনে রাখলি এভাবে তার থেকে সরে এলি কেন মুকু?'

সব প্রশ্নের উত্তর মানুষ যদি নিজে জেনে যেত তাহলে জীবনে এমন বিপত্তি হত না! সে যে কেন প্রিয় মানুষের থেকে স্বেচ্ছায় দূরে থাকে সেটা সে নিজেও বোঝে না! নাকি বোঝে! তাহলে অভিমান, অহং পাড় করতে পারে না বলেই কি এভাবে মানুষ বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকে প্রিয় মানুষের থেকে!

'ম্যাডাম, উই হ্যাভ রিচড!' ড্রাইভার ছেলেটির কথায় সম্বিত ফিরল মুকুর। ও সামনে তাকাল। আজ হোটেল থেকে গাড়ি নিয়েছে ও। ড্রাইভার ছেলেটার বয়স অল্প। কথা শুনে মনে হচ্ছে পড়াশুনোয় জানে।

মুকু দেখল চারিদিক। কেল গার্ডেন্সে আগে আসেনি ও। উচ্চ মধ্যবিত্ত পাড়া এটা। কিন্তু চারিদিকে সাপের মতো আঁকা বাঁকা গলি! সামনের গলিতে একটা বড় ক্রেন দাঁড়িয়ে। তাতে উঠে একজন লোক গাছের ডাল কাটছে! পাশে একটা হলুদ রঙের লরিতে সেই কাটা ডালপালা বোঝাই করা হচ্ছে!

এই গলিতে গাড়ি ঢুকবে না। তাই ড্রাইভার ছেলেটা গাড়িটা এখানেই পথের এক পাশে পার্ক করে রেখেছে!

মুকু গাড়ি থেকে নেমে সামনে এগোল। পাশেই একটা দোকান। তার সাইবোর্ডে বাড়ির নাম্বার আর রাস্তার নাম দেখে বোঝা যাচ্ছে প্রায় এসেই গিয়েছে রাজু বলে সেই নেতাটির বাড়ি। কিন্তু লোকেশানটা ঠিক কোথায় হবে সেটা বুঝতে পারছে না।

মুকু গলির মধ্যে ঢুকল। হলুদ দরিটার পাশ কাটিয়ে এগিয়ে গেল সামনে। দেখল, উলটো দিক দিয়ে একটা ছেলে আসছে।

মুকু ডাকল, 'ভাই শুনছেন, রাজদীপ দেবের বাড়িটা কোথায়! মানে এম.এল.এ. যিনি!

ছেলেটা বলল, 'আরে রাজুদা?'

মুকু দেখল ছেলেটার চুল পাট করে আঁচড়ানো! পান খেয়ে দাঁতের বারোটা বাজিয়ে ফেলছে! লাল দাঁত বের করে ছেলেটা হাসছে ওর দিকে তাকিয়ে।

মুকু মাথা নাড়ল।

ছেলেটা বলল, 'ওই সামনের নীল বাড়িটা দিদি!'

মুকু ওদের কাটিয়ে এগিয়ে গেল সামনে। আকাশি নীল রঙে একটা বাড়ি। সামনে টিনের গেট। লোক জড়ো হয়ে আছে। মুকু কাছে যেতেই একটা টাক মাথা লোক এগিয়ে এল ওর দিকে, 'কাকে চাইছেন ম্যাডাম?'

মুকু দেখল লোকটাকে। মুখে কেমন একটা গ্যালগ্যালে ভাব। ওকে চোখ দিয়ে গিলছে। ও বলল, 'রাজদীপ দেব। আসতে বলেছেন আমায়। আমি নিরমুক্তা!'

'ও!' লোকটা সামলাল নিজেকে। মুকু বুঝল ও যে আসবে লোকটা জানে। লোকটা বলল, 'আপনি ভেতরে যান। একটু ওয়েট করতে হবে। আসলে দাদা একটু মানে... ব্যস্ত। আপনি যান!'

মুকু ওদের পাশ কাটিয়ে বাড়ির দিকে এগোল। রাজুর কি মেজাজ খারাপ! তবে কি ওর কাজে সাহায্য করতে পারবে না! কী করবে ও! কোথায় গেল তিজু! এভাবে লুকিয়ে আছে কেন! ওর জন্য কোথায় কোথায় আসতে হচ্ছে ওকে! কাদের সঙ্গে দেখা করতে হচ্ছে! যদি একবার দেখা হয় তিজুর সঙ্গে তবে যা শাস্তি দেবে না!

বাড়ির ভেতর পা দিল বিরক্ত মুকু। আর ঠিক তখনই আবছা ভাবে শুনল, কাছেই কোথাও যেন পাড়া কাঁপিয়ে গর্জন করে একটা মোটর বাইক চলে গেল! বিরক্তিটা আরও বাড়ল মুকুর! কারা এমন সব বিকট আওয়াজের মোটর বাইক চালায়! তাদের মাথা খারাপ নাকি?

## ॥ ১২ ॥

### ঋত্বিজ

'তোর মাথা কি খারাপ? এভাবে তুই সাড়ে চার ঘন্টা দাঁড়িয়ে আছিস এখানে? পাগল? বলেছি না এভাবে রাস্তায় দাঁড়াবি না! আমার কষ্ট হয়!' মুকু তাকাল ওর দিকে। মুকুর চোখ দুটো বাবুই পাখির মতো তিরতির করে কাঁপছে। ও বলতে গেল কিছু, কিন্তু মুকু ওকে কথা বলতে না দিয়ে হাত বাড়িয়ে ওর কপালের পড়ে থাকা চুলটা সরিয়ে দিল আলতো করে! আর চমকে ঘুম ভেঙে সোজা হয়ে বসল তিজু! জানলা দিয়ে নরম আলো এসে পড়েছে ঘরে। রাস্তার অস্পষ্ট আওয়াজ পাক খাচ্ছে হাওয়ায়! পাশের একটা গাছে বসে একটা টানা কী অদ্ভুত ভাবে ডেকে যাচ্ছে একটা পাখি! এই সবের মধ্যে মুকু এসেছিল! কোথায় এসেছিল! এখানে! হাঁ এখানেই তো! এই তো দাঁড়িয়েছিল পাশে। কপালে এখনও ওর স্পর্শ টের পাচ্ছে তিজু। ওর অদ্ভুত সুন্দর আঙুলগুলো তো দেখতে পাচ্ছিল এই মাত্র! তাহলে কোথায় গেল! এখন, হাওয়া, শূন্য দুপুর আর নির্জন একটা শীতকাল পড়ে আছে সামনে! কত দিন ধরে আছে এমন! কেন এখনও কলেজের সময়কার ওর অপেক্ষা করার দৃশ্য এভাবে ফিরে আসে স্বপ্নে! স্বপ্ন! যার কোনও স্পর্শ নেই! আশা নেই! হলুদ ডালের মতো উপছে পড়া রোদের মধ্যে নিজেকে আজ বড্ড একা আর অসহায় লাগছে! বুঝতে পারছে, সারা জীবন এইসব হারিয়ে যাওয়া, মিলিয়ে যাওয়া দৃশ্য নিয়েই বাঁচতে হবে ওকে! কোথায় যেন পড়েছিল, "The strongest men are the most alone." কিন্তু উল্টোটাও কি সত্যি হয়!

সোজা হয়ে বসে ঘড়ি দেখল তিজু। আড়াইটে বাজে। এখনও পুজো সারেননি অভিনব! এক ঘন্টা তো হল। বসে থাকতে থাকতে ঘুমিয়ে পড়েছিল! আসলে আজ বেশ ক্লান্ত আছে তিজু! কাল রাতে ঘুমোয়নি। একটা বাজে ঘটনা ঘটেছে! কাল রাতে নীপা সুইসাইড করতে গিয়েছিল। সেই কারণে ওকে নিয়ে হাসপাতালে যেতে হয়েছিল তিজুকে।

আগে হলে তিজু এসব করত না! পৃথিবীর সবার থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখত ও। কিছুতেই নিজের বৃত্তের বাইরে গিয়ে কিছু করত না! কিন্তু মুকুর চলে যাওয়া ওকে পালটে দিয়েছে! এখনও মুকুর সেই চোখ দুটো মনে পড়ে ওর! 'এতটা স্বার্থপর? এতটা সেলফ অ্যাবসর্বড! কথা গুলো বুকের মধ্যের ফাঁকা পরিত্যক্ত হলঘরে ভাসে! দেওয়ালে লেগে ঘুরে যায় অন্য দেওয়ালের দিকে! খালি মনে হয়, ও যদি এমনটা না হত তাহলে কি মুকু থেকে যেত ওর কাছে!

দীপন একবার জিজ্ঞেস করেছিল, 'বৌদি বলল আর তুই রাজি হয়ে গেলি? তুই তো ডিভোর্স নাও দিতে পারতিস!'

তিজু উত্তর দেয়নি কোনও। মুকু ওর কাছে কিছু চাইলে ও না করেনি কোনওদিন! কিন্তু এবার 'না' করেছিল। অনেকবার 'না' বলেছিল। তাতে মুকু বলেছিল, 'আমার মন সে গিয়েছে তোর থেকে। তুই এমন আমি জানতাম না! এতটা স্বার্থপর? এতটা সেলফ অ্যাবসর্বড! আমি থাকতে চাই না!'

মন সরে গিয়েছে! তাহলে আর লাভ কী! ওই একটা কথাই কেমন যেন অসাড় করে দিয়েছিল ওকে। ওদের যা ক্ষতি হয়েছে সেটা তো এক সঙ্গেই হয়েছে! তাহলে এমন কী করল ও! কিন্তু তারপরেই মনে হয়েছিল, বৃথা এই জিজ্ঞাসা! মনটাই তো আসল। সেটা সরে গেলে আর কিছু থাকে না! তাছাড়া সেই কলেজবেলার কথাও মনে পড়ে গিয়েছিল ওর! সেই যে কথা দিয়েছিল, কেউ বললে ও সরবে না! কিন্তু যদি মুকু ওকে চলে যেতে বলে তাহলে আর থাকবে না ও!

তিজু সরে এসেছে! কিন্তু সত্যি কি সরে এসেছে! তাহলে কেন আজও এমন আবছা ঘুমের মধ্যে এসে ওর কপালে পড়ে থাকা চুলের গোছা সরিয়ে দেয় মুকু! অমন তিরতির করে কাঁপতে থাকা বাবুই পাখির মতো তাকায়! কীসের অদৃশ্য এই বন্ধন যে সেটা কেটে আজও বেরতে পারল না ও!

জগন! জগনটাই দায়ী! কেন ও মুকুকে ফলো করছে! বারবার বারণ করেছে তিজু! কিন্তু ছেলেটা কথা শোনে না! বললেই, বলে, 'কী করব দাদা! রিটায়ার্ড মানুষ! কাজকম্ম নেই! তাই... প্লাস বৌদি বলে কথা। একা শহরে আছেন। সেফটি বলেও তো একটা ব্যাপার আছে!'

জগন বারবার ওর কথা বলে বলেই কি আজকাল এমন মনঘন মুকুর কথা মনে পড়ছে ওর! এই চুয়াল্লিশে কি আর অমন সতেরো আঠারোর মতো অস্থির হলে হয়! হয় না, জানে তিজু! কিন্তু কিছুতেই মানাতে পারছে না নিজেকে। আসলে কেউ কেউ প্রেমে পড়ে কিন্তু সেখানেই ব্যাপারটা শেষ হয়ে যায় তাদের। কিন্তু তিজুর মতো মানুষরা প্রেমে শুধু পড়েই না সেটা নিজের মধ্যে বয়ে নিয়ে বেড়ায়ও! আর সেটাই জগনের জন্য যেন আরও জেগে উঠছে!

এই যে জগন খবর দিল সেদিন যে মুকুর মা এসেছেন! সেটা নিয়েও কেমন একটা তেতো ভাব হয়ে আছে মনে।

কেন এসেছেন ভদ্রমহিলা সেটা জানে তিজু! এই যে মুকু ওকে খুঁজছে, সেটার জন্য এসেছেন! মুকুকে নিয়ে যেতেই এসেছেন নিশ্চয়! জীবনে কিছু জিনিস আছে যা কোনওদিন পালটায় না! এটাও তেমনই একটা ব্যাপার! সেটা জানার পর থেকে কেমন একটা কষ্ট হচ্ছে ওর। মুকু যে এই শহরে, এক শহরে আছে, সেটাই যেন ওর আনন্দ! কোনও লজিক নেই, তাও নিরাকার এক আনন্দ! আর সেই আনন্দটা চলে যাবে! একবার তো মনে হয়েছিল মুকুর সঙ্গে গিয়ে দেখা করে নেয়! কিন্তু তারপরেই নিজেকে চড় মেরেছে মনে মনে! সব তো শেষ! মনটাই তো সরে গিয়েছে! সেখানে এসব কেন ভাবছে ও! আর কলকাতায়

এসেছে কেন মনে নেই! সেটা থেকে সরে গেলে হবে? মা যা বলে গিয়েছে সেটার শেষটা জানতে হবে না!

পাশের জানলা দিয়ে আসা রোদের দিকে তাকাল তিজু। পাখিটা ডেকেই চলেছে! ওর আবার মনে পড়ল নীপার কথা! কেমন আছে মেয়েটা!

কাল রাতে আচমকা চিৎকার চেঁচামেচিতে ঘুম ভেঙে গিয়েছিল তিজুর! ঘর অন্ধকার ছিল। গায়ে লেপ দেওয়া ছিল। তাই প্রথমটা বুঝতে পারেনি কী হচ্ছে! তারপর সম্পূর্ণ সজাগ হয়ে তাকিয়েছিল বাইরের দিকে। কাচের জানলার ওপর মোটা পর্দা ঢাকা। তাও ফাঁক দিয়ে আসা রাস্তার আলোর আভা দেখে বুঝেছিল, এখনও রাত!

চিৎকারটা আসছিল নীচের থেকে। তিজু বিছানা থেকে নেমে পায়ে চটি গলিয়ে দরজা খুলে বেরিয়েছিল বাইরে। দেখেছিল আশেপাশের ফ্ল্যাটের থেকে লোকজন বেরিয়ে সিঁড়ির কাছে জটলা করছে। কিন্তু কেউ কিছু বলছে না! বা এগোচ্ছে না! আর নীচের থেকে একজন মধ্য বয়স্ক মহিলা চিৎকার করে যাচ্ছে! তিজু আর অপেক্ষা না করে নেমে গিয়েছিল সিঁড়ি দিয়ে!

ওই ফ্ল্যাটটা ছোট। খুব আগোছালো! ঘরে ঢুকেই কেমন একটা গন্ধ পেয়েছিল তিজু! অ্যালকোহল। ভদ্রমহিলা কাঁদছিলেন! তিজু ওর পেছন পেছন এগিয়ে গিয়েছিল বাথরুমের দিকে।

বাথরুমের দরজাটা অর্ধেক খোলা ছিল। সেখানে গিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছিল তিজু। নীপা পড়েছিল বাথরুমের মেঝেতে! চারিদিকে চাপ চাপ রক্ত! বাঁ হাতের কবজির কাছটা কাটা! তিজু থমকে গিয়েছিল! এটা কী দেখছে ও! এটা কেন হল! ভদ্রমহিলা যে নীপার মা সেটা বুঝতে অসুবিধে হচ্ছিল না ওর! কিন্তু এখন কী করবে ও! কার সঙ্গে কথা বলবে!

তিজু দ্রুত তাকিয়েছিল ভদ্রমহিলার দিকে। বলেছিল, 'আপনার মোবাইল আছে? আমায় এক্ষুণি দিন। আমার মোবাইল নেই!'

ভদ্রমহিলা হাউস কোটের পকেট থেকে ফোন বের করে দিয়েছিল মোবাইলটা। মনে মনে নাম্বারটা আউড়ে নিয়ে তিজু ফোন করেছিল একটা!

দুটো রিং হতেই কলটা রিসিভ করেছিল জগন! এই রাত দুটোতেও জগন জেগে! যতটা সম্ভব ছোট করে ঘটনাটা বলেছিল ওকে।

জগন সব শুনে বলেছিল, 'দাদা পাঁচ মিনিটের মধ্যে অ্যাম্বুলেন্স যাচ্ছে। তাতে করে নিয়ে আসুন নার্সিং হোমে! আমি আসছি ওখানেই। ডোন্ট ওরি দাদা! সব ম্যানেজ হয়ে যাবে।'

কুড়ি মিনিটের মধ্যে নীপাকে নিয়ে নার্সিংহোমে পৌঁছে গিয়েছিল তিজু আর ভদ্রমহিলা। দেখেছিল জগন দাঁড়িয়েই আছে!

পরের আধ ঘন্টার মধ্যে ডাক্তার, পুলিশ সব চলে এসেছিল। কিন্তু তিজু অবাক হয়ে দেখেছিল জগন সামলে নিয়েছে সব! এমন কী পুলিশে কেস পর্যন্ত হতে দেয়নি!

তিজু আর জগন বসেছিল ওয়েটিং লাউঞ্জে। ভদ্রমহিলার থেকে জেনেছিল পুরো ব্যাপারটা। নীপার বাবা একজন মদ্যপ মানুষ। প্রায়ই নীপাকে মারত। গালাগালি করত। আর এদিন সেটার মাত্রা বেড়ে গিয়েছিল খুব। ভদ্রমহিলাকে রাতে ব্যাডমিন্টনের র‍্যাকেট দিয়ে মেরেছিল লোকটা। নীপা আটকাতে গেলে ওকে মেরে মাটিতে ফেলে দিয়ে গায়ে মদ ঢেলে দিয়েছিল। এটা আর নিতে পারেনি মেয়েটা!

'এটা বাবা, না জানোয়ার!' জগন তাকিয়েছিল তিজুর দিকে, 'বাবা এমন হয়!'

বাবা! বাবা কেমন হয়! ওর ছোটবেলায় বাবাকে বেশি পায়নি। ব্যবসায় ব্যস্ত থাকত বাবা। কিন্তু তার মধ্যেই যেটুকু পেত, তাতেই কী যে ভাল লাগত তিজুর! বাবাও খুব ভালবাসত ওকে! তাই তো বাবা যখন মারা গিয়েছিল সবচেয়ে ভেঙে পড়েছিল তিজু! কাজকম্ম বন্ধ করে মাস দুয়েক একদম নিজেকে বন্ধ করে নিয়েছিল ঘরের মধ্যে! স্বাভাবিক জীবনে ফিরতে কষ্ট হয়েছিল খুব! বাবা বলতেই তাই ছোটখাটো শান্ত মানুষটার মুখটাই এতদিন মনে পড়ত তিজুর! কিন্তু তারপর যে কী হল! এখন সব কেমন যেন ঘেঁটে গেছে ওর!

জগনের দিকে ফাঁকা দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়েছিল তিজু। জগন আরও কত কিছু বলছিল, কিন্তু মাথায় ঢুকছিল না একটুও! সকাল সাড়ে ছটার দিকে ডাক্তার এসে বলেছিলেন, আর ভয় নেই। বিপদ কেটে গিয়েছে।

নীপার মা জগন আর তিজুকে হাত জোড় করে অনেক ধন্যবাদ দিয়ে মেয়ের কাছে চলে গিয়েছিল।

তিজু জগনের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করেছিল, 'তুই করলি কী করে এত কিছু! তুই আসলে কে বলত!'

জগন শুধু হেসে বলেছিল, 'আমি দাদা কেউ নই। সামান্য রিটায়ার্ড একজন মানুষ!'

'ফির সে তু ইয়ে সব তসবিরেঁ নিকলকে রক্ষি হ্যায়? ঢাকা এখনই। ঢুকিয়ে রাখ!' গম্ভীর গলাটা শুনে সোজা হয়ে বসল তিজু। এই তো অভিনব রাওয়াতের গলা! এতক্ষণ ধরে কী পূজা করছিলেন! এমন অসুস্থ মানুষ, তাও এভাবে এখনও পুজো আচ্চা করেন!

সামান্য সময় পড়ে কাজের ছেলেটি এসে দাঁড়াল ঘরের মধ্যে। বলল, 'স্যার আসুন। সাহেব রেডি।'

তিজু উঠে দাঁড়িয়ে ছেলেটির পেছন পেছন গেল ভেতরের ঘরে। দেখল অভিনব বসে আছেন তার কাঠের বড় চেয়ারটায়। মাথায় একটা উলের টুপি। গায়ে সোয়েটার। হাঁটুর থেকে নীচটা চাদর দিয়ে ঢাকা!

'তুমি বসে আছো এখনও?' অভিনব সামান্য বিরক্ত গলায় বললেন!

'হ্যাঁ স্যার। আমি তো বলেছি, কেন এসেছি আপনার কাছে! সব ছেড়ে এসেছি স্যার! আপনাকে বললেই হবে।' তিজু সামনে একটা নিচু চেয়ার টেনে বসে পড়ল।

'বললেই হবে? অভিনব চোয়াল শক্ত করে বললেন, 'আমায় কেউ জেলে দিলে আমি সেই কাজ করি না!'

'স্যার। প্লিজ। রাধুবাবু বলেছেন, আপনি জানেন সবটা। আপনি আমার ডেড এন্ড! প্লিজ!'

অভিনব দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। তারপর বললেন, 'কবর থেকে কিছু বের করা উচিত নয়। লেট দ্য পাস্ট রিমেন ইন দ্য পাস্ট!'

'কিন্তু আমার কথাটা একবার ভাবুন,' তিজু বলল, 'নিজের জীবনে এমন একটা ঘটনা থাকলে আপনি কী করতেন স্যার!'

অভিনব মাথা নিচু করে ভাবলেন কিছু। তারপর জিজ্ঞেস করলেন, 'কিছু খেয়েছ?'

'আমি!' আচমকা প্রসঙ্গ বদলানোয় কেমন যেন ঘাবড়ে গেল তিজু।

'আর কেউ কি আছে এই ঘরে!'

'না খাইনি!' মাথা নাড়াল তিজু, 'খিদে পায়নি আমার!'

'চুপ!' অভিনব ধমক দিলেন, 'আমি বলেছি তোমার কী পেয়েছে না পেয়েছে বলতে?' তারপর গলা তুলে, 'কার্তিক, কার্তিক' বলে ডাকলেন দুবার।

কাজের ছেলেটি দৌড়ে এসে দাঁড়াল।

অভিনব বললেন, 'এই বাবুটি উপবাস করছে। তুই কিছু খাওয়াতে পারবি একে?'

কার্তিক বলল, 'স্যান্ড উইচ করে দিই? চিকেন স্যান্ড উইচ!'

'কিন্তু, প্লিজ... আমার খিদে পায়নি। শুধু শুধু কষ্ট করবেন না।' তিজু আবার প্রতিবাদ করল।

'কার্তিক নিয়ে আয়!' অভিনব আর কথা বাড়াতে দিলেন না।

কার্তিক ঘাড় নেড়ে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। তিজু মুখ গোঁজ করে বসে রইল।

অভিনব জিজ্ঞেস করলেন, 'কী হল? অমন মুখ কেন?'

'স্যার,' তিজু বলল, 'আমায় সবাই বলেছিল আমি যেন না আসি এই ব্যাপারে। আমি কারও কথা শুনিনি। কাউকে কিছু না বলে চলে এসেছি তাকে খুঁজতে!'

'কেন এসেছ?' অভিনব সোজা তাকালেন তিজুর দিকে, 'জাস্ট

কৌতূহল?'

'না স্যার,' তিজু দীর্ঘশ্বাস ফেলল, 'আমি একবার দেখতে চাই তাকে। কারণ আছে বলেই দেখতে চাই।'

অভিনব বললেন, 'কমলিনী কবে মারা গেছেন?'

তিজু বলল, 'মাস দেড়েক হয়েছে।'

'দেড় মাস? অভিনব মাথা নাড়লেন। তারপর নিজের মনে বললেন, 'ইউ ডোন্ট লুক লাইক ইওর মাদার। ইওর মাদার ওয়াজ আ স্পেশাল উওমান!'

'নাইদার আই লুক লাইক মাই ফাদার, স্যার!' তিজু চোয়াল শক্ত করল সামান্য। তারপর বলল, 'আই মিন মাই ফস্টার ফাদার!'

অভিনব মুখ তুলে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলেন ওর দিকে।

তিজু সামলাল নিজেকে, 'আমার বাবা খুব ভালবাসতেন আমায়। দীপনের চেয়ে আমায় ভালবাসতেন বেশি। আমিও, খুব ভালবাসতাম!

'তাহলে! কেন জিজ্ঞেস করছ এসব? কী হবে জেনে?'

'আমি একবার তাকে দেখতে চাই স্যার। দেখতে চাই কেমন সেই মানুষটা! কেন সে এমন করল! কেন এভাবে পালিয়ে গেল! যদি ভালই না বাসবে তবে কেন এমনটা করল মায়ের সঙ্গে? আমার সঙ্গে! আমি তাকে এটাই জিজ্ঞেস করতে চাই। মা মৃত্যু শয্যাতেও অস্ফুটে বলছিল তার কথা! কিন্তু নামটা বলেনি! কিছুতেই বলেনি!'

'তাহলে কী বলেছে?' অভিনব স্থির গলায় জিজ্ঞেস করলেন।

'বলেছে, আমার বাবা আসলে সেই লোকটা! বলেছে এখনও মা চোখ বন্ধ করলে সব দেখতে পায়! আমি যখন খুব জোর করেছি কে লোকটা বলার জন্য, তখন উত্তর দিয়েছে, রাধুকাকুর কাছে গেলে আমি পথ পাব! মা নেই আর। আমার জীবনে আর কিছু নেই স্যার! আমায় প্লিজ একবার বলুন, কে সেই লোকটা! কী হয়েছিল? এখন সে কোথায়! প্লিজ স্যার বলুন আমার বাবার নাম কী?

অভিনব চোয়াল শক্ত করে বাইরের দিকে তাকালেন। বাইরে আবছা ভাবে সেই পাখির ডাক ভেসে আসছে। জানলা দিয়ে শীতের দুর্বল রোদ এসে ছড়িয়ে পড়ছে সারা ঘরে! নিস্তব্ধ দুপুর মিশে যাচ্ছে মনখারাপ করা বিকেলের সঙ্গে! যেন আনমনা এক নদী এসে মিশছে মনখারাপের কোনও জঙ্গলে!

অভিনব এবার তাকালেন তিজুর দিকে। তারপর বললেন, 'সে তো মারা গিয়েছে! বহু বহু বছর আগে মারা গিয়েছে?

## ॥ ১৩ ॥

### স্মাহি

করিডোরে দাঁড়িয়ে চোখ বন্ধ করল স্মাহি। শরীরটা খারাপ লাগছে খুব। কাল সারারাত উদ্বেগ নিয়ে কেটেছে। কী হয় কী হয় একটা ভাব। এমন পরিস্থিতিতে কোনওদিন পড়েনি স্মাহি। এভাবে যে কাল সারারাত ফ্যাক্টরির মধ্যে আটকে যেতে হবে সেটা বুঝতে পারেনি।

দীর্ঘদিন ধরে তলায় তলায় একটা ঝামেলা পাকছিল। কিন্তু সেটা যে আচমকা এভাবে ফেটে পড়বে বুঝতে পারেনি!

ও করিডোরে হেলান দিয়ে দাঁড়াল। একটু আগে চোখে মুখে জল দিয়ে এসেছে। শীতকাল, তাও জল দেবার পরে ঠান্ডা লাগছে না! বরং একটু যেন ভাল লাগছে। তবে শরীর ছেড়ে দিচ্ছে আস্তে আস্তে। মনে হচ্ছে ঘুমিয়ে পড়বে যেকোনও সময়!

ফ্যাক্টরির এক পাশে ওদের অফিস। সেখানে জনা বিশেক ছেলে মেয়ে কাজ করে। সবাই কাল আটকে পড়েছিল। স্মাহিসহ আরও ছয় জন আছে ওদের ডিপার্টমেন্টে। তারা সবাই কনফারেন্স রুমে আধ শোয়া হয়ে কাটিয়েছে!

এটা মফসসল শহর। শীতে ঠান্ডা পড়ে বেশ। কাল রাতে শীতেও কষ্ট হয়েছে। খাওয়া-দাওয়ায় সেভাবে কিছু হয়নি। কারণ ক্যান্টিন চালাতে দিচ্ছে না ফ্যাক্টরি-গেটের বিক্ষোভকারীরা!

তারওপর মানসিক চাপ তো আছেই! সব মিলিয়ে শরীরটা ভাল লাগছে না।

বেশ কিছুদিন ধরেই ঝামেলা যে একটা পাকছে সেটা বেশ বুঝতে পারছিল স্মাহি। মালিক পক্ষ শ্রমিকদের মাইনে দিচ্ছে না মাস দুয়েক। সেই নিয়ে অসন্তোষ বাড়ছিল।

গতকাল অফিসে আসার সময় ট্রেন থেকে নেমে যখন হাঁটছিল অফিসের দিকে, আচমকা বলাই এসে ধরেছিল ওকে। মানে ঠিক ধরেনি, পাশে এসে ওর সঙ্গে হাঁটছিল। সামান্য বিরক্তই লাগছিল স্মাহির। এই ছেলেটা কেমন একটা বেহায়া টাইপের। বললেও বোঝে না যে ওকে পছন্দ নয়!

স্মাহি তাই পাত্তা দিচ্ছিল না বিশেষ!

বলাই সামান্য উশখুশ করে বলেছিল, 'তুমি, আজ আর অফিসে ঢুকো না।'

স্মাহি বিরক্ত হয়ে তাকিয়েছিল ওর দিকে।

বলাই সামান্য গুটিয়ে গিয়েছিল যেন। তারপর বলেছিল, 'রাগ কোরো না প্লিজ। আমি জেনেই বলছি। আজ একটা ক্যাচাল হবে। ফ্যাক্টরি গেটে বিকেলে ধর্ণা বসবে। আজ হেড অফিস থেকে ফাইনান্স ডিরেক্টর আসবেন তো। তাই তার সামনে দাবিদাওয়া নিয়ে একটা বড় ডেমনস্ট্রেশান দেওয়া হবে। হয়ত আরও বড় ঝামেলা হবে। তখনই ভেবেছিলাম তোমায় বলে দিই। কিন্তু সাড়ে দশটা বেজে গিয়েছিল বলে আর ফোন বা মেসেজ করিনি। আর সকালে ইউনিয়ানের কাজে এত ফেঁসে গিয়েছিলাম যে সময় করে উঠতে পারিনি। আমি এখন ফ্যাক্টরি ইউনিয়ানেই যাচ্ছি। তাই তোমায় দেখে মনে হল বলে দিই!'

স্মাহি আগ্রহহীন মুখে তাকিয়েছিল বলাইয়ের দিকে। তারপর বলেছিল, 'এত বকবক করো কেন?'

'মানে! সামান্য ঘাবড়ে গিয়েছিল বলাই, 'আমি সত্যি বলছি! অন গড! মা কালির দিব্যি! আজ কিন্তু ঝামেলা হবে একটা। তুমি বুঝতে চাইছ না। কিন্তু দেখো হবে। এখনও টাইম আছে। ফিরে যাও আজ। নাহলে সারারাত কিন্তু আটকে থাকতে হবে ফ্যাক্টরিতে!'

স্মাহি বিরক্ত হয়েছি এবার। ছেলেটা সারাক্ষণ গায়ে পড়ে উপকার করতে চায়। এত বিরক্ত লাগে! কেউ কেউ আছে যারা, নিজেদের সীমারেখাটা বোঝে না! কোথায় যাওত হয় জানে না।

স্মাহি ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করেছিল, 'কেন করছ এসব! এসব করে কী হয় তোমাদের?'

'কী বলছ! মাথা নেড়ে ওর দিকে তাকিয়েছিল বলাই।

ছেলেটা কথা বললে মুখ দিয়ে থুতু ছিটকোয় মাঝে মাঝে। ঘেন্না লাগছিল স্মাহির। ভাবছিল এর হুঁশ নেই! এভাবে থুতু ছিটিয়ে কথা বলছে!

বলাই বলেছিল, 'কয়েক মাস মাইনে পাই না। এদিকে কাজ চলছে। মালের সাপ্লাই থেমে নেই। বিক্রিও হচ্ছে! আমাদের ঘর সংসার নেই! আন্দোলন করব না তো বাড়িতে বসে থাকব! মালিক কোটি টাকার গাড়ি চড়বে আর আমরা আঁটি চুষব?'

'তাবলে ঝামেলা করতে হবে?' স্মাহির বিরক্তি লাগছিল।

'তোমরা বুঝবে না। তোমরা ম্যানেজমেন্টের লোক। ঠিক মাইনে পেয়ে যাচ্ছ! আমাদের অবস্থা দেখেছ! আমাদের বাড়ির বাচ্চাদের অবস্থা দেখেছ! আন্দোলন আমরা কি সখ করে করছি! শালা, বাদলদাটা ফালতু কোম্পানির পোষা দালাল হয়ে গিয়েছে! আমরা বুঝলেও কিছু করতে পারছিলাম না এতদিন। নেহাত এবার আদিত এল! ও এল বলেই না আজ এমন একটা মুভমেন্ট সম্ভব হবে!'

আদিত! নামটা এভাবে আচমকা এতদিন পড়ে শুনে কেমন যেন ইলেকট্রিকের শকের মতো লেগেছিল স্মাহির!

ও ঘুরে তাকিয়েছিল বলাইয়ের দিকে, 'আদিত?'

'হ্যাঁ! বলাই বলেছিল, 'সে তুমি চিনবে না। আমাদের পার্টির ছেলে। কলকাতায় থাকে! ভাল কথা বলে। সিনিসিয়ার। আগে রিপোর্টার ছিল! আমাদের কষ্টটা বোঝে! শালা ওই বুড়ো বাদলার মতো ধান্দাবাজ নয়!

কেমন একটা করছিল স্মাহির শরীর! আদিত ওদের ফ্যাক্টরিতে

আসে! মানে এত কাছে আসে ও! সেদিন লেক গার্ডেন্স স্টেশানের কাছে দেখল, তারপর আবার এখন এখানেও আসে! কী হচ্ছে কী! আদিত এত কাছে এসে ঘোরাফেরা করে আর ও জানে না! দেখাও হয়নি আগে! ওর মনে হচ্ছিল বলাইকে আরও কিছু জিজ্ঞেস করে আদিতকে নিয়ে। কিন্তু নিজেকে অনেক কষ্টে সংযত করে নিয়েছিল স্মাহি! ও জানে বলাই যা কৌতূহলী ছেলে এই নিয়ে হাজার রকম প্রশ্ন করবে! তাই চুপ করে মাথা নামিয়ে নিয়েছিল স্মাহি।

বলাই ঘড়ি দেখেছিল একবার, তারপর বলেছিল, 'আমি একটু তাড়াতাড়ি যাই। তুমি আমার কথাটা শুনলে পারতে। ঝামেলায় আটকে যাবে কিন্তু। আচ্ছা, আড়াইটের আগে বেরিয়ে যেও! তাহলেও রক্ষে পাবে। নাহলে কিন্তু কপালে দুর্ভোগ আছে তোমার!

স্মাহি আস্তে আস্তে কনফারেন্স রুমের দিকে এগোল। খিদে পেতে পেতে এখন খিদে মরে গিয়েছে! গা গুলোচ্ছে সামান্য। একটু শুতে পারলে ভাল হত! কিন্তু উপায় যে নেই সেটা ও জানে!

কাল রাতে রিতাদি ফোন করেছিল। কে এখনও ফিরছে না জিজ্ঞেস করেছিল। সংক্ষেপে বলেছিল স্মাহি। রিতাদি উদ্বেগ প্রকাশ করেছিল। বলেছিল সাবধানে থাকতে।

তা সাবধানই তো আছে ও। মানে ফ্যাক্টরির চৌহদ্দির মধ্যে অফিসে তো ওরা সুরক্ষিতই! শুধু খাবার শোওয়ার যা অসুবিধে। ফাইনান্স ডিরেক্টরও আটকা পড়েছেন। কিন্তু ওঁর নিজের অফিস আর থাকার ব্যবস্থা তো আলাদা আছে। সেখানেই তিনি আছেন। শুধু কাল রাতে একবার এসেছিলেন ওদের এখানে। তারপর বলেছিলেন, ওরা যেন ভয় না পায়! সব ঠিক হয়ে যাবে!

এখন সকাল সোয়া সাতটা বাজে। কই আর ঠিক হল সব!

ফ্যাক্টরি গেটের বাইরে সিসি টিভি আছে। কিন্তু কালকেই বিক্ষোভকারীরা সেসব ভেঙে দিয়েছিল। তাই ফ্যাক্টরির উঁচু গেট টপকে বাইরে কী হচ্ছে সেটা দেখা যাচ্ছে না!

তবে সারা রাত নানান অসুবিধের মধ্যেও কোথাও যেন আবছা একটা ভাল লাগা আসছিল। মনে হচ্ছিল, হোক না গেটের অন্যদিকে। তবু কাছাকাছি তো আছে আদিত!

আজকাল নিজেকে চড় মারতে ইচ্ছে করে স্মাহির! কী করল ও জীবনটাকে নিয়ে! একটা বাজে লোকের পাল্লায় পড়ে কী করে সব কাভজ্ঞান হারিয়ে ফেলল ও! তখন কী ভূতে পেয়েছিল ওকে! দীপক কাকুকে চিনতে পারেনি!

জেঠুর কাছে আসত দীপক বেতাল। কীভাবে যেন জেঠুর সঙ্গে চেনাশুনো হয়েছিল লোকটা। লম্বা, ফর্সা, সামান্য টাক ছিল লোকটার মাথায়। দেখতে ভাল ছিল। আর কী ভাল গান গাইত!

স্মাহির মনে আছে প্রথম দিন যেদিন দীপক এসেছিল ওদের বাড়িতে সেদিন কলেজের একটা ফাংশান ছিল স্মাহির। তার জন্য সাজগোজ করে রেডি হয়ে বেরচ্ছিল ও। জেঠুকে জানিয়ে বেড়ুবে বলে ঘরে ঢুকেছিল। আর সেখানেই বসেছিল দীপক। স্মাহি তাকিয়েছিল ওর দিকে। আর দেখতে পেয়েছিল এক জোড়া মুগ্ধ বাদামী চোখ! মুগ্ধতা বুঝতে মেয়েদের সময় লাগে না। ওরও লাগেনি! আর সেই চোখের মধ্যে কী যেন ছিল একটা! ভেতরে ভেতরে নড়ে গিয়েছিল স্মাহি! কেমন একটা লজ্জা আর ভাললাগা এসে স্কেচ পেনের হিজিবিজি দাগ কেটে দিয়েছিল ওর মনে। মনে হচ্ছিল লোকটা আরেকটু দেখুক ওকে। আরেকটু তাকিয়ে থাকুক।

তারপর মাঝে মাঝেই আসত দীপক। কথা বলত সবার সঙ্গে। গান গাইত। এমন কী সবার জন্য নানান রকম খাবার কিনেও আনত! আর সবার মধ্যে স্মাহিকে আলতোভাবে হলেও গুরুত্ব দিত একটু বেশি!

তারপর একদিন বৃষ্টি হল খুব! জেঠু, দাদা আর বোন কৃষ্ণনগরে গিয়ে আটকে গেল বৃষ্টিতে! বাড়িতে জেঠিমা আর স্মাহি ছিল সেদিন! আর সেদিনই এসেছিল দীপক। ভারি একটা রাবারের ওয়াটারপ্রুফ পরে এসে দাঁড়িয়েছিল ওদের বড় বাড়িটার উঠোনে! দুপুরবেলা বলে জেঠিমা ঘুমোচ্ছিল সেদিন। স্মাহি আর দীপক অমন একটা বিশাল, নির্জন, বৃষ্টি দিয়ে মোড়া বাড়িতে একাই দাঁড়িয়েছিল মুখোমুখি!

স্মাহি বলেছিল, 'জেঠু তো নেই! জেঠিমাও ঘুমোচ্ছে! আর কেউ তো...'

ওয়াটারপ্রুফ খুলে ততক্ষণে বাড়ির দালানে এসে দাঁড়িয়েছিল দীপক। স্মাহির দিকে তাকিয়ে হেসেছিল সামান্য। তারপর মৃদু গলায় বলেছিল, 'জানি।'

স্মাহি চোখ তুলে তাকিয়েছিল চট করে। কী ছিল সেই ফিসফিসানি স্বরের মধ্যে! সেই দুপুর আর বৃষ্টির মধ্যে! বুকের ভেতরটা কেমন যেন ছমছম করে উঠেছিল স্মাহির! শ্বাস দ্রুত হয়ে উঠেছিল অকারণেই! অকারণেই? নাকি কারণ ছিল। এমন একটা কারণ যেটা স্মাহি নিজেকেও জানাতে ভয় পেত!

ও দম আটকে আসা স্বরে মাথা নামিয়ে কোনওমতে বলেছিল, 'তাহলে আপনি এলেন কেন?'

দীপক সামান্য এগিয়ে এসেছিল ওর দিকে। তারপর বলেছিল, 'তুমি জানো না?'

'আমি!' চমকে উঠে তাকিয়েছিল স্মাহি। দেখেছিল দীপক এসে দাঁড়িয়েছে একদম সামনে! আর ও দীপকের চিবুকটা দেখেছিল সামনে থেকে! খাঁজ কাটা। নীলাভ! বুকের মধ্যে এক হাজার কাচের বাসন ভেঙে পড়েছিল ঝনঝন করে! ও বুঝতে পারছিল সব ভেসে যাচ্ছে, ধুয়ে যাচ্ছে প্রবল বৃষ্টিতে!

দীপক আলতো করে ওর কোমর ধরে একরকম উঠিয়ে নিয়েছিল কোলে! তারপর দেওয়ালের সঙ্গে চেপে ধরে ঠোঁট দিয়ে চেপে ধরেছিল ঠোঁট! ভিজ দিয়ে খুঁজছিল ওর জিভ! আর গভীর জঙ্গলের মতো আফটার শেভ লোশনের গন্ধে ডুবে যেতে যেতে স্মাহি বুঝতে পারছিল তলপেটে কীসের একটা চাপ লাগছে! দীপক যখন ওর ঠোঁট থেকে ধীরে ধীরে মুখটা নামিয়ে আনছিল বুকের দিকে, স্মাহিও তখন আস্তে আস্তে নিজেকে চেপে ধরেছিল তলপেটের সেই উদ্ধত ভালবাসায়!

দীপক ওর চেয়ে বাইশ বছরের বড় ছিল। কিন্তু একান্তে নাম ধরেই ডাকত দীপককে! কীসের যে কুহক ছিল সেটা আজও বুঝতে পারে না, কিন্তু দীপক ডাকলেই চলে যেত স্মাহি! কলকাতায় বন্ধুর বাড়ি থাকবে বলে বাড়িতে মিথ্যে বলে গিয়ে হোটেলে দীপকের সঙ্গে থেকেছে স্মাহি। নিয়মিত ভাবে মিলিত হত ওরা! দীপক পাগলের মতো আদর করত ওকে! স্মাহি নিজেকে ছেড়ে দিত একদম। শরীরের মধ্যে যে এমন একটা স্বর্গ আছে সেটা দীপকের কাছে গেলে বুঝতে পারত ও! কেমন একটা জালে জড়িয়ে গিয়েছিল স্মাহি। অন্ধের মতো হয়ে গিয়েছিল! আর তাই তো দেখতে পায়নি আদিতকে! কাছেই তো ছিল! তাও দেখতে পায়নি! আর আজ এতদিন পড়ে সেই সকালটার কথা মনে পড়লে কষ্ট হয় স্মাহির! এই এত দূরে এসে আজ যেন স্পষ্ট দেখতে পায় আদিতকে! শুধু আদিত আর দেখতে পায় না ওকে! আদিতের হয়ত মনেও পড়ে না!

স্মাহি হাতের ঘড়িটা ধরল! কে দিয়েছে ওকে এই ঘড়ি! ওই হলুদ পালক! আদিত কি! ও যে ভাবে আদিত ওকে দেখতে পায় না, সেটা কি তাহলে ঠিক নয়! কিন্তু তাহলে আদিত আসবে না কেন সামনে! ওকে যদি সত্যি পছন্দ করে তাহলে কেন আড়ালে থাকবে! নাঃ, আদিত নিশ্চয় দেয়নি এই ঘড়ি! তাহলে কে দিল! কেন দিল!

'কীরে তুই এখানে দাঁড়িয়ে কি করছিস! সীমাদির কথায় যেন ঘোর কাটল স্মাহির। দেখল সীমাদি ওর ব্যাগটা নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে!

সীমাদি ওর সঙ্গেই কাজ করে। খুব ভাল মহিলা। স্মাহিকে বোনের মতোই দেখে।

সীমাদি বলল, 'আরে পুলিশ এসেছে! ঘেরাও তুলে দিয়েছে। ফাইনান্স ডিরেক্টর সাহেব বলেছেন আমাদের সাবধানে পুলিশের কর্ডনের মধ্যে বেরিয়ে যেতে! চল চল দেরি করিস না!'

সীমাদি কথা শেষ করে, এক রকম ধাক্কিয়ে ওকে বের করে আনল অফিস থেকে। রোদে বেরিয়ে চোখ কুঁচকে আকাশের দিকে তাকাল স্মাহি! সকালের সানস্নাস-পরা রোদ! নরম।

গেটের বাইরে থিকথিক করছে লোকজন। ওদের দেখেই শ্লোগান উঠল। কিন্তু কীসব বলছে সেদিকে কান দিল না স্মাহি। দুদিকে পুলিশ বেতের ঢাল নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মাথায় হেলমেট। তাদের মধ্যে দিয়ে মাথা নিচু করে দ্রুত সামনে এগিয়ে গেল সামনে।

বড় রাস্তা অবধি পুলিশ এগিয়ে দিল ওদের। সামনেই রিক্সা স্ট্যান্ড। স্মাহি আর কোনওদিকে না তাকিয়ে একটা রিক্সায় উঠে পড়ল। তারপর স্টেশানের দিকে যেতে বলে রিক্সার হুডটা টেনে নিল মাথার ওপর। এখন সোজা বাড়ি গিয়ে ঘুমোবে! আর পারছে না!

"স্মাহি স্মাহি!' কে যেন চিৎকার করে ডাকল ওকে। চোখ খুলে তাকাল ও। বলাই। গলাটা চিনতে পেরেছে। ওফ্, কী জ্বালাতন! কাঁহাতক আর এসব ভাল লাগে! বিশেষ করে এখন!

তাও রিক্সাওলাকে রিক্সা দাঁড় করাতে বলল স্মাহি!

বলাই সাইকেলটা দাঁড় করাল ওর পাশে। তারপর নেমে এগিয়ে এল, 'তুমি ঠিক আছো?'

স্মাহি বেজার মুখে একটা হাই আটকে বলল, 'খুব ক্লান্ত। প্লিজ কিছু বলার হলে বলো!'

সামান্য থমকে গেল বলাই। বুঝতে পেরেছে এভাবে আটকানোতে স্মাহি বিরক্ত হয়েছে!

ও বলল, 'না মানে... তুমি ঠিক আছো কীনা তাই জানতে চাইছিলাম। আসলে, কাল আমার কথা শুনলে এই দুর্ভোগ হত না তোমার। এদিকে কেস খুব বিগড়ে গেছে!

স্মাহি তাকাল। এসব ভাল লাগছে না এখন। ছেলেটা বোঝে না কেন!

বলাই বলল, 'আদিতের ওপর নেতারা খুব ক্ষেপে গিয়েছে এমন ঘেরাও করায়। বাদলদা থেকে কলকাতার বড় নেতারা সবাই খচে বোম! আদিত নাকি নিজেকে সামনে আনতে চেয়ে এসব করছে! জানো আমি তো শুনলাম...'

স্মাহি সোজা হয়ে বসল। আদিতের ওপর রেগে গিয়েছে নেতারা! ও তাকাল বলাইয়ের দিকে, 'কী হয়েছে?'

বলাই এদিক ওদিক তাকিয়ে নিচু গলায় বলল, 'আদিতকে না কিছু করে দেয়! মানে বাদলদা বলল, মালটার ডানা ছাঁটতে হবে। খুব উড়ছে! ওরা ওড়া বের করছি দাঁড়া! আমার তো শুনেই ভয় লাগছে! আদিতকে মেরে না দেয়?'

একটা পায়রা ছিল জেঠুর! বাদামী আর সাদা মেশানো রঙ! খুব উড়ত আকাশে। ডিগবাজি খেত! আদিত ভীষণ পছন্দ করত সেটাকে। পাখিটা যেদিন মারা গেল, আদিত খাঁচার জালে মাথা রেখে কেঁদেছিল খুব! বলেছিল, 'আমি যা ভালবাসি তাই চলে যায় আমার থেকে! তাই নষ্ট হয়ে যায়!'

আজ আচমকা সেই কথা মনে পড়ল স্মাহির! আর দম বন্ধ হয়ে এল ওর! মনে হল, আদিতের মতো ওরও কি এমনটাই হয়! যা যা পছন্দ করে তাই কি চলে যায় ওর থেকে! অলক্ষ্যে বসে থাকা কেউ কি ওর পছন্দের সব কিছু কেড়ে নেন! তাহলে কী পড়ে থাকে ওর হাতে! শুধু মাত্র হলুদ পালক! নির্জন এক টুকরো হলুদ পালক!

## ॥ ১৪ ॥
## নিরমুক্তা

এই রাস্তাটার কী যেন নাম! মুকু মাথা নিচু করে রাস্তার দোকানে সাইন বোর্ড দেখার চেষ্টা করল। আজ আচমকা বৃষ্টি হয়েছে! চারিদিক কেমন যেন মেঘলা আর কুয়াশায় ঢাকা! আজ সকালে নেট-এ আবহাওয়ার পূর্বাভাস দেখছিল, সেখানে বলছে আগামী কয়েকদিন নাকি এমন কুয়াশা থাকবে!

আজ ডিসেম্বরের কুড়ি তারিখ! দেখতে দেখতে ছুটির দিনগুলো কি করে যে বেরিয়ে গেল! কিন্তু কাজের কাজ তো কিছু হয়নি! মুকু কলেজ স্ট্রিটের সেই পিসির বাড়ি ছাড়াও আরও কয়েক জায়গায় গিয়েছিল। এমন কী হালিশহর পর্যন্ত ঘুরে এসেছে তিজুদের এক দূর সম্পর্কের আত্মীয়ের কাছে! কিন্তু কেউ তিজুর খবর জানে না। এমন কী একজন তো মনেও করতে পারছিল না তিজু কে!

'এতদিন পরে ছুটি পেল আর এভাবে নষ্ট করলে!' প্রিতম রাগ করছিল গত পরশু। বলছিল, 'এখনও ওই স্বার্থপর লোকটা তোমার মাথা থেকে বেরয়নি কেন ভেবে অবাক লাগছে আমার! তুমি এলে না বলে আমি ছুটি ক্যানসেল করলাম! আমার খুব খারাপ লাগছে!'

মুকু প্রিতমের এসব কথায় কোনও বাঁধা দেয়নি। বরং সময় নিয়ে ওকে শেষ করতে দিয়েছিল। তারপর ঠান্ডা গলায় বলেছিল, 'একটা লোককে কেউ খুঁজে পাচ্ছে না! সেটা দেখা কি কর্তব্য নয়!'

'কর্তব্য এক তরফা হয় না! তোমার অমন সময়ে সে কি কর্তব্য করেছিল?' প্রিতম দাঁতে দাঁত চেপে বলেছিল, 'আর তুমি এখন কর্তব্য দেখাচ্ছ!

মুকুর মাথা ঝাঁ ঝাঁ করছিল! মনে হচ্ছিল প্রিতমকে সেসব কথা বলাটাই ভুল হয়েছিল খুব! রাগটা যে পাকাচ্ছে বুঝতে পারছিল মুকু। ও জানে রাগ ওর মধ্যে একটা দেওয়াল তুলে দেয়! ওই পাড়ে থাকা মানুষটা তখন অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে! মুকুর মনের মধ্যে অন্য একটা দরজা যেন খুলে যাচ্ছিল! নিজের কাছে যেন আরও স্পষ্ট হয়ে যাচ্ছিল যে প্রিতমকে আসলে সত্যিই ভালইবাসেনি ও! কেবল একটা ভাল লাগা আর সেটল করার লজিক-এ ভর দিয়ে এতদিন যেন নিজেকে টানছিল ও। সেই লজিকটাকেই কেমন যেন সত্যতার প্রলেপ দিয়ে ভালবাসা বলে চালাবার চেষ্টা করছিল নিজের কাছে! কিন্তু সত্তা গিলটি করা গয়নার মতো জীবনের সামান্য ঘষা খেতেই সেই চকচকে ভাব উঠতে শুরু করেছে! মুকুর এখন মনে হচ্ছে কী করে এই সম্পর্ক থেকে বেরবে ও!

কিন্তু ভাবলেই তো আর করা যায় না! বড় হওয়ার সঙ্গে সব ভেঙে ফেলার, পালটে ফেলার ইচ্ছেগুলোকে লাগাম পরাতে হয়। তাই প্রিতমের সঙ্গে কথা বাড়ায়নি! আর কার জন্যই বা বাড়বে! সত্যি তো কে আছে ওর! সে তো ডিভোর্স দিয়ে দিল! হ্যাঁ, মুকু খুব জোর করেছিল, সেও কয়েকবার বুঝিয়েছিল! কিন্তু তারপর তাও দিয়ে দিল তো! জোর করে একদম ধরে তো রাখল না! তাহলে কীসের আশায় ও প্রিতমকে বারণ করে দেবে!

'কীরে চুপ কিরে আছিস কেন? এখনও রেগে আছিস?' মা পাশের থেকে আলতো করে হাত ধরল ওর!

মুকু তাকাল। মায়ের শরীর এখন ভাল। কিন্তু তাও ফিরে যায়নি। ওর সঙ্গেই থেকে গিয়েছে! মুকু বলেছিল তুমি ফিরে যাও মা। কিন্তু মা পাত্তা দেয়নি। কেন পাত্তা দেয়নি, সেটা কাল রাতে বুঝতে পেরেছে মুকু!

ডিনার করে মুকু তখন বড়ি লোশন নিয়ে বসেছিল।

মা শুয়ে পড়েছিল নিজের বিছানায়। লেপের মধ্যে থেকে শুধু মাথাটাই দেখা যাচ্ছিল মায়ের।

মা বলেছিল, 'কাল কিন্তু তোর ওইসব হাবিজাবি কাজ রাখবি না! তুই আমার সঙ্গে কাল একটা জায়গায় যাবি। বিকেলে। দরকার আছে'

'কীসের দরকার?' মুকু লোশন মাখা থামিয়ে তাকিয়েছিল মায়ের দিকে।

মা বলেছিল, 'কাল প্রিতমের বাবা মা আসবে। আমাদের চায়ের নেমন্তন্ন করেছে! যাব আমরা!'

'কী!' মুকু অবাক হয়ে তাকিয়েছিল মায়ের দিকে, 'এসব কবে হল! আর আমায় বলোনি কেন! তুমি বলোনি, প্রিতম বলেনি! কেন! আমায় বলার দরকার মনে করোনি!'

মা বলেছিল, 'সারাক্ষণ মুখ নাড়বি না! যত টাকাই রোজগার করিস। তুই আমার মেয়ে!'

'হ্যাঁ, মেয়ে, ক্রীতদাসী নই! আমাদের দেশে বাবা মায়েরা তো সন্তানদের ক্রীতদাস মনে করে?' মুকু বিরক্তিতে লোশনের শিশিটার মুখ আটকে পাশের দিকে ছুঁড়ে দিয়েছিল।

মা লেপের মধ্যে আরও ঢুকে গিয়ে বলেছিল, 'যা বলেছি শুনবি। ব্যাস। নিজে একটা বিয়ে করে দেখলি তো কী হল! তখনই বলেছিল

ফালতু ছেলে! প্রতমের সঙ্গে ব্যাপারটা আমি কিছুতেই ভাঙতে দেব না!'

ঘরের আলো নিভিয়ে চুপ করে লেপ টেনে শুয়ে পড়েছিল মুকু। কেন কে জানে চোখে জল আসছিল বারবার। মা এখনও এমন করে ভাবে! তিজুকে এখনও এতটা ঘৃণা করে! মুকুর মধ্যে থেকে আবার যেন সেই কলেজবেলার মুকু বেরিয়ে আসছিল! আবছা অন্ধকার ঘরে, লেপের মধ্যে মুখ ডুবিয়ে ও যেন আবার সেই 'কুল ওয়াটার' পারফিউমের গন্ধ পাচ্ছিল! তিজুর গন্ধ পাচ্ছিল! নিজের ওপর রাগ হচ্ছিল ওর! কেন তিজুকে ও সরিয়ে দিল! কুয়াশা সরিয়ে নাবিকের কাছে যেভাবে ধীরে ধীরে জেগে ওঠে দ্বীপ, সেভাবেই ওর সামনে যেন নিজের মনের ইচ্ছেগুলো পরিষ্কার হয়ে উঠছিল! নিজে যেন বুঝতে পারছিল আসলে তিজুর প্রতি ভালবাসা কোনওদিনই মরে যায়নি। রাগ আর অভিমানের কুয়াশায় ঢাকা পড়েছিল মাত্র! কিন্তু যত আরেকটা সম্পর্কে পাকাপাকি ভাবে আটকে পড়বে মনে হচ্ছে, ততই তিজুর প্রতি যেন টান বাড়ছে মুকুর! কষ্ট বাড়ছে! যেন বুঝতে পারছে দীপনের ডাক একটা অজুহাত মাত্র, আসলে ও মনে মনে তিজুর দিকেই যেতেই চায়!

ওই ঘোলাটে অন্ধকারে যেন নিজের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছিল মুকু। আর যেন কোনও আড়াল ছিল না! জীবন যেন কানে কানে ওকে বলছিল, 'এবার, অন্তত এবার ভান বাদ দে! এবার নিজের মনের ইচ্ছেটা নিজের কাছে স্পষ্ট করে বল। রাগ, অহম আর অভিমানের উর্ধে উঠে, এবার নিজের কাছে সত্যি হ!'

মুকু যেন বুঝতে পারছে, নিজের কাছে 'সত্যি' হতে পারে না বলেই মানুষের এত কষ্ট! এত মনখারাপ!

তবে, মায়ের সঙ্গে আর প্রতমের বাড়ির লোকজনের সঙ্গে দেখা করতে আপত্তি করেনি! দেখা করবে না বললে শুধু শুধু ঝামেলা আর অশান্তি হবে! দেখাই যাক না ওঁরা কী বলেন!

নাইন্থ সিফনি বেজে উঠল আবার! কে এখন ফোন করল! ব্যাগের থেকে মোবাইলটা বের করে দেখল মুকু। রাজু বলে সেই লোকটার নাম্বার! বিরক্তিতে মুখটা বেঁকে গেল! প্রতমের কীসব পরিচিত মানুষজন! সত্যি কারা মানুষের হয়ে কাজ করার নামে ভেক ধরে দেশে লুঠতরাজ করছে! সেদিন দেখা হওয়ার কথাটা আবার মনে পড়ে গেল মুকুর!

সেদিন রাজুর বাড়ির মধ্যে ঢুকে সামান্য থমকে গিয়েছিল মুকু। বাইরে যেমন লোকজন বেশ, তেমন ঘরের মধ্যেও বেশ কয়েকজন বসেছিল। আর সবাই ড্যাবড্যাব করে তাকিয়েছিল ওর দিকে।

'আপনি ম্যাডাম ওই ঘরে চলে যান!' একটা লোক ওকে সামনের দিকের একটা ঘর দেখিয়ে দিয়েছিল!

পায়ে পায়ে সেই ঘরের দিকে গিয়েছিল মুকু। জুতো খুলে আসতে হয়েছিল ঘরে ঢোকার দরজার কাছে। ঠান্ডা মার্বেলের মেঝে যেন পিন ফোটাচ্ছিল পায়ের পাতায়!

মুকু দরজায় গিয়ে নক করেছিল। ভারি কাঠের দরজা। অর্ধেকটা ঘষা কাচে ঢাকা!

দরজার ভেতর থেকে 'আসুন' শুনে ভেতরে ঢুকেছিল মুকু।

নরম কার্পেট মোড়া একটা বড় ঘর। একদিকে বিশাল কাচের জানলা! ভার্টিকাল গ্রাইন্ডস একপাশে জড়ো করা ছিল। খোলা জানলা দিয়ে হই হই করে রোদ ঢুকে আসছিল সেদিন!

নরম একটা চেয়ার টেনে বসে নিজেকে গুছিয়েছিল মুকু।

রাজু সামনে ঝুঁকে তাকিয়েছিল ওর দিকে, 'প্রিতমদা বলেছে আপনার কথা বৌদি! তবে কী জানেন, খুব চাপে আছি। পাঁচ মিনিটের বেশি কথা বলতে পারব না। কিন্তু মনে করবেন না। কিন্তু আমি নিরুপায়! তাই দ্রুত বলুন!'

মুকুর বিরক্তি লেগেছিল লোকটার কথা বলার ধরণে। কিন্তু স্বাভাবিকভাবেই বাইরে প্রকাশ করেনি! ও শুধু কথায় ব্যাপারটা গুছিয়ে বলেছিল।

রাজু সবটা শুনে চুপ করেছিল একটু। টেবলের এক পাশ থেকে একটা ছোট্ট সাদা কৌটো বের খুলে তার থেকে জর্দার মতো মুখে দিয়েছিল কিছু। কয়েকবার চিবিয়ে তার রস গিলে নিয়ে বলেছিল, 'এতে আমি কী করব বুঝতে পারলাম না! আমি পুলিশ নই! গোয়েন্দা নই! আমার ক্ষমতাও নেই কিছু। প্রিতমদা আমার কাছে আপনাকে পাঠাল কেন বুঝতে পারলাম না! আপনি বলছেন পুলিশে জানালে অনেকে জেনে যাবে। ওদের বিজনেসে সমস্যা হবে। বোর্ড অব ডাইরেক্টরসে প্রবলেম হবে। কিন্তু তাতে আমি কী করব বলুন তো! পুলিশ ইনভেস্টিগেট করলে নাহয় আমি ওদের কাজটা এক্সপিডাইট করার জন্য নবেদাবস্থ করতাম! কিন্তু সেটা যখন সম্ভব নয়, তখন আমি বুঝতে পারছি না কী করব!

রাজু কথা শেষ করে মুকুকে দেখিয়েই নিজের ঘড়িটায় চোখ রেখেছিল। এর কী অর্থ সেটা মুকুর বুঝতে অসুবিধে হয়নি! ওর রাগ হচ্ছিল খুব! কেন এখানে ওকে পাঠাল প্রিতম!

রাজু যেন বুঝতে পেরেছিল ওর মনের ভাব। তাই কিছুটা সান্ত্বনা দেবার ভঙ্গীতেই বলেছিল, 'আপনি ওর কোনও ছবি এনেছেন? দিয়ে যান। আমি দেখব!'

মুকু বলেছিল, 'মোবাইলে আছে!'

'আমায় হোয়াটস্যাপ করে দেবেন! আমি চেষ্টা করব! সরি আমায় বেরতে হবে। তাই মানে...'

'আমি আসছি। থ্যাঙ্কস ফর ইওর টাইম!' মুকু আর না দাঁড়িয়ে বেরিয়ে এসেছিল ঘর থেকে।

রাজু পেছন থেকে বলেছিল, 'আপনি বৃথা খুঁজছেন। প্রাপ্ত বয়স্ক মানুষ যদি হারিয়ে যেতে চায়, কেউ তাকে আটকাতে পারে!

মানুষ হারিয়ে যেতে চাইলে কেউ তাকে আটকাতে পারে না। তাবলে কি তাকে খোঁজা বন্ধ করে দিতে হবে!

রাস্তায় এসে দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে তাকিয়েছিল মুকু। দেখেছিল অনেক ওপর দিয়ে একটা এরোপ্লেন যাচ্ছে! আকাশের গায়ে চকের মতো করে খোঁয়ার রেখা টেনে যাচ্ছে ছোট্ট রুপোলী আকাশযান! আচমকা নিজেকে ঠিক অমন সামান্য, ছোট্ট আর একলা লেগেছিল মুকুর! কেমন নেন চোখে জল এসে গিয়েছিল। কার ওপর এমন রাগ করে হারিয়ে গেল তিজু! ওর ওপর! দীপন কেন কিছু বলছে না কেন এমনটা করল তিজু!

রেস্টুরেন্টটা খুব সুন্দর! সাদা আর কালোয় সাজানো! একদম যেন ব্রিটিশ রাজের সময় থেকে তুলে এনে কেউ এই পূর্ণদাস রোডে বসিয়ে দিয়েছে!

সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠে এক কোণে প্রিতমের মা আর বাবাকে দেখতে পেল মুকু। কাছের একটা বড় আলাদা ঘর আছে। প্রিতমের বাবা মা সেই ঘরে ঢোকার মুখে ডান দিকে একটা টেবলে বসে আছেন!

মুকুরা এগিয়ে গিয়ে বসল সেখানে!

মুকু বলল, 'কাকু আপনারা এখানে! মা কাল আমায় বলল! আমি তো অবাক!

মা মুকুর পাশে বসেছে। মুকু এমন করে বলায় মা সবার চোখের আড়ালে আলতো করে ওর হাতে একটা চিমটি কাটল! মুকু বিরক্ত হয়ে মায়ের দিকে তাকাল। ও তো তেমন কিছু বলেনি! মা এমন করছে কেন!

মা বলল, 'আরে বলবেন না। কাল রাত শুনে ও তো তখনই জেদ ধরেছিল আপনাদের কাছে যাবে। আজকাল তো আর দিন রাতের পার্থক্য নেই! বিশেষ করে মুকুদের মতো অল্প বয়সীদের জীবনে আর কী!

মুকু অবাক হয়ে তাকিয়েছিল মায়ের দিকে। এভাবে মিথ্যে বলে কাকু কাকিমাকে খুশি করার কী আছে! ওর খুব অপমান লাগল।

ও বলল, 'আসলে আমি তো কাজে এসেছি এখানে একটা। তাই...'

মা আবার বাধা দিল ওকে, 'বাজে কাজ যত। ওসব বাদ দে। ওঁদের জন্য কী নিয়ে এসেছিস সেটা দে!'

মুকু চোয়াল শক্ত করল। এখানে আসার আগে মা ওকে হিন্দুস্থান রোডের কাছে একটা বড় জামা কাপড়ের দোকানে যেতে বাধ্য করেছিল। সেখান থেকে কাকু কাকিমার জন্য এখনকি জামা কাপড় কিনিয়েছে ওকে দিয়ে। এসব বাড়াবাড়ি একদম ভাল লাগে না মুকুর!

ও তাও হাসি মুখে এগিয়ে দিল প্যাকেটটা। প্রিতমের মা, মানে কাকিমা বাঁ হাত দিয়ে হাতটা ধরলেন ওর। তারপর ডান হাতে ব্যাগ খুলে একটা বালা বের করে পরিয়ে দিলেন মুকুর হাতে। রেস্টুরেন্টের আলোয় সোনার গায়ে বসানো ছোট ছোট হিরের মিছিল ঝলমল করে উঠল। মুকু স্তম্ভিত হয়ে তাকিয়ে রইল কাকু কাকিমার দিকে।

কাকিমা হেসে ওর হাতটা ধরে বললেন, 'এটা ভেবেছিলাম সিঙ্গাপুরে প্রিতমের সামনেই দেব! কিন্তু তুমি তো সময় করতে পারলে না! তাই দিয়ে দিলাম এখানে!'

মুকু কী বলবে বুঝতে পারল না! এত দামি একটা জিনিস! কীভাবে নেবে ও!

মা বলল, 'কী সুন্দর! কিন্তু ফেব্রুয়ারিতেই তো বিয়ে! তখন দিলেই পারতেন! আচ্ছা, কোথায় বিয়ে হবে ভেবেছেন! মানে লক্ষ্ণৌতে তো আমাদের বাড়ি ভাড়া করতে হবে!'

'না না,' কাকু হাত নেড়ে মাকে চুপিয়ে করিয়ে দিলেন, 'আমরা ডেস্টিনেশান ম্যারেজ করব। রেজিস্ট্রি এখানে হবে। কিন্তু আমরা বিয়েটা দেব ইউরোপে! সাউথ অব ফ্রান্স ভাল। এখনও ভেনিউ ঠিক করিনি। কিন্তু আমাদের তাই ইচ্ছে!'

'না না,' মুকু আর চুপ করে থাকতে পারল না, 'এই বয়সে আর এসব...'

'আরে!' কাকু হোহো করে হেসে উঠল, 'কী আর বয়স! আর বয়সটা ফ্যাক্টর নয়! বিদেশে কেউ এভাবে ভাবেই না! একমাত্র ছেলের বিয়ে বলে কথা! আর আমার টাকা কম নাকি! ছাগ প্রিতমের রোজগারও তো জানো! কী করব এত টাকা! সঙ্গে নিয়ে তো যাব না! একটু খরচ করতে দাও মা!'

কথাটার মধ্যে এমন একটা বাচ্চা ছেলের আবদার ছিল যে মুকু হেসে ফেলল। তারপর বলতে গেল, যে এসব ঝাঁকজমক ওর ভাল লাগে না! আর আসলে বিয়ে হবে কীনা সেটাও ও ভেবে দেখছে! কিন্তু পারল না! আচমকা ফোনটা বেজে উঠল ব্যাগের মধ্যে! কে ফোন করল এখন!

ও ফোনটা বের করে দেখল। অচেনা নাম্বার! সামান্য দ্বিধা নিয়ে ফোনটা কানে লাগাল, 'হ্যালো!'

'ম্যাডাম, আমি আপনার সঙ্গে দেখা করতে চাই। এক্ষুনি!'

'এক্ষুনি!' সামান্য ঘাবড়ে গেল মুকু, 'কে বলছেন?'

'আমি নীচেই রেস্টুরেন্টের সামনে আছি। দু মিনিট নেব! আপনার দরকারি কথাই বলব! প্লিজ যদি আসেন!'

'কে বলছেন আপনি!' মুকু সামনে বসা মানুষগুলো যাতে ঘাবড়ে না যায় সেই জন্য যথা সম্ভব ক্যাজুয়াল গলায় বলল কথাগুলো!

'প্লিজ আসুন একা। আমি বাইরেই আছি। দুমিনিট! লোকটা কেটে দিল ফোনটা।

মুকু তাকালে হাতে ধরা মোবাইলের দিকে। কে ফোন করল ওকে! এভাবে ডাকল কেন!

'কে রে?' মা ভুরু কুঁচকে তাকাল, 'এখন কাজের কথা বলব আমরা। তুই ফোনটা বন্ধ রাখ!

মুকু উঠে দাঁড়িয়ে ফোনটা প্যান্টের পকেটে ঢুকিয়ে বলল, 'জাস্ট পাঁচ মিনিটের জন্য আমি আসছি। প্লিজ ডোন্ট মাইন্ড! পাঁচ মিনিট। প্রমিস?'

তারপর কাউকে কিছু বলতে না দিয়ে দৌড়ে নেমে গেল সিঁড়ি দিয়ে!

বাইরে মেঘ করে এসেছে আরও। চুনের জলের মতো কুয়াশা ঘন হচ্ছে ক্রমে! তার মধ্যে এক পাশে দাঁড়িয়ে থাকা লোকটাকে দেখল মুকু। লোকটা বেঁটে। ভাল চেহারা। মোটা গোঁফ! নীল জ্যাকেট পরে আছে। আর একটা চিরুনী দিয়ে পাট পাট করে আঁচড়াচ্ছে নিজের লাল রঙের চুল! লোকটা ওকে দেখে দাঁত বের করে হেসে এগিয়ে এল।

মুকু তাকিয়ে রইল ওর দিকে! মনে পড়ে গিয়েছে ওর! লোকটাকে কোথায় দেখেছিল মনে পড়ে গিয়েছে! লোকটাকে ও দেখেছিল সেই পিসিমার বাড়ি থেকে বেরবার সময়! সাইকেল থাক্কা মেরেছিল লোকটাকে! কিন্তু কী চায় লোকটা! ওকে ফলোই বা করছে কেন!

মুকু দ্বিধা নিয়ে তাকাল লোকটার দিকে!

## ॥ ১৫ ॥
### খত্রিজ

বাইকটা স্টার্ট করে জগনের দিকে তাকাল তিজু। ছেলেটা আজ ওর সঙ্গে দুপুরে খেয়েছে। তারপর বেরিয়েছিল পান কিনতে। এই সবে ফিরছে! ওকে বলেছে শিশু মঙ্গল হাসপাতালের সামনে যেন ওকে নামিয়ে দেয়! সেখানে কীসের যেন একটা কাজ আছে!

কী কাজ সেটা আর জিজ্ঞেস করেনি তিজু! ও জানে জিজ্ঞেস করলে জগন হেসে একমুখ পানের পিক নিয়ে বলবে, 'আমি রিটায়ার্ড মানুষ দাদা। কিছু ইমপরট্যান্ট কাজ নয়! এমনি!'

এমনি! কথাটা ঠিকই বলে জগন। সত্যি সবটাই আজকাল এমনি লাগে তিজুর! ঘুম থেকে উঠে মনে হয়, কী আছে এই জীবনে! কে আছে ওর! দীপনের সংসার আছে! বিজনেস আছে! হ্যাঁ ওর শরীর ভাল নেই! কিন্তু আস্তে আস্তে উন্নতি হচ্ছে! ডাক্তার বলছে আর মাস ছয়েকের মধ্যে ও আবার হাঁটতে পারবে! ফিজিওথেরাপিতে কাজ হচ্ছে! ওর স্ত্রী, শ্বশুরমশায়, শাশুড়ি, দুই শালা, সবাই খুব সাপোর্টিভ! দীপনের জীবনে অনেকে আছে! সেখানে ওর কে আছে! মুকু ছিল! আর নেই! ছেড়ে গিয়েছে ওকে! আর মা! মা তো চলে গেল! কিন্তু যাওয়ার আগে নার্সিহোমে যে শেষ দুটো কথা বলে গিয়েছিল সেটা একদম পালটে দিয়েছে ওর জীবন!

'চলুন দাদা!' জগন ব্যাক সিটে উঠে পান মুখে বলল।

'হ্যাঁ!' হাসল তিজু! তারপর বাইকে স্টার্ট দিল! সারা পাড়া কাঁপিয়ে গর্জন করে উঠল বাইক!

ফ্ল্যাটের সামনের রাস্তাটা সামান্য সরু! সেটা দিয়ে বেরিয়ে ডান দিকে বাঁক নিল তিজু। অলিগলি দিয়ে গিয়ে লেক গার্ডেন্স ফ্লাই ওভারের সামনে উঠবে।

'দাদা,' পেছন থেকে জগন মৃদু ট্যাপ করল ওর কাঁধে, 'এমন সাইডকার লাগানো বাইক নিলেন কেন?'

হাসল তিজু, 'আমার ছোটবেলার ইচ্ছে ছিল এমন একটা বাইক কেনার। তাই তোকে বলেছিলাম এমন একটা জিনিস জোগাড় করে দিতে!'

'তাই তো জিজ্ঞেস করছি! জগন যে কথার শেষে রাস্তায় পানের পিক ফেলল সেটা বুঝতে পারল তিজু। এই ছেলেটাটা পছন্দ করে না ও। আগে হলে ও বলত। কিন্তু এখন আর ইচ্ছে করে না কিছু বলতে। ও একটা জিনিস দেখেছে, জীবনে কেউ কিছু শোনেনা। যে যার মর্জি মতো কাজ করে। সবার সিঙ্গল পয়েন্ট এজেন্ডা হল সে নিজে! তাই আর নিজের মুখ নষ্ট করে না তিজু! বরং এমন একাকিত্বে ডুবে থাকতে ইচ্ছে করে! না, সেটা যে ভালবেসে করে, তা নয়! কিন্তু জীবনে ও এমন একটা জায়গায় এসে পড়েছে যে সেখানে এটাতেই ও নিরাপদ মনে করে! মানুষজন ওকে হতাশ করেছে শুধু! আর কিছু করেনি!

জগন আবার জিজ্ঞেস করল, 'কী হল দাদা! আপনাকে যখন প্রথম দেখেছিলাম তখন থেকে আজকের আপনির মধ্যে অনেক ফারাক! কেন এমন হল দাদা? সরি আমি পারসোনাল স্পেসে ঢুকে পড়ছি! কিন্তু আমি জানতে চাই! আপনার স্ত্রী আপনাকে খুঁজতে এসেছেন শহরে! আর আপনি লুকিয়ে আছেন! কেসটা কী?'

'স্ত্রী?' সামান্য হাসল তিজু। পেছন দিকে মুখ না ফিরিয়েই বলল, 'স্ত্রী ছিল। এখন নেই! আর তুই এত সব জানিস, আমি কেন এসেছি সেটা খুঁজে বের করতে পারবি না!'

'খুঁজে বের করব?' জগন শব্দ করে হাসল, 'আচ্ছা দাদা, আপনি

এখনও ভালবাসেন বৌদিকে? তাই না?'

তিজুও শব্দ করে হাসল। কিছু উত্তর দিল না। বরং পালটা প্রশ্ন করল, 'তুই এখানে কী করিস বলতো! সত্যি করে বল?'

'দাদা কথা কাটালে হবে না!' জগন হাসল, 'আমি বুঝি দাদা! আজ সকালে নীপাকে নার্সিং হোম থেকে এনে আপনি যখন স্নানে গিয়েছিলেন আমি বসে ম্যাগাজিন দেখছিলাম। আপনার প্যাংটা চেয়ার থেকে সরিয়ে বিছানায় রাখতে গিয়েছিলাম, তখন আপনার মানিব্যাগটা পড়ে গিয়েছিল প্যান্ট থেকে! আমি সেটা তুলে রাখতে গিয়ে বৌদির ছবি দেখেছি ওটায়! সরি, দাদা ইচ্ছে করে দেখিনি! মানিব্যাগটা খুলে গিয়েছিল!'

তিজু কী বলবে বুঝতে পারল না! ব্রিজের ওপর বাইকের গতি বাড়িয়ে দিল!

জগন আবার বলল, 'কেন ডিভোর্স দিলেন দাদা? বেকার! মনে নিয়ে ঘুরছেন, কিন্তু বলছেন না! বৌদি এসেছে আপনাকে খুঁজতে! আর আপনি লুকিয়ে ঘুরছেন! কেন?'

তিজু হাসল। ব্রিজ পার করে এবার বাইকটাকে দাঁড় করালো রাস্তার এক পাশে। তারপর বাইকের স্টার্ট বন্ধ করে সাইডকারের ভেতরে রাখা একটা প্লাস্টিকের প্যাকেট তুলে নিয়ে বলল, 'আমি ওই লোকটাকে দিয়ে আসি!'

জগন তাকাল ওর দিকে। তারপর জিজ্ঞেস করল, 'কেন দাদা!'

তিজু দীর্ঘশ্বাস গোপন করল। কী করে ও জগনকে বলবে শেষে ছেড়ে যাওয়ার আগে মুক্ত বলেছিল, 'আমার সামনে আর আসবি না!' মুকুর কথা ও ফেলতে পারে না। আজও!

তিজু হাসল। বলল, 'বললে তুই বুঝবি না!'

'টাই মি!' জগন সোজাসুজি তাকাল।

তিজু মাথা নাড়ল জগনের নাছোড় মনোভাব দেখে। তারপর বলল, 'শোন, "I loved you like a man loves a women he never touches, only writes to, keeps little photographs of.." বুঝলি কিছু?'

জগন হাসল, 'চার্লস বুকোওস্কি! জার্মান আমেরিকান পোয়েট, নভেলিস্ট!'

তিজু অবাক হয়ে তাকাল জগনের দিকে! তারপর বলল, 'শালা, তুই জানলি কী করে? তোকে তো কোনওদিন বই পড়তে দেখিনি! তুই কে বলতো! কী করিস তুই?'

জগন আবার পানের পিক ফেলল। তারপর হেসে বলল, 'কী আবার করব দাদা! বাপ-দাদার ক্ষেতি আছে! সেখান থেকে টাকা পাঠায়। আমি তো রিটায়ার্ড!'

তিজু হেসে তাকাল ওর দিকে। তারপর আপন মনে মাথা নেড়ে হেঁটে গেল রাস্তার আরেক দিকে।

সেই লোকটা বসে আছে! ময়লা জামা! মাথায় জট! চোখ ঘোলাটে! ভাঙা চশমা! লোকটা সামনের বড় একটা পাথরের ওপর একটা বোর্ড রেখে তাতে কী যেন লিখছে!

তিজু গিয়ে দাঁড়াতেই মাথা তুলে তাকাল, 'খাবার দিয়ে কী হবে? আমার লেখার জিনিস এনেছ?'

তিজু হাসল, 'এই প্যাকেটে সব আছে!'

লোকটা প্যাকেটটা নিল। তারপর একই রকম গম্ভীর ভাবে বলল, 'আজ কত তারিখ বলোতো!'

'কুড়ি তারিখ! কেন?'

লোকটা হাসল, 'শেষ হয়ে এল তো!'

'মানে?' তিজু অবাক হল।

লোকটা উত্তর দিল না। মাথা নামিয়ে নিল আবার! তারপর সাদা কাগজে কীসব লিখতে শুরু করল!

তিজু বুঝল আর কথা বাড়িয়ে লাভ নেই!

জগন নেমে গেল শিশুমঙ্গলের সামনে! শুধু যাওয়ার আগে বলল, 'দাদা, আজ বৌদি তাঁর মাকে নিয়ে পূর্ণদাশ রোডে আসবেন। দেখা করতে পারেন কিন্তু!

তিজু আর কথা না বাড়িয়ে বাইক ছুটিয়ে দিল। অভিনব রাওয়াতের কাছে যাবে আজ। সেদিনের পর রাওয়াত আর সময় দেননি। কিন্তু আজ বলেছেন যেতে! আজ একটা হেস্তেনেস্ত করবে তিজু! আর কতদিন অপেক্ষা করবে ও! যেখানে অভিনব মানুষটার নাম জানেন সেখানে কেন বলছেন না!

সেদিনটা কিছুতেই ভুলতে পারবে না তিজু! নার্সিং হোমে বসেছিল ও একা। রাতে কাউকে থাকতে বলেছিল ডাক্তার! তাই সবাইকে বাড়ি পাঠিয়ে দিয়ে একা বসেছিল ও। আসলে মা সারা জীবন ওকে বলত, ও নাকি বাবার ন্যাওটা বেশি। মায়ের দিকে নাকি নজরই নেই! তাই যেন খানিকটা সেই অপরাধ বোধ থেকেই মায়ের কাছে একা থেকে গিয়েছিল ও! যদিও ওদের অফিসের দুজন ছেলেও বাইরের রিসেপশানে বসেছিল দীপনের নির্দেশমতো!

ওদের কোম্পানি বাবা তৈরি করে দিয়ে গিয়েছিল। এখন দীপন আর ও পার্টনার! তবে দীপনই সব দেখে! ও কতবার বলেছে দীপনকে যে ও পার্টনার থাকতে চায় না। ও তো নিজের কাজ নিয়ে সারা পৃথিবীতে ঘুরে বেড়াচ্ছে! ব্যবসার কাজ তো কিছুই করতে পারছে না! কিন্তু দীপন শোনে না কিছুতেই! ছেলেটা খুব ভালবাসে ওকে! বলে, 'দাদা, তোর যেটা ভাল লাগবে সেটা কর। এসব নিয়ে ভাববি না!' তিজু ভাবে দীপন বয়সে অনেকটা ছোট হয়েও আসলে ওই যেন বড় আর তিজু নিজে পুঁচকি এখনও!

মায়ের কেবিনের বাইরে বসে এইসব নিয়েই নানান কথা মনে আসছিল তিজুর। আর তখনই নার্স এসে বলেছিল, 'আপনি একবার আসুন। ম্যাডাম ডাকছেন!'

মায়ের হার্ট খুব দুর্বল ছিল। ডাক্তার বলেছিলেন এখন শুধু অপেক্ষা! মা যেন স্ট্রেস না নেয়! তাই মা ডেকেছে শুনে বেশ অবাক হয়ে গিয়েছিল তিজু! মা তো প্রায় অজ্ঞান ছিল! তাহলে! কথা বলছে!

তিজু দ্রুত দরজা ঠেলে ঢুকেছিল ঘরের মধ্যে। দেখেছিল নানান যন্ত্রের মধ্যে শুয়ে মা তাকিয়ে রয়েছে দরজার দিকে।

তিজু গিয়ে বসেছিল মায়ের পাশে রাখা একটা উঁচু টুলের ওপর। মা কষ্ট করে হাত তুলে কাছে ডেকেছিল ওকে। তিজু ঝুঁকে পড়েছিল মায়ের দিকে।

মা খুব কষ্ট করে অস্ফুটে বলেছিল, 'বাবু, আমায় তুই ক্ষমা করে দিস!'

'মানে!' তিজু অবাক হয়ে গিয়েছিল।

মা ক্লান্ত গলায় বলেছিল, 'আমার দিন শেষ। তাই তোকে বলে যাচ্ছি। তোর ছোটবেলায় একদিন কাঁদছিলাম আমি! মনে আছে তোর! সেদিন কারনটা স্পষ্ট বলিনি। আজ বলছি। তুই যাকে বাবা বলে জেনেছিস সে তোর বাবা নয়! তোর বাবা অন্যজন। বিয়ের আগে আমি কনসিভ করেছিলাম! আর...'

কী বলছে মা! তিজুর মাথা নিমেষে ঘুরে গিয়েছিল। মা এটা কী বলল! বাবা ওর বাবা নয়! মানে যে লোকটাকে ও সবচেয়ে বেশি ভালবাসল সে লোকটা ওর বাবা নয়! তাহলে ওর বাবা কে!

ও মায়ের দিকে তাকিয়েছিল।

মায়ের চোখ দিয়ে চল পড়ছিল সরু ধারায়! মা বলেছিল, 'কলকাতায় রাধু আছে। রাধারমণ বসু। ও জানে... ও জানে...'

'তুমি বল, ব্রিজ মা! কী নাম তার!' তিজু ঝুঁকে পড়েছিল আরও।

মায়ের শ্বাসের কষ্ট হচ্ছিল। তাও তার মধ্যে ক্ষীণ গলায় মা বলেছিল, 'আনোয়ার শা রোডে থাকে। আমার ডাইরিতে নাম্বার আছে রাধুর। ওর কাছে জানতে পারবি। আমার বলা বারণ! কথা দিয়েছিলাম... শুধু জানবি তোকে একদম ওর মতো দেখতে! একদম... তাই...'

'মা... মা এটা তুমি কী বললে!' তিজু তাকিয়েছিল মায়ের দিকে।

মা চোখ বন্ধ করে নিয়েছিল। শুধু ওর হাত ধরে বলেছিল, 'ক্ষমা করে দিস বাবু! ক্ষমা...'

মা আবার চুপ করে গিয়েছিল। ওর হাত থেকে খশে পড়েছিল

হাত! আর তিজু বুঝতে পেরেছিল মা শেষবেলায় ওকে আরও একা করে দিয়ে গেল!

পরের দিন সকালে মা চলে গিয়েছিল সবাইকে ছেড়ে। তিজুর মনের মধ্যে কী চলছিল ও কাউকে বুঝতে দেয়নি। সব কাজ মিটিয়ে শ্রাদ্ধ, নিয়মভঙ্গ পার করে ও সময় নিয়েছিল কয়েকটা দিন। তারপর ঠিক করেছিল খুঁজতে যাবে ও। যে লোক ওকে ছেড়ে দিয়েছে! যার নাম বলতে বারণ করে গিয়েছে, তাকে খুঁজে বের করবে! ওর জীবন ছেলেখেলা করার জায়গা নাকি!

ও দীপনের কাছে গিয়েছিল এরপর।

সেদিন রবিবার ছিল। দীপন অন্যদিন হুইল চেয়ারে করে অফিস যায়। কিন্তু সেদিন ছুটি থাকায়, ওদের বড় টেরাসটায় বসে একটা পেপার ব্যাক পড়ছিল।

তিজু গিয়ে সামনের চেয়ারটা টেনে বসে বলেছিল, 'আমি তোকে একটা কথা বলতে চাই দীপু।'

দীপন অবাক হয়ে তাকিয়েছিল, 'হ্যাঁ, বল না!'

'দীপু আমি একটু বাইরে যাব।'

'কবে? কাজ আছে?'

তিজু চোয়াল শক্ত করে মাথা নামিয়ে নিয়েছিল। তারপর বলেছিল, 'একটা কথা বলি। মা মারা যাওয়ার আগে আমায় বলে গিয়েছিল। মানে শুধু আমায়। আর কেউ জানে না। এই তুই জানবি! বলি?'

'বল!' দীপু বুঝতে পেরেছিল কিছু একটা ব্যাপার হয়েছে!

তিজু বলেছিল, 'আমাদের মা এক দীপু। বাবা নয়! আমি আসলে লাভ-চাইল্ড! যদিও মায়ের বিয়ের পরে আমি পৃথিবীতে এসেছি। কিন্তু আসলে আমি বাস্টার্ড!'

'কী বলছিস তুই? বাজে কথা খালি!' দীপন ঝুঁকে পড়ে হাত চেপে ধরেছিল ওর, 'এসব বলবি না। মায়ের শরীর খারাপ ছিল। কী বলতে কী বলেছে! আর সেটা তুই ধরে নিয়েছিস?'

তিজু বলেছিল, 'মনে আছে দীপু ছোটবেলায় আমায় সবাই বলতো আমি নাকি বাড়ি ছাড়া! এমন লম্বা ফর্সা তো কেউ নেই বাড়ির! না বাবার মতো দেখতে, না মায়ের মতো! সবাই এই নিয়ে কত কী বলত আমায় বলত! এখন বুঝতে পারছি কেন বলত! মা বলেছে আমায়। আমি নাকি কার্বন কপি সেই লোকটার!

দীপন চুপ করে বসেছিল কিছুক্ষণ। তারপর জোর দিয়ে বলেছিল, 'হোক, তুই বাদ দে। তোকে যেতে হবে না। তুই আমার দাদা। এটাই এনাফ! ওসব ভূত মাথা থেকে তাড়া!

'তোর জন্য এনাফ আমার জন্য নয়!' তিজু শান্ত করে দৃঢ় ভাবে বলেছিল।

দীপন বলেছিল, 'তুই যাবি না কোথাও। এসব ভুলে যা। প্লিজ। যাবি না কিন্তু'

দীপনকে খুব ভালবাসে তিজু। ছোট থেকে ওর সব কথা শুনে এসেছে। কিন্তু এই কথাটা আর শোনেনি! আসার আগে দীপনের স্ত্রী স্বপ্না খুব জোর করায় বলেছিল, কলকাতার দিকে যেতে পারে! তবে কবে সেটা বলেনি! আচমকাই চলে এসেছিল। জানত, বলতে গেলে ঠিক বাধা দেবে সবাই!

বড় বাড়িটার সামনে বাইকটা স্ট্যান্ড করিয়ে ওপরে উঠল তিজু। আজ বাইরে বেশ মেঘ আর কুয়াশা। এতটা অতটা নেই। সারা পথে এই বিকেলেও সবাই গাড়ির হেড লাইট জ্বালিয়েছে!

এই বাড়ির মধ্যেও যেন কিছুটা কুয়াশা ঢুকে পড়েছে! বেশ পাহাড়ি আবহাওয়া আজ!

লিফট দিয়ে উঠে নির্দিষ্ট ফ্ল্যাটে যেতে খুব একটা সময় লাগল না। বেল বাজাতেই কার্তিক খুলে দিল দরজা। ওকে দেখে বলল, 'বাবু অপেক্ষা করছেন আপনার জন্য!

মাথা নাড়ল তিজু। তারপর সরাসরি ভেতরের ঘরে ঢুকে পড়ল।

এই ঘরটা বেশ অন্ধকার আজ। সব দরজা জানলা বন্ধ। শুধু টিমটিমে আলো জ্বলছে একটা। বেশ সুন্দর একটা ধূপের গন্ধ ভাসছে হাওয়ায়!

ওকে দেখে অভিনব কোনও ভূমিকা না করেই বললেন, 'তুমি মোবাইল রাখো না কেন? একটা মোবাইল রাখো। এই নাও ধরো!' বলেই অভিনব একটা প্যাকেট ছুঁড়ে দিলেন ওর দিকে! বললেন, 'সিম ভরা আছে। কানেকশান করানো আছে! রাখো!'

তিজু কোনওমতে ফোনটা লুফে নিয়ে বলল, 'কিন্তু আমি তো...'

'চুপ! কথা শুনতে হয় বড়দের। রাখো ওটা। আমার কিছু দরকার পড়লে কী করে যোগাযোগ করব তোমার সঙ্গে? আমার ক্যান্সার হয়েছে জানো তো! কেমো নিয়ে কী অবস্থা হয়েছে দেখতেই তো পাচ্ছ! আমি আর ক'দিন! আমার কথাটা রাখো!'

তিজু মোবাইলটা পাশে রেখে বলল, 'স্যার, আমার এসব দরকার নেই! আপনি আমায় শুধু তাঁর নামটা বলে দিন। আমার মা বলে গিয়েছে সেই আমার বাবা! রাধুকাকু বললেন আপনি জানেন। আপনি সেদিন বললেন উনি মারা গিয়েছেন! কবে মারা গিয়েছেন? আর কী নাম, সেটা প্লিজ বলে দিন!'

অভিনব দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। তারপর উলের টুপি খুলে ন্যাড়া মাথায় হাত বোলালেন কিছুক্ষণ! ক্লান্ত গলায় বললেন, 'আমি সেদিন যা বলেছি সেটা লিটেলার্ড ধরো না! সেই লোকটা সত্যি সত্যি মরে যায়নি!'

'তাহলে!' তিজুর পা যেন কেঁপে গেল। তবে কি নামটা জানতে পারবে আজকে! ও এগিয়ে গিয়ে হাঁটু গেঁড়ে বসল সামনে।

অভিনব বললেন, 'ও বেঁচে আছে। কিন্তু যার ভালবাসার লোক তাকে বাদ দিয়ে অন্যকে বিয়ে করে নেয়, সে তো মরেই যায়, তাই না! সেই হিসেবে সে একজন মৃত মানুষ! বুঝলে!'

## ॥ ১৬ ॥
## আদিত

লম্বা ঘোলাটে রঙের করিডোরের শেষে কেমন একটা আবছা সিঁড়ি উঠে গিয়েছে অন্ধকার অবধি! কী আছে ওই অন্ধকারের মধ্যে! মনখারাপ! অনিশ্চয়তা! নাকি অপমান! কোন দিকে এগোচ্ছে আদিতের জীবন!

আদিত ধীর পায়ে ওই টানা লম্বা বারান্দার দিকে এগোল! আজ ঠান্ডা নেই তেমন! চারিদিক কুয়াশায় ঢাকা পড়ে গিয়েছে একদম! কুয়াশা নাকি ধোঁয়াশা! ও মনটাও তো এমনই হয়ে আছে! কী করবে সামনে সেটাই যেন দেখতে পাচ্ছে না! ব্যাপারটা যে এমন হয়ে যাবে ও বুঝতে পারেনি! তারপর বাবার হার্ট অ্যাটাকটা আজকেই হল।

ডিসেম্বরের কুড়ি তারিখ আজ। বাবার জন্মদিন। না সেভাবে কারওরই জন্মদিন পালন করার কোনও রীতি নেই আদিতদের! তাও আজকেই মা কেন কে জানে বাড়িতে ভাল মন্দ রান্না করেছিল একটু। পাশের বাড়ি থেকে কয়েকজনকে বলেছিল রাতে খেতে! ঘর বাড়ি গুছিয়েছিল। বাবার জন্য কিনে এনেছিলে একটা পাঞ্জাবী! কিন্তু সব আয়োজন বৃথা করে দিয়ে সন্ধেবেলাতেই অমন কাণ্ডটা হল!

গোলপার্ক মোড়ের কাছে আদিত গিয়েছিল মিষ্টি কিনতে! সেখানেই মায়ের ফোনটা পায় ও! বাবা বাথরুমে পড়ে গিয়েছে! আর উঠতে পারছে না! সব কিছু ফেলে রেখে আদিত দৌড়েছিল বাড়ির দিকে! পকেট থেকে ফোনটা বের করে ডায়াল করেছিল মাকুকে। বাবাকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে! ওর একার পক্ষে সেটা তো অসুবিধে হয়ে যাবে! কিন্তু ফোন তোলেনি মাকু! রিং হয়ে হয়ে কেটে গিয়েছিল! কেন এমনটা হল! মাকু তো এমন করে না! তাহলে!

তবে মাকু না এলেও পাড়ার লোকজন সাহায্য করেছে! অ্যাম্বুলেন্স ডেকে দিয়েছে। এমন কী পাড়ার দুই দাদা তো সঙ্গেও এসেছে! আই.সি.সি.ইউ-তে ভর্তি করে সব কিছু সেরে তারপর ফিরে গিয়েছে ওরা! মাও এসেছিল। ওই পাড়ার দাদাদের সঙ্গেই মাকে বাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছে আদিত! তারপরেও মাকুকে কয়েকবার ফোন করেছিল। কিন্তু এবার মাকুর ফোন সুইচড অফ বলছিল।

অবাক লেগেছিল আদিতের। আজ বাবার জন্মদিনে মাকুকে রাতে খেতে বলেছিল ও। বলেছিল, 'বাদলদার কাছে ফাইলটা দিয়েই চলে আসবি। দেরি করবি না কিন্তু।' মাকু বলেছিল কাজ সেরে বিকেলেই চলে আসবে। কিন্তু আসেনি! কী এমন হল যে এল না মাকু! আর ফোন কেন ধরছে না!

উপায় না দেখে মাকুর দাদার নাম্বারের ফোন করেছিল আদিত। কিন্তু সেখানেও খুব কিছু খবর পায়নি! শুধু জেনেছিল বিকেলে বেরিয়ে গিয়েছে মাকু। তারপর ওরা জানে না। মাকুকে নিয়ে ওর মা ছাড়া আর কেউ বিশেষ চিন্তা করে না! সবাই পাগল বলে কাটিয়ে দেয় ওকে। ওর দাদার গলাতেও সেই তাচ্ছিল্য শুনেছিল আদিত!

আসলে বাদলদাকে সামনের মিটিঙের জন্য চিঠি পাঠাতে হত। ইমেল ব্যবহার করে না মানুষটা। তাই আদিতকে বলেছিল ও যেন এসে দিয়ে যায় চিঠিটা! বলেছিল, 'তুই নিজে এসে দিয়ে যাবি কিন্তু!'

কিন্তু আজকের ওই ছোট অনুষ্ঠানের জন্য যেতে পারেনি আদিত। মাকু নিজেই বলেছিল যাবে। সেই তো সেটা আর জানায়নি বাদলদাকে। শুধু একটা চিঠিই তো দেবার আছে! কিন্তু পাগলটা ফোন ধরছে না কেন সেটাই বুঝতে পারছে না ও! বাদলদাকে কি তবে ফোন করা উচিত ছিল! আসলে বাড়ির ঝামেলায় অত কিছু মনে ছিল না আদিতের!

আদিত ধীরে ধীরে অন্ধকার সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠল। আশেপাশে সামান্য কিছু মানুষজন ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে! সবারই কেউ না কেউ এখানে ভর্তি! সবাইকেই অপেক্ষা করতে বলা হয়েছে! চারিদিকে কেমন যেন মৃত্যুর থমথমে ভাব! সবাই কি ওরা আসলে প্রিয়জনের মৃত্যুর অপেক্ষাই করছে! নাকি সুস্থ হয়ে ফিরবে তার অপেক্ষা করছে সবাই! আদিত কীসের অপেক্ষা করছে! কার অপেক্ষা করছে!

ঠান্ডা সাপের মতো পড়ে আসছে সামনের করিডোর! একদম শেষ মাথায় একটা ক্যান্টিন আছে। তাতে এই রাত সাড়ে এগারোটার সময় কী পাওয়া যাবে কে জানে! কিন্তু খেতে হবে কিছু। খিদে পেয়েছে! না মন চাইছে না খেতে, কিন্তু শরীর চাইছে! বরাবর মনের কথা শুনেছে আদিত, কিন্তু এখন শরীরের কথা শুনবে!

হাসপাতালের পাশে এটা একটা দোতলা বাড়ি। পুরোনো। কেমন জঙ-ধরা জাহাজের মতো দেখতে। করিডোরটাও কেমন যেন অন্ধকার। তারপর আজ এমন হাওয়ার ওড়না জড়ানো দোঁয়াশা, বাইরের ঘোর উপছে এসে ঢেকে দিয়েছে বারান্দার সব কিছু! মনখারাপের রঙ কেমন হয় সেটা আজ যেন ভালো করে বুঝতে পারছে আদিত!

ক্যান্টিনটা বড়। কিন্তু বেশ ময়লা। কাউন্টারের কাছে টিমটিম করছে একটা বাল্ব। তলায় ততোধিক টিমটিমে একটা লোক বসে রয়েছে! আদিত গিয়ে দাঁড়াল ওর সামনে। লোকটা অনিচ্ছুক চোখ তুলে তাকাল! পেছনের দেওয়ালে একটা বড় মান্ধাতার আমলের কালো বোর্ড। তাতে সাদা কালি দিয়ে নানান খাবারের নাম লেখা! যদিও বেশ কিছু আর স্পষ্ট নেই! আর জায়গায় জায়গায় চক বুলিয়ে সেগুলো স্পষ্ট করার চেষ্টা করে হয়েছে! বোর্ডের ওপরে লেখা – 'টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স সার্ভিস'!

'কিছু পাওয়া যাবে?' আদিত জিজ্ঞেস করল।

লোকটা সময় নিল একটু! দুর্বল ভাবে তাকাল ওর দিকে। তারপর কেমন একটা খোনা গলায় বলল, 'এত রাতে... ওই ঘুঘনি আর পাওরুটি হবে। ডিম নেই! ফুরিয়ে গিয়েছে!'

'তাই দিন!' আদিত কথাটা বলে এসে বসল সামনের একটা বেঞ্চে! দূরে আরেকটা বেঞ্চে কয়েকজন লোক চা নিয়ে বসে আছে! তারা খুব নিচু স্বরে কিছু একটা নিয়ে আলোচনা করছে!

আদিত পকেটে হাত দিল। দুশো টাকা পকেট আছে। কাল টাকা জমা দিতে হবে হাসপাতালে। সকালে ব্যাঙ্কে যেতে হবে! ছোট মামাকে ও ফোন করেছিল। মামা বলেছে ব্যাঙ্কে টাকা পাঠিয়ে দেবে কাল।

ছোট মামা নেহাত আছে! নাহলে কী যে হত! ফোন রাখার আগে ছোট মামা বলেছিল, 'ভয় পাবি না বুড়ো। জামাইবাবু ঠিক হয়ে যাবে। আর তুই নেক্সট মাস থেকে এখানে জয়েন করছিস। সেরকমই কিন্তু আমি বলে রেখেছি! মনে থাকে যেন! ডোন্ট লুজ হার্ট!'

হ্যাঁ, কলকাতা ছেড়ে দিয়ে নয়ডায় চলে যাচ্ছে আদিত! অনেক নিজের মর্জি আর আদর্শ দেখেছে। কিন্তু আর না! সামনের সপ্তাহে রাবার ফ্যাক্টরিতে একটা মিটিং আছে। সেটা শেষ হয়ে গেলেই মোটামুটি শ্রমিকদের একটা পথ দেখানো যাবে। তারপর সব ছেড়ে ও চলে যাবে নয়ডা। অনেক হয়েছে এইসব। আর কতদিন এভাবে বাঁচবে! বাবা মাকে শান্তি আর নির্ভরতা দেওয়াও তো ওর একটা কর্তব্য! আর এখানে থাকবেই বা কেন! কে আছে ওর! যাকে দেখে, আদর্শ মেনে ও চলে এসেছিল সেই তো এমন করল ওর সঙ্গে! তাছাড়া আগে ভেবেছিল এখানে স্মার্ট আছে! কীভাবে ওকে ছেড়ে যাবে! কিন্তু পরে দেখল এভাবে বোকার মতো প্রেমের সেন্টিমেন্ট জড়িয়ে বসে থাকলে বাবা মার কষ্ট বাড়বে বই কমবে না!

আদিত মাথা দু হাতে মাথা চেপে ধরে চোখ বন্ধ করল। রাজুদার মুখটা ভেসে উঠল সামনে! কী করে পারল রাজুদা অমন একটা কথা বলতে! একবারও মনে আটকাল না! পুশিদির সঙ্গে ওকে শুতে হবে! পাগল হয়ে গিয়েছে নাকি! এমন কথা কেউ বলতে পারে! সেদিনের সকালটার কথা ভাবলে এখনও কেমন লাগে ওর!

রাজুদা এমন করে তাকিয়েছিল ওর দিকে যে ও নড়তে পারছিল না! ওর সঙ্গে শুয়ে পুশিদি বাচ্চা নিতে চায়! নিজের কানকে বিশ্বাস করছিল না আদিত! কীসব বলছে রাজুদা!

ও শুধু অস্ফুটে বলেছিল, 'কী বলছ তুমি?'

রাজুদা ওর হাত দুটো ধরে কাতর গলায় বলেছিল, 'প্লিজ আদিত। পুশি বাচ্চা বাচ্চা করে পাগল হয়ে যাচ্ছে! ও ক্যালেন্ড হারাচ্ছে রোজ একটু একটু করে! জানিস তো আমার কাজের স্ট্রেস কেমন! বাইরে এত স্ট্রেস আর ঘরেও যদি এমন হয়, আমি তো মরেই যাব এবার! প্লিজ ভাই, আমায় তুই বাঁচা! পুশিরও তোকে পছন্দ! ও তো নিজেই বলেছে! প্লিজ আদিত?'

পুশিদি! আদিত ভাবতেই পারছিল না। এটা কী বলছে!

রাজুদা বলেছিল, 'আমরা তিনজনে দার্জিলিঙে চলে যাব। কেউ জানতে পারবে না। ইউ মেক হার প্রেগন্যান্ট দেয়ার! আমরা তারপর ফিরেও আসব।'

আদিতের বুকের ভেতর ঝনঝন্ করে ভেঙে পড়ছিল একটা গোটা শহর। রাজুদার কি মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে!

রাজুদা এবার বলেছিল, 'ঠিক আছে তুই পুশিকেই জিজ্ঞেস করে দেখ। ওর সঙ্গেই কথা বলে দেখ! এসো পুশি!'

আদিত চমকে গিয়ে পেছনের দিকে তাকিয়েছিল। দেখেছিল কখন যেন নিঃশব্দে ঘরের মধ্যে পুশি এসে দাঁড়িয়েছে! ও ভয়ে, লজ্জায় উঠে দাঁড়িয়েছিল! এসব কী হচ্ছে ওর চোখে সামনে!

রাজুদা বলেছি, 'তোরা কথা বলে নে। আমি বাইরে যাচ্ছি!'

আদিতের যেন হাত পায়ের সঙ্গে জিভও অসাড় হয়ে গিয়েছিল। পুশিদির সঙ্গে এই নিয়ে কথা বলতে হবে!

রাজুদা ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে দরজাটা বন্ধ করে দিয়েছিল। পুশিদি এসে বসেছিল ওর সামনে। আদিত বসতে পারেনি। দাঁড়িয়েই ছিল! মনে হচ্ছিল যে কোনও সময় ও মাথা ঘুরে পড়ে যাবে!

'বসো!' পুশিদি হাত ধরে বসিয়ে দিয়েছিল ওকে। যেন ছ্যাঁকা লেগেছিল আদিতের। পুশিদি বলেছিল, 'তোমার দাদা বলেছে তো আমরা কী চাই?'

আদিত কী বলবে বুঝতে না পেরে মাথা নামিয়ে নিয়েছিল।

পুশিদি বলেছিল, 'লজ্জা পাওয়ার তো কিছু নেই! এটাকে তুমি সেক্স হিসেবে দেখছ কেন শুধু! এটা একটা হেল্প হিসেবে দেখো! আমার নিজের বাচ্চা চাই আদিত! আর সেটা তোমার দাদা দিতে পারবে না! ওর শারীরিক সমস্যা আছে! তোমার নিশ্চয় নেই?'

আদিত তাও মাথা নামিয়ে রেখেছিল।

পুশিদি এগিয়ে এসে একটা আঙুল দিয়ে আদিতের থুতনি তুলে ধরেছিল, 'তোমার কি আমায় পছন্দ নয়! মানে সেক্স করতে গেলে পছন্দ হওয়াটা তো জরুরি। নাহলে ইরেকশান আসবে না তো! আমার

সাঁইত্রিশ বছর বয়স হল। আমি আর অপেক্ষা করতে পারব না! তুমি প্লিজ এমন সিফ হয়ে থেকো না। আমাকে প্লিজ হেল্প করো! সারাটা জীবন কী নিয়ে থাকব আমি! কাকে নিয়ে থাকব! কেউ জানবে না আদিত! কেউ না! প্লিজ!'

শেষে কথাগুলোর সময় পুশিদির গলায় কেমন যেন কান্না জড়ানো ভেঙে পড়া মানুষের স্বর শুনতে পেয়েছিল ও। কী বলবে বুঝতে পারছিল না আদিত। আচমকা পুশিদি এগিয়ে এসেছিল ওর কাছে তারপর কোনও প্রস্তুতি ছাড়াই ওকে টেনে নিয়েছিল নিজের দিকে! তারপর ঠোঁটের ওপর চেপে ধরেছিল ঠোঁট! একটা হাত দিয়ে আদিতের হাতটা ধরে টেনে নিয়ে রেখেছিল নিজের বুকের ওপর! আদিত নিজের করতলে নাইটির ওপর দিয়েও বৃন্তের জেগে ওঠা টের পেয়েছিল! টের পেয়েছিল পুশিদি দাঁত দিয়ে চাপ বাড়াচ্ছে ওর ঠোঁটে! আর পুশিদির একটা হাত নেমে যাচ্ছে ওর প্যান্টের চেনের দিকে! কী হচ্ছে এসব! কেমন এমন করছে পুশিদি! সত্যি কি মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে!

পুশিদি প্যান্টের চেনে হাত দিয়ে টান দিয়েছিল। আর সেই টানে আদিতের ভেতরে কী যেন একটা ছিঁড়ে গিয়েছিল শব্দ করে! ও প্রাণপণে পুশিদিকে ঠেলে সরিয়ে বেরিয়ে এসেছিল ঘর থেকে। তারপর আর দাঁড়ায়নি! দূরের একটা ঘরে যেন আবছাভাবে ও রাজুদাকে দেখেছিল। কিন্তু সেইদিকেও তাকায়নি! সোজা বেরিয়ে এসেছিল বাইরে! রাস্তায় এসে থরথর করে কাঁপছিল ও! ঠোঁটে তখনও যেন লেগেছিল পুশিদির জিভের স্বাদ! খেয়েস সোঁদা গন্ধ! কেমন যেন গুলিয়ে উঠেছিল আদিতের শরীর। তারপর আচমকা রাস্তার পাশে উবু হয়ে বসে বমি করে দিয়েছিল ও!

এটা কী হল! আবার বমি এসেছিল। ও মাথা ধরে বসেছিল চুপ করে। তখনই একটা হাত এসে কাঁধটা ধরেছিল ওর। ও তাকিয়ে দেখেছিল সেই লম্বা, ফর্সা লোকটা! ওর দিকে একটা জলের বোতল বাড়িয়ে দিয়েছে!

সেদিনের পরে আর কয়েকদিন রাজুদার কাছে যায়নি আদিত। মুখে না বলেও ও বুঝিয়ে দিয়েছিল ও কী বলতে চাইছে!

এর মধ্যে ও রাবার ফ্যাক্টরিতে গিয়ে ঘেরাওয়ের প্ল্যান করেও এসেছিল। সবাইকে বুঝিয়েছিল, ফ্যাক্টরির ফাইন্যান্স ডিরেক্টর যেদিন আসবে সেদিন ঘেরাও করলে ওদের মনোভাব মালিকপক্ষকে ভাল করে বোঝাতে পারবে! তা হয়েওছিল ঘেরাও। সারারাত ফ্যাক্টরি ঘিরেছিল শ্রমিকরা। সকালে পুলিশ এসে সরায় ওদের। তবে ফাইন্যান্স ডিরেক্টর আলোচনায় বসতে বাধ্য হয়েছিল ওদের সঙ্গে। মূলত আদিতই কথা বলে নিউ ইয়ারের আগেই সব টাকা মিটিয়ে দেওয়া হবে এর প্রতিশ্রুতি আদায় করে নিয়েছিল। কিন্তু গোলমালটা বেঁধেছিল তারপরেই! রাজুদা নিজে ফোন করে ডেকে পাঠিয়েছিল ওকে। না বাড়িতে নয়, পার্টি অফিসে!

এই রাজুদাকে কোনওদিন ও দেখেনি! কেমন যেন কিপ্তু, হিংস্র একটা মানুষ! মানুষ নাকি বোধহীন কোনও জন্তু! লেজ আছড়াতে আছড়াতে যেন ঘরের মধ্যে পায়চারি করছিল কোনও নরখাদক!

ওকে দেখেই রাজুদা চিৎকার করতে শুরু করেছিল, 'শুয়োরের বাচ্চা কে তোকে ঘেরাও করতে বলেছিল! বাদলদার বারণও শুনিসনি! কে বলেছে ঘেরাও করতে!'

আদিত ঘাবড়ে গিয়েছিল, 'কী বলছ রাজুদা?'

'বাঞ্চোত, তোর চামড়া ছাড়িয়ে নেব আমি। মালিকপক্ষ ফ্যাক্টরি লক আউট করে দিলে আমি কী জবাব দেব হাই কম্যান্ডকে?'

'কিন্তু গরীব মানুষগুলো!' আদিত বলেছিল, 'রাখালিয়ার ওই রেশন কার্ডগুলোও হল না! তবে কি আমরা মানুষদের মিথ্যে প্রতিশ্রুতি দিয়ে শুধু ভোট আদায় করে তাদের ঠকাতে এসেছি! আমরা কি জোচ্চর!'

'শালা হারামি! তোকে...' রাজুদা এগিয়ে এসে ঠাশ করে একটা চড় মেরেছিল ওকে, 'ওই দিকে যাবি না আর! বুঝেছিস? জানোয়ার! আমার কাজে লাগিস না তো কোনও, আবার বুলি ফুটছে!'

আদিত চোয়াল শক্ত করে তাকিয়েছিল রাজুদার দিকে। বুঝতে পারছিল আসল রাগটা কোন জায়গা থেকে আসছে। ও দৃঢ় গলায় বলেছিল, 'ফ্যাক্টরির ওদের আমি কথা দিয়েছি। আমি কথা দিলে কথা রাখি রাজুদা! পালটি খাই না!'

'আমি পালটি খাই?' রাজুদা চোয়াল শক্ত করেছিল।

উত্তর না দিয়ে পার্টি অফিস থেকে বেরিয়ে আসতে আসতে আদিত দেখেছিল রাজুদার চোখে বরফের মতো ঠান্ডা, নীল দৃষ্টি!

ফোনটা হঠাৎ টিং টিং করে নড়ে উঠল পকেটের মধ্যে! এখন আবার কে! আদিত ফোনটা বের করল। অচেনা নাম্বার! এই সময়ে কে ফোন করল ওকে! ধরবে! দোনোমনো করে ফোনটা ধরল আদিত, 'হ্যালো!'

'আদিত শোন, ভাল করে।' ফোনের ওপাড়ের গলাটা কেমন সতর্ক লাগল, 'মাকুর গুলি লেগেছে! অবস্থা খারাপ! আজ তোর যাওয়ার কথা ছিল সারেঙ্গাবাদে। কিন্তু তোর বদলে গিয়েছিল মাকু। তোকেই মারার প্ল্যান ছিল। কিন্তু ওরা ভুল করে মাকুকে গুলি করেছে! তুই সাবধানে থাকিস।'

'কী? মাকু! কে করেছে!' আদিতের হাত পা ঠান্ডা হয়ে গেল নিমেষে!

'তুই জানিস কে করেছে! নামটা তুই জানিস! সাবধান!' কট করে কেটে গেল কলটা।

সাবধান? আদিত ঠান্ডা পাথরের মতো ফোনটা ধরে বসে রইল একা! মাকুকে গুলি করেছে! ও কি বেঁচে নেই! নাকি বেঁচে আছে! সেটা জিজ্ঞেস করল না তো! আর কে করল এটা! মানে ও যা ভাবছে সেই করিয়েছে! এতটা নেমে গেল লোকটা! ওর বিশ্বাস, আদর্শ সব এভাবে শেষ হল! যাদের বিশ্বাস করল তারা সবাই এভাবে বিশ্বাস ভাঙল ওর!

সামনে দিয়ে যাওয়া খাবারটা দেখে গা গুলিয়ে উঠল আদিতের। কোনও কারণ ছাড়াই স্মাহির মুখটা মনে পড়ে গেল ওর! আর হঠাৎ যেন চিনতে পারল ফোনের ওপারের অজানা গলাটাকে! রাজুদার সেক্রেটারি, বিলু!

## ॥ ১৭ ॥

## নিরমুক্তা

দিল্লিতে ওদের ফ্ল্যাটের পাশে একটা বড় শিরীষ গাছ ছিল। আর ওতে থাকত দুটো পাখি! গাছ চিনত না মুকু, তিজুই চিনিয়েছিল ওকে! আর শুধু গাছই নয়, ফুল, ফল, নক্ষত্র, পাখি সব, সব চিনিয়েছিল ওকে তিজু!

তিজু বলেছিল পাখি দুটোর নাম! মষ্ক প্যারাকিট বা কোয়েকার প্যারট!

প্রথমবার পাখির নাম শুনে ভুরু কুঁচকে তিজুর দিকে তাকিয়েছিল মুকু, 'বাংলা নাম কী?'

তিজু হেসে বলেছিল, 'একজ্যাক্টলি জানি না। তবে একধরণের টিয়া পাখি! পোষ মানে খুব, কথাও বলে। কী করে এমন গাছে এসে বাসা বেঁধেছে কে জানে!'

মুকু লক্ষ্য রাখত ওদের। দেখতে দেখতে মা পাখিটা ডিম পাড়ল একদিন। সেই ডিম ফুটে বাচ্চা হল! পাখি দুটো সেই বাচ্চাগুলোকে খাওয়াত। বাচ্চাগুলোর পাশে বসে থাকত! মুকুর কী ভাল যে লাগত ওদের দেখতে! কিন্তু তারপর হঠাৎই একদিন কী করে যেন বাচ্চা দুটোকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল চিল! জানলার থেকে মুখ দিয়ে শব্দ করে, জল ছুঁড়ে, এমন কী টেবলে রাখা একটা কাচের পেপার ওয়েট ছুঁড়ে পর্যন্ত চিলটাকে তাড়াবার চেষ্টা করেছিল মুকু। কিন্তু পারেনি!

সেদিন দুপুরে ভাল করে ঘুমতে পারেনি মুকু। খেতে পারেনি! কিছুই করতে পারেনি! শুধু যেন চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছিল, ডানা ঝাপটানো একটা পাখি! মৃত্যু!

রাতে তিজু আসার পরে, ওকে সব কথা বলেছিল মুকু। আর বলতে বলতে কেঁদে ফেলেছিল ঝরঝর করে! তিজু এগিয়ে এসে

জড়িয়ে ধরেছিল ওকে। তারপর কানের কাছে মুখ নিয়ে বলেছিল, 'এমন করে কেউ কাঁদে! প্রকৃতির নিজের কিছু নিয়ম আছে! আমরা তার সামনে নিরুপায়! আর এমন সময় তুই যদি এভাবে আপসেট হয়ে যাস তাহলে তোর মধ্যে বড় হচ্ছে যে আমাদের পাখিটা তার কী হবে! মা ভাল না থাকলে সন্তান ভাল থাকবে কী করে?'

তিজু সারাক্ষণ ঘিরে রাখত ওকে! বলত, 'আমার তুই ছাড়া আর কে আছে বল! বাবা ছিল, কিন্তু সেও মারা গেল!'

'মা?' মুকু তাকাত তিজুর দিকে।

তিজু নিচু গলায় আলতো স্বরে বলত, 'মা তো আছে, কিন্তু কেন জানি না মা আমায় পছন্দ করে না! মা দীপনকে ভালবাসে বেশি!'

অভিমান! তিজুর অভিমান ছিল খুব। মুখে বলত না। দেখাত না। রাগ করত না। কিন্তু একবার কিছু নিয়ে অভিমান হলে সেটার থেকে নিজেকে ছিঁড়ে নিয়ে দূরে সরে যেত! এটা বুঝত মুকু। কিন্তু তারপরেও কী করে যে ও অমন একটা কাজ করে ফেলল! কী করে যে ও তিজুকে অমন একটা কথা বলল সেটা ভাবলে আজও অবাক লাগে!

এখনও সেই দিনটার কথা মনে পড়লে শিউরে ওঠে মুকু। তিজু অফিসের কাজে বিদেশে গিয়েছিল। ওকে দেখাশুনো করার জন্য একজন আয়া ছিল বাড়িতে। কিন্তু সেইদিনই সেই আয়ামাসি বাজারে গিয়েছিল কিছু জিনিস কেনার জন্য! আর তার জন্য অপেক্ষা না করে, একা একা বাথরুমে যেতে গিয়ে পিছল মেঝেতে পড়ে গিয়েছিল মুকু! মেঝেতে পড়ে গিয়ে অদ্ভুত একটা ভোঁতা শব্দ শুনেছিল ও।

তারপরের সময়টা কেমন যেন ঘষা কাচের ওপাড়ের স্মৃতি! যেন ভোর রাতের মনে-পড়ি- পড়ি করা দুঃস্বপ্ন! যেন সেই ছোট্টবেলায় শোনা আবছা কোনও রাক্ষসের গল্প!

সেই দিনটার সব কিছু এখনও কেমন যেন আবছা! কখন আয়ামাসি এল! পায়ের কাছে পড়ে থাকা থকথকে রক্ত দেখে কে যেন চিৎকার করে উঠল! অ্যাম্বুলেন্স কখন এল! কখন একের পর এক আলো-ছায়ার করিডোর পেরিয়ে নার্সিংহোমে পৌঁছল মুকু! কখন আরও সব মানুষজনের মাঝ ভিড় করে এল ওকে ঘিরে! আজ আর তা স্পষ্ট মনে নেই ওর! শুধু মনে আছে নীল তোয়েলে জড়ানো একটা নিথর ছোট্ট শরীর! নরম পাখির মতো ঠান্ডা মুঠো করা একটা হাত! আর তিজুর থেমে থাকা, নির্জন একাকী একটা মুখ! আজও সেই দিনটার কথা মনে পড়লে ও যেন দেখতে পায় বিশাল ডানার এক চিল এসে ডানা ঝাপটাচ্ছে ওর সামনে! আকাশ জুড়ে, জীবন জুড়ে নৃসংশ চিল ডানা ঝাপটাচ্ছে! ডানা ঝাপটিয়েই যাচ্ছে!

কাউকে হারালে কেমন লাগে জীবনে এই প্রথমবার বুঝেছিল মুকু! আর জীবনে যেন প্রথমবার তিজুর আরেকটা দিকও দেখতে পেয়েছিল!

তিজু কেমন যেন একা হয়ে গিয়েছিল সেই ঘটনার পর থেকে! বাড়িতে থাকলে স্টাডিতে বসে থাকত একা! ছুটির দিনগুলোয় বেরিয়ে যেত ওকে কিছু না বলে! দীপন, ওর স্ত্রী এবং আরও নানান লোকজন আসত প্রথম প্রথম! সান্ত্বনা দিত! কিন্তু সেসব কেটে যাওয়ার পরেও তিজু কেমন যেন একা হয়ে গিয়েছিল!

মুকুর ভেতরটা ভেঙে গিয়েছিল একদম! মাঝে মাঝে ও ঝগড়া করত। তিজুকে ধরে ঝাঁকাত! এমন কী একদিন তো একটা কাঠের মূর্তি পর্যন্ত ছুঁড়ে মেরেছিল ওর দিকে! বলেছিল, 'স্বার্থপর! তুই এত স্বার্থপর! নিজেরটা নিয়েই আছিস! তুই মানুষ!'

তিজু কিছু বলেনি! তাকিয়েছিল শুধু! মুকু চিৎকার করে বলেছিল, 'তুই দোষ দিস আমায়? আমায় একা রেখে গিয়েছিলি কেন? কীসের এমন কাজ যে আমার কাছে, নিজের বাচ্চার কাছে থাকতে পারিসনি! এখন ন্যাকামো হচ্ছে! স্বার্থপর! রাক্ষস তুই! নিজেকে ছাড়া আর কিছু বুঝিস না! জানবি তোর হাতে আমার বাচ্চার রক্ত লেগে আছে!'

তিজু শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল ওর দিকে। তারপর কিছু না বলে মাথা নিচু করে বেরিয়ে গিয়েছিল বাড়ি থেকে! একটি প্রাণহীন শিশু কেমন যেন এক সমুদ্র দূরত্ব নিয়ে এসেছিল ওদের মাঝে! তিজু ছোট্ট ডিঙির মতো ঢেউয়ের ধাক্কায় সরে গিয়েছিল দূর থেকে আরও দূরে! মুকুর মনে হয়েছিল আসলে তিজু মনে মনে দায়ী করে ওকে! ও যদি একা একা বাথরুম না যেত তাহলে হয়ত এমনটা ঘটত না – এটাই মনে করে তিজু! তাই হয়ত এমন করে ঘৃণা আর রাগে ও সরে গিয়েছিল! এই চুপ করে যাওয়া, এই অবহেলা আর সহ্য করতে পারছিল না মুকু। তাই একদিন সকালে ও তিজুকে বলেছিল, 'তুই সরে যা আমার জীবন থেকে! দূরে চলে যা। আমি আর থাকতে পারছি না তোর সঙ্গে! আমার মন সরে গিয়েছে!'

'কী তখন থেকে আয়নার সামনে বসে রয়েছিস? মায়ের কথায় মুখ ঘুরিয়ে তাকাল মুকু।

মা আবার বলল, 'রাত এগারোটা বাজে, এখন বেরচ্ছিস! পাগল নাকি তুই? শীতের রাতে কেউ এভাবে একা বেরয়! কে কী বলল আর তুই অমনি চললি?

মুকু উঠে দাঁড়িয়ে নিজেকে দেখে নিল একবার! তারপর মায়ের দিকে ঘুরল। মা আবার চেষ্টা করছে জানার। এভাবে নানান কথার প্যাঁচে জানতে চাইছে কোথায় এত রাতে বেরচ্ছে ও!

মুকু হাসল। তারপর সরাসরি বলল, 'আমি তোমায় বলব না কোথায় যাচ্ছি!

মা ঝংকার দিয়ে উঠল, 'সেদিন কে যে এসে তোর কানে কী মন্তর দিয়ে গেল ঈশ্বরই জানেন। তারপর থেকেই এসব শুরু করেছিস! শোন, আমি তোর মা। মুকু তোর এই ব্যাপারটা আমি জানি। তুই কিন্তু আবার ভুল করতে যাচ্ছিস! নিশ্চয় তুই ও ছেলেটার খোঁজ পেয়েছিস! তাই না! ওর কাছেই কি যাচ্ছিস? এভাবে একটা ভাল ভবিষ্যৎকে আবার দূরে ঠেলছিস! মানুষ এক ভুল কবার করে! ওর বাবা মাকে আমি কী জবাব দেব? মনে নেই ওরা তোর দিকে কেমন করে তাকিয়েছিল সেদিন?

মুকুর মনে পড়ে গেল সেদিনের বিকেলটার কথা। অদ্ভুত দেখতে লোকটা নীল রঙের জ্যাকেট পরে দাঁড়িয়েছিল। মাথার লাল চুলগুলো পাট পাট করে আঁচড়ছিল চিরুনী দিয়ে। আর ওকে দেখে দাঁত বের করে হেসে পায়ে পায়ে এগিয়ে এসেছিল ওর দিকে।

মুকু প্রথমে কী বলবে বুঝতে পারেনি। তারপর অবাক-ভাবটা কাটিয়ে উঠিয়ে জিজ্ঞেস করেছিল, 'কে আপনি! আমায় কি ফলো করছেন?'

লোকটা হেসে চিরুনীটা ঢুকিয়ে রেখেছিল প্যান্টের পেছনের পকেটে। তারপর চিবোতে থাকা পানটা গালের এক পাশে জিভ দিয়ে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে বলেছিল, 'আমার নাম জগন ম্যাডাম। ছোট্ট দুয়েকটা সেনচেন্স আপনাকে বলতে এসেছি!

'কে আপনি! কী দরকার আমার সঙ্গে?' মুকু চোয়াল শক্ত লোকটার দিকে তাকিয়েছিল।

জগন বলেছিল, 'আমি ম্যাডাম রিচিয়ার্ড পারসন। মাঝে মাঝে লোকজনের হেল্প করি একটু। আমি জানি আপনি ঋত্বিজদাকে খুঁজতে এসেছেন! আমি শুধু একটা কথা জানতে এসেছি!'

'আপনি জানেন?' চমকে গিয়েছিল মুকু, 'কী করে জানলেন!

'সেটা ইমপরট্যান্ট নয়। আমি জাস্ট একটা কথা জানতে এসেছি!'

'কী কথা?' মুকু বুঝতে পারছিল না ও রাগ করবে, না বিরক্ত হবে, নাকি ভয় পাবে!

'আপনি কি তিজু স্যারকে এখনও ভালবাসেন?'

'হোয়াট!' আচমকা মাথা গরম হয়ে গিয়েছিল মুকু। ভদ্রতার ধার আর ধারেনি এবার। রাগের গলায় বলেছিল, 'কে তুমি? এসব কী প্রশ্ন! হাউ ডেয়ার ইউ আর!

জগন হেসেছিল। তারপর বলেছিল, 'আয়াম আ ডেয়ারিং গাই ম্যাডাম! কিন্তু আমি দাদার দিকটা জানি! কিন্তু আপনার দিকের গল্পটা কী? প্রিতমবাবুর চান্স কি দাদার চেয়ে বেশি! নাকি আপনি এখনও দাদাকে...'

মুকু থমকে গিয়েছিল। কী বলছে কী লোকটা। এসব জানল কী করে! আর তিজুর দিকটা ও জানে মানে! মানে তিজু কি এখনও...

ও জিজ্ঞেস করেছিল, 'কোথায় তিজু? সবার থেকে এভাবে লুকিয়ে থাকার কোনও মানে নেই! জানলে বলো কোথায় ও!'

'আপনার কথার উত্তর আমি দেব যদি জানি আপনার মনেও একই জিনিস থাকে দাদার জন্য। নাহলে, আমি আবার হাওয়ায় মিলিয়ে যাব! তো বলুন ম্যাডাম, আপনি কি এখনও তিজুদাদাকে...' কথাটা অসমাপ্ত রেখে ওর দিকে তাকিয়ে আবার দাঁত বের করে হেসেছিল জগন।

মুকু দাঁত চেপে বলেছিল, 'আমার পারসোনাল কথা তোমায় বলব কেন?'

জগন বলেছিল, 'ঠিক কথা ম্যাডাম। আয়াম সরি! তবে, সামনে যার বিয়ে সে কেন আমার মতো উটকো একটা লোকের ফোন পেয়ে, সব ডিসকাশন ছেড়ে নেমে এসে এত কথা বলবে? শুধু আপনাকে বলি, দাদার ওয়ালেটে এখনও কিন্তু আপনার ছবি আছে!'

মুকু বলেছিল, 'কোথায় আছে ও? ওর বাড়ির লোকজন খুব চিন্তিত। তুমি জানলে বলো কোথায় আছে ও! আর এভাবে চলেই বা এসেছে কেন? কী কারণ?'

জগন হেসেছিল, 'অন্যদের কথা বাদ দিন, আপনি কি চিন্তিত? থিঙ্ক ম্যাডাম! থিঙ্ক! আর কারণটা নাহয় সামনে গিয়ে দাদার থেকেই জেনে নেবেন! বাই ফর নাউ!' তারপর আর কিছু না বলে দ্রুত রাস্তা পেরিয়ে চলে গিয়েছিল!

মুকু অবাক হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কে লোকটা? কীভাবে সব কিছু জানে! আর তিজু এখনও ওর ছবি নিয়ে ঘুরে বেড়ায়! এখনও! তাহলে কেন ও যখন চলে যেতে বলেছিল তিজু খুব জোর করে আটকায়নি!

পাশের বড় রেস্টুরেন্টের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়েছিল মুকু। ওই রেস্টুরেন্টে বসে আছে ওর ভবিষ্যতের মানুষজন আর ওর সামনে দিয়ে ফুটপাথ টপকে চলে গেল যে লোকটা সে ওর অতীতকে টেনে আনল সামনে! অতীত? নাকি আজও ভীষণভাবে বর্তমান! মনের ভেতর কেমন যেন একটা নরম প্রজাপতির মতো আনন্দ উড়ছিল ওর! কোথাও কোন একা পার্সে রাখা ছোট্ট একটা ছবি এখনও এভাবে ওকে আনন্দ দিতে পারে দেখে নিজেরই অবাক লাগছিল!

মুকু রেস্টুরেন্টে ফিরে গিয়ে গম্ভীর গলায় বলেছিল, 'আমার শরীরটা ভাল নেই! এই আলোচনাটা পরে করলে হয় না?'

প্রিতমের বাবা মা প্রচন্ড অবাক হয়ে তাকিয়েছিল ওর দিকে!

মা আবার বলল, 'এভাবে নিজের জীবনটা নষ্ট করিস না মুকু। আবার সেই জানোয়ারটার পাল্লায় পড়িস না! মনে নেই কী করে ও তোর বাচ্চাটা নষ্ট করে দিয়েছিল?'

'কী? মায়ের এই শেষের কথাটায় ঘুরে তাকাল মুকু, 'এত নোংরা কথা তুমি বলতে পারলে! এই জন্য তুমি এখানে এসেছ! আর ওই ঘটনাটা যখন ঘটেছিল ও ইউরোপে গিয়েছিল কাজে। আর তুমি এভাবে বললে! আমার সবচেয়ে কষ্টের জায়গাটাকে আজ ব্যবহার করতে চাইলে আমার মনে বিষ তৈরির জন্য! ছিঃ মা!'

মা উঠে বসল আরও কিছু বলার জন্য কিন্তু তখনই মুকুর মোবাইলটা বাজল। মুকু সময় নষ্ট না করে ধরল মোবাইলটা, 'হ্যাঁ বলো!'

'কুড়ি মিনিটের মধ্যে দেশপ্রিয় পার্কের মোড়ে যে দুটো পানের দোকান আছে সেটার পাশের পেট্রোল পাম্পের সামনে আসুন। কুড়ি মিনিট। তার বেশি হলে কিন্তু হবে না। কেমন!'

মোবাইলটা কেটে কোটের পকেটে ঢুকিয়ে আয়নায় নিজের দিকে তাকাল মুকু।

মা এবার নেমে এসে দাঁড়াল ওর সামনে, 'আমার ভুল হয়েছে মুকু। রাগ করিস না। কিন্তু এভাবে নিজের ভবিষ্যৎটা নষ্ট করিস না। মুকু, প্রিতমের কথা ভাব... একবার ভাব!'

মুকু আর কথা না বাড়িয়ে বেরিয়ে এল হোটেলের ঘর থেকে। মা আর ও আলাদা মানুষ! মা বুঝবে না আসলে ওর মনে কে আছে!

রিসেপশানে গাড়ি বলাই আছে। লিফটটাও পেয়ে গেল ও দ্রুত!

লিফটে উঠে, গ্রাউন্ড ফ্লোরের বোতাম টিপে ভাবল, জগন লোকটা নির্ভরযোগ্য তো? সেদিনের ওই কটা কথা আর আজকের ঘন্টাখানেক আগের একটা দু মিনিটের ফোন কল, তাতে ওকে বিশ্বাস করে এভাবে যাওয়া কি ঠিক হচ্ছে!

ঘন্টাখানেক আগে কলটা পেয়ে তো খুব ঘাবড়ে গিয়েছিল মুকু।

জগন বলেছিল, 'দেখ করবেন দাদার সঙ্গে? করতে চাইলে রেডি হয়ে থাকুন। আমি আবার ফোন করব কিছুক্ষণ পরে। দাদা জানেন না। জানলে উনি আসবেন না। কিন্তু আপনি যদি চান তাহলে দেখা করতে পারেন। দেখা করবেন?'

মুকু জিজ্ঞেস করেছিল, 'আমার ছবি এখনও ওর ওয়ালেটে আছে, তুমি শিওর?'

জগন হেসেছিল সামান্য শব্দ করে। তারপর বলেছিল, 'আমি আবার ফোন করছি। রেডি হয়ে থাকুন!'

আজ খুব কুয়াশা! ডিসেম্বরের বাইশ তারিখ হয়ে গেল। ছুটি শেষ হয়ে এসেছে প্রায়! আজ যদি না দেখা হয় তবে কী হবে! দীপনকে কী বলবে ও! আর শুধু কি দীপন! ওর নিজের কি কিছু নেই এর মধ্যে! মুকু চোখ বন্ধ করল। দেখল বহু আগের এক রোদ ঝলমলে সকাল। কুতুব মিনারের সামনে দাঁড়িয়ে ওর দিকে তাকিয়ে আছে তিজু! বলছে, 'বাকি দিনগুলো আমায় তোর সঙ্গে থাকতে দিবি মুকু? আমায় বিয়ে করবি?'

কুয়াশা কুয়াশা কলকাতা! তার মধ্যে দিয়ে ডুবে ডেসে গাড়িটা গিয়ে দাঁড়াল দেশপ্রিয় পার্ক মোড়ে! গাড়ি থেকে নেমে ঘড়ি দেখল মুকু! সোয়া এগারোটা বাজে। চারিদিকে যেন মেঘ নেমে এসেছে মাটিতে। তার মধ্যে ও হাল্কা পায়ে রাস্তা পেরিয়ে গিয়ে দাঁড়াল অন্যদিকের সেই পেট্রোল পাম্পের সামনে!

'এসেছেন!'

মুকু চমকে তাকাল পেছনে। কুয়াশার ওড়না সরিয়ে বেরিয়ে এল জগন। মুখে হাসি। পান চিবচ্ছে! জগন বলল, 'ছবিটায় আপনার পেছন দিকে, কিছুটা দূরে কুতুবমিনার দেখ যাচ্ছে, জানেন! দাদা এখনও খুব ভালবাসেন আপনাকে'

আর মুকুর বুকটা কেমন করে উঠল যেন। যেন আচমকা লক্ষ বছর পেরিয়ে ওর কাছে ভেসে এল সেই আফটার শেভের গন্ধ! যেন বুঝতে পারল এ তুচ্ছ জীবনে আসলে ও কে! আসলে ও কার! বুঝতে পারল, এতদিন নিজেকেই বোকা বানিয়ে আসছিল। একটা মিথ্যেকে ও জেদের বশে, অহঙ্কের বশে সত্যি বলে বিক্রি করছিল নিজের কাছে! আজ এই কুয়াশা মোড়া শহরের মধ্যে দাঁড়িয়ে যেন বুঝতে পারল আসলে ও কোনওদিন তিজুর থেকে দূরে যায়নি। যেতে পারেনি। তাই দীপন ওকে তিজুকে খুঁজতে বলাতেই চলে এসেছে এখানে! নিজের সঙ্গে লুকোচুরি খেলা অনেক হল। এবার সত্যিটা মেনে নেওয়ার পালা! মনের মধ্যে যে কষ্টের ভার নিয়ে ও ঘুরে বেড়াচ্ছে সেটাকে ফেলে দিয়ে নতুন করে বেঁচে ওঠার পালা!

'আপনি রেডি তো?' জগন আবছা গলায় জিজ্ঞেস করল।

মুকু উত্তর দিতে গিয়ে থমকাল। হাতে ধরা ফোনটা বাজছে। ও দেখল ক্রিনটা। প্রিতম! এখন! এসময় তো ও কল করে না কখনও! নির্ঘাত মা বলেছে আজকের কথা! ও চোয়াল শক্ত করল। তাকাল জগনের দিকে। দেখল জগন ভুরু তুলে তাকিয়ে রয়েছে ওর দিকে।

মুকু নিজেকে সামলাল। কলটা কেটে, একদম অফ করে দিল মোবাইলটা। তারপর তাকাল কুয়াশায় আবছা হয়ে আসা জগনের দিকে। আজ সব কিছু পরিষ্কার লাগছে ওর!

মুকু বলল, 'আমি রেডি!'

## ॥ ১৮ ॥
## স্মাহি

ট্রেনের কামরার ভেতরের আলোটা কেমন যেন ঘোলাটে। বেশ

ঠান্ডা পড়েছে আজ। জানলার শাটার সব নামানো রয়েছে। তবু বাইরের ঘন কুয়াশা দরজা দিয়ে ঢুকে এসেছে কামরার ভেতরে। যেন কেউ চুনের জল স্প্রে করে দিয়েছে চারিদিকে! স্মাহি সোয়েটারের হাত দুটো টেনে হাতের পাতা ঢুকিয়ে নিয়েছে ভেতরে। মাফলারটা ভাল করে জড়িয়ে নিয়েছে কানে। ঠান্ডা লাগলে আর রক্ষে নেই!

'তুই ছেড়ে দিলি কাজটা? পাশের থেকে সীমা বিস্ময়ভরা গলায় জিজ্ঞেস করল ওকে।

স্মাহি মনে মনে গুনল, এই নিয়ে এগারোবার একই কথা জিজ্ঞেস করল সীমাদি। ও কিছু না বলে হাসল।

সীমাদি বলল, 'ভাল করে ভেবে করলি তো কাজটা! এখন কী করবি?'

স্মাহি বলল, 'আবার পড়াশুনো শুরু করব। সরকারি চাকরির পরীক্ষা দেব। আর এই ফ্যাক্টরির যা অবস্থা তাতে...'

'তা ঠিক,' সীমাদি বলল, 'গত পরশু শুনেছিস তো কী হয়েছে?'

স্মাহি তাকাল।

সীমাদি বলল, 'ফ্যাক্টরির ঝামেলায় কে যেন গুলি খেয়েছে!'

'কী! ছিটকে উঠল স্মাহি। ওর সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে গেল বলাইয়ের কথাটা! তবে কী রিতাদি বলেনি ওকে! কিন্তু ও তো রিতাদিকে সেদিনই বলেছিল।

বাড়িতে ফিরে সেদিন আর নিজের ঘরে ঢোকেনি স্মাহি। রিতাদের কাছে গিয়েছিল সরাসরি। তারপর বলেছিল, 'রিতাদি ওই যে মকরন্দ বলে ছেলেটা আসে না তোমাদের কাছে, ওকে বলবে যে ওর বন্ধুর সামনে খুব বিপদ! বলবে ও যেন সাবধানে থাকে। প্লিজ রিতাদি বলবে?'

রিতাদি অবাক হয়ে তাকিয়েছিল ওর দিকে, 'মানে? কী বলছিস?'

'বলছি ওই মকরন্দকে ফোন করে বলো ওর বন্ধু আদিবের সামনে খুব বিপদ! আদিব যেন কয়েকদিন বাড়ি থেকে না বেরয়! প্লিজ এটা বলো। কিন্তু আমার নাম বলবে না। বুঝলে? আমার নাম কিছুতেই বলবে না।'

রিতাদি কিছুক্ষণ তাকিয়েছিল ওর দিকে। তারপর বলেছিল, 'তুই চিনিস?'

'প্লিজ রিতাদি ফোনে বল। আর আমার কথা বলবে না। প্লিজ। কথা দাও!'

রিতাদি ওর মাথায় হাত বুলিয়ে বলেছিল, 'এমন করছিস কেন? আমি বলছি। কিন্তু নিজেকে লুকিয়ে রাখছিস কেন তুই স্মাহি? এই আদিব বলে ছেলেটা কে হয় তোর?'

কে হয় ওর! আদিব কে হয় ওর! এই একটা প্রশ্ন ওর মনেও তো সারাক্ষণ ঘুরে বেড়ায়! বুকের ভেতরের দেওয়ালে ধাক্কা মেয়ে মেয়ে তোলপাড় করে ওকে! ও বোঝে মানুষ সব সময় সব প্রশ্নের নিশ্চিত উত্তর চায় না! সে শুধু চায় প্রশ্নগুলো তাকে সারাজীবন জ্বালতো করে ঠুকরে যাক! তাকে একটা অনিশ্চিত জায়গায় ঠেলে দিক! স্মাহির বিশ্বাস, মানুষের মনের একটা কোণা আছে যে কীনা নিশ্চিন্ত হতে ভালবাসে না। দ্বিধাতেই তার আনন্দ!

স্মাহি উত্তর দেয়নি রিতাদির কথায়। মাথা নামিয়ে নিয়েছিল।

রিতাদি বলেছিল, 'এভাবে লুকিয়ে থেকে কী লাভ? তাকে এই কথাটা তুই নিজেই বল না!'

স্মাহির জল এসে গিয়েছিল চোখে। কী করে ও বলবে তাকে? কী করে তার সামনে গিয়ে দাঁড়াবে? একদিন নিজেই তো ওকে তাড়িয়ে দিয়েছিল! আজ কী করে তার সামনে দাঁড়াবে! কী করে বলবে, ধীরে ধীরে ঝিনুকের মধ্যে যেভাবে মুক্তো জন্মে ওঠে সেভাবে ওর মনেও মায়া জন্মেছে আদিবের জন্য! এখন স্মাহি বোঝে, সব মুক্তোর কথা এই জীবনে আর বলা হয় না মানুষের! ও শুধু রিতাদির হাত ধরে বলেছিল, 'প্লিজ!'

স্মাহি সীমাদির দিকে আলতো করে ঘুরে আবার জিজ্ঞেস করল, 'কী নাম বললে না তো! আদিত?'

'না না, আদিত নয়? সীমাদি মাথা নাড়াল, 'অন্য নাম। পিকিউলিয়ার টাইপ।'

'শিওর?' স্মাহি উগ্রিগ্ন হয়ে তাকাল সীমাদির দিকে।

'হ্যাঁ রে বাবা! তুই এসব বাদ দে! শোন ভাল করে পড়াশুনো করবি। কিন্তু থাকবি কোথায়? খরচ চালাতে অসুবিধে হবে না?'

স্মাহি হাসল। যাক আদিত নয়! ও মাথা নেড়ে না বলল শুধু। আসলে সব কথা সীমাদিকে বলা যাবে না। উপায় নেই!

সীমাদি বলল, 'ঠিক আছে, আমি মাঝেরহাটে নেমে গেলাম। আজ কত রাত হয়ে গেল! প্রাইভেট কোম্পানির চাকরি আর করিস না! যাচ্ছেতাই! আর শোন, মাঝে মাঝে ফোন করিস। রাত পৌণে এগারোটা বাজে। সব কুয়াশায় ঝাপসা হয়ে গিয়েছে। সাবধানে যাস। ভাল থাকিস রে।'

সীমাদি নেমে গেলে ট্রেনটা যেন আরও নির্জন হয়ে গেল। মাফলারটা শক্ত করে বেঁধে ও গুটিয়ে বসল আরও। ডিসেম্বরের আজ বাইশ তারিখ। পরশু দিন ও চলে যাবে। জেঠু আসবে নিতে!

জীবনে এমনও হয়! জটাদাদু একবার বলেছিল, 'জানিস জীবন এমন একটা খেলা যেখানে সব শেষ না হলে কিছুই শেষ হয় না। তুই এমন মুখ করে থাকিস কেন? কষ্ট পাস কেন? জানবি জীবন তোকে পরীক্ষা করছে! সাজাচ্ছে তোকে। বর্ম নিয়ে তো আমাদের জন্ম হয় না! কিন্তু জীবন নিজেই বর্ম তৈরী করে দেয় আমাদের মনে! মন বুঝলি! মনটাই আসল। শরীর তো মাটি আর ছাই! তাই মনটা শক্ত রাখ। জানবি যে সয়, সে রয়!

এখনও আসলে বিশ্বাস হচ্ছে না স্মাহির। সত্যি কি জেঠু এসেছিল! ওর কোনও মনের ভুল নয়তো! গত পরশু একাই ঘরে বসেছিল ও। তখনই বাইরের দরজায় একটা শব্দ হয়েছিল। আর তারপর ওর নাম ধরে ডেকেছিল কেউ! কার গলা এটা! আচমকা বিদ্যুৎ খেলে গিয়েছিল স্মাহির গায়ে! কে ডাকছে ওর নাম ধরে! মনে হয়েছিল গত জন্মের থেকে কেউ যেন ফিরে এসেছে আবার! সত্যি এসেছে! ও উঠে দ্রুত বেরিয়ে এসেছিল বাইরে! আর দেখেছিল মানুষটাকে!

সামান্য কুঁজো হয়ে গিয়েছে জেঠু। মাথার চুলে আরও আরও তুষারপাত হয়েছে যেন। জামা কাপড়ও কেমন যেন ইস্তিরিহীন! দেখে এত কষ্ট হয়েছিল স্মাহির যে ও পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে পড়েছিল বারান্দায়। জেঠু মুখ তুলে তাকিয়েছিল ওর দিকে। থমকে গিয়েছিল কয়েক মুহূর্ত। তারপর পায়ে পায়ে এগিয়ে এসেছিল ওর সামনে। সিঁড়ি ভেঙে এক ফালি বারান্দায় উঠে তাকিয়েছিল ওর দিকে। তারপর হাত জড়ো করে কাঁপা গলায় বলেছিল, 'মারে, আমায় ক্ষমা করে দিবি?'

বাবা মা মারা যাওয়ার পরে এই হাত দুটো আগুলে রেখেছিল ওকে। সেই হাত দুটো ওর সামনে এখন জড়ো হয়ে আছে! ও কী করবে বুঝতে পারছিল না! যেদিন ওকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল সেদিন জেঠু কিছু বলেনি! সেই কষ্টটা মনে পড়ছিল ওর! কিন্তু সেই কষ্ট ছাপিয়ে ওর মনে আসছিল গোটা একটা বড় হয়ে ওঠা! জেঠু ওর জন্য যা করেছে সেটা কী করে ভুলে যাবে ও! জেঠুর নুয়ে পড়া শরীরটা দেখে আচমকা স্মাহির মনে হয়েছিল, ও এখন বড় হয়ে গিয়েছে! আর জেঠু যেন অনাথ কোনও শিশু! অমন একটা ঘটনার পরে যা মানুষ নিজে এসে দাঁড়ায় সামনে তার জন্য কোনও খারাপলাগা পুষে রাখতে নেই মনে!

জেঠু হাতজোড় করে দাঁড়িয়েছিল সামনে। কেমন থরথর করে কাঁপছিল। স্মাহি দেখে বুঝেছিল মানুষটার মধ্যে ভাঙচুর হয়ে গিয়েছে অনেক! ও আর থাকতে পারেনি! এগিয়ে গিয়ে জড়িয়ে ধরেছিল জেঠুকে। আর বুঝেছিল খুব রোগা আর দুর্বল হয়ে গিয়েছে জেঠু!

জেঠুও ওকে জড়িয়ে ধরে কাঁদছিল! বাড়িতে কেউ ছিল না আর। শুধু ওই গরীব ইট ওঠা বাড়িই যেন দেখেছিল বহুদিন পরে বাবা আর মেয়ের এই অশ্রুস্নান! বাবা! হ্যাঁ বাবাই তো! জেঠু যা করেছে তাতে বাবার চেয়ে কম কীসে!

জেঠুকে নিজের ঘরে নিয়ে গিয়ে বসিয়েছিল স্মাহি। জেঠু মাথা ঘুরিয়ে দেখেছিল ঘরের চারদিক! তারপর অস্ফুটে বলেছিল, 'রাজকণ্যা

তোকে আমি এ কোথায় পাঠিয়েছিলাম! জানিস আমি দুর্বল তাই তোকে এত কষ্ট পেতে হল। আমার স্ত্রীকে কিছু বলতে পারিনি। ছেলেকে কিছু বলতে পারিনি! ভাল, মুখচোরা হয়ে থাকা মানুষদের দমিয়ে রেখে সবাই তার সুবিধে নেয়! আমায় ক্ষমা করে দিস মা! আমি তোর জন্য কিছু করতে পারিনি!

কী বলবে বুঝতে পারছিল না স্মাহি। জেঠুর হাত ধরে মাথা নিচু করে বসেছিল ও।

জেঠু বলেছিল, 'তোকে রক্ষা করতে পারিনি আমি। না ওই দীপকের থেকে, না আমাদের বাড়ির লোকেদের থেকে!'

'থাক জেঠু, আর না। প্লিজ আর বোলো না! আমারও ভুল হয়েছিল! খুব ভুলে হয়েছিল! জীবন সব শোধ করে দেয়!' স্মাহি চোখ মুছে বলেছিল।

'দীপক যে অমন শয়তান আমি বুঝতে পারিনি রে! আমি...' জেঠুর গলা ধরে গিয়েছিল।

আর পুরোনো সব স্মৃতি যেন বিশাল জলপ্রপাতের মতো আবার আছড়ে পড়েছিল ওর সামনে। মনে পড়ে গিয়েছিল সেই সেই সকালটা যেদিন ও জানতে পেরেছিল যে ছোট্ট একটা প্রাণ এসে গিয়েছে ওর শরীরে!

কিছুদিন থেকেই নানান লক্ষণ দেখে ওর সন্দেহ হয়েছিল। তাই একটা প্রেগন্যান্সি টেস্ট কিট কিনে এনেছিল ও। আর সেই সকালে সবার চোখের আড়ালে তাতে পরীক্ষা করেছিল! দুটো লাল দাগ! স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল স্মাহি! এটা কী হল! এটা কী করে হল! সাধারণত তো ওরা কন্ডোম ব্যবহার করত।শুধু একদিন অসাবধানতাবশত করেনি। তাতেই কি এমনটা হল!

কী করবে ও! কাকে বলবে! ও দীপককে ফোন করেছিল উপায় না দেখে! দীপক যখন তখন ওকে ফোন করতে বারণ করত। ওর স্ত্রী নাকি সন্দেহ করবে। কিন্তু সেদিন উপায় ছিল না।

ফোনটা ধরে সবটা শুনেছিল দীপক। তারপর বলেছিল, 'কোনও ভয় নেই। কাল আমি তোমায় ফোন করব। একটা জায়গায় নিয়ে যাব। তারা অ্যাবর্ট করে দেবে। দেখো! কিছু ভেব না!'

'অ্যাবরশান!' আচমকা গলা শুকিয়ে এসেছিল স্মাহির!

দীপক হেসেছিল সামান্য। বলেছিল, 'তুমি তো জানতেই আমার জীবন। এছাড়া তো উপায় নেই! আমরা তো আর বিয়ে করতে পারব না! কাল আমি ফোন করব! জানি আমি যা বলছি সেটা খারাপ শোনাচ্ছে! কিন্তু বাস্তবটা বুঝতে হবে স্মাহি! কাল কথা হবে!'

কিন্তু পরেরদিন কথা হয়নি! তারপরের দিনও কথা হয়নি! তার পরের পাঁচদিনও কথা হয়নি কোনও! দীপকের ফোন অদ্ভুত ভাবে ঘুমিয়ে পড়েছিল! কিছুতেই যোগাযোগ করা যায়নি ওর সঙ্গে!

আর উপায় না দেখে তারপরের দিন ওর বাড়ি যেখানে, সেই জায়গায় গিয়েছিল স্মাহি। কিন্তু সেখানে কাউকে পায়নি! শুনেছিল এখানে ওই নামে নাকি কেউ থাকেই না! ভয়ে, কষ্টে সেদিন থরথর করে কাঁপছিল স্মাহি। ভেবেছিল তবে কি চলন্ত ট্রেনের সামনে ঝাঁপ দেবে!

না, ঝাঁপ দেয়নি স্মাহি! বাড়িতে ফিরে, মন শক্ত করে, জেঠিমাকে সব খুলে বলেছিল! ও ভেবেছিল জেঠিমা যতই কড়া হোক না কেন, এমন অবস্থায় হয়ত বকবে, কিন্তু একটা উপায় ঠিক বের করবেই!

জেঠিমা ওর কথা শেষের আগেই আচমকা পায়ের থেকে চটি খুলে এলোপাথারি মারতে শুরু করেছিল ওকে। মাথা ধরে ঠুকে দিয়েছিল মেঝেতে! লাথি মেরেছিল কোমরে। তারপর চুল ধরে টানতে টানতে একটা ঘরে ঢুকিয়ে দিয়ে বন্ধ করে দিয়েছিল দরজা! আচমকা এমন করে মার আর অপমান এসে ওকে ঝাঁঝরা করে দেওয়ায় সবকিছু কেমন যেন তালগোল পাকিয়ে গিয়েছিল স্মাহির!

তারপরের কয়েকটা দিন কেমন একটা ঘোরের মধ্যে কেটেছিল সব!

দাদা আর জেঠিমা ওকে নিয়ে গিয়েছিল একটা জায়গায়! সেই আধো অন্ধকার একটা ঘর! সবুজ টানা পরদা! রঙচটা লোহার বিছানা! নোনা ধরা দেওয়াল! আর ওপরের থেকে নেমে আসা একটা বড় আলো!

ওর শরীরে উপুড় হয়ে যখন সবে মাত্র জমাটি বাঁধতে থাকা সন্তানকে উপড়ে ফেলা হচ্ছে ও যেন কোথাও, দূরে কোথাও একটা পাখির শব্দ শুনেছিল! কুব কুব করে কী একটা পাখি যেন ডাকছিল প্রাণপণ! ও সমস্ত মনপ্রাণ একাগ্র করে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছিল ওই হত্যাকাণ্ডের জায়গা থেকে! আর মনে মনে সেই পাখিটাকে অনুসরণ করছিল। কেন পাখিকে অনুসরণ করছিল ও! এই সমস্ত ক্লেদ থেকে কি উড়ে বহুদূরে কোথাও চলে যেতে চাইছিল ও! এই পৃথিবীতে কি সত্যি ক্লেদ থেকে মুক্তি পাওয়া যায়!

পরের কয়েকটা দিন কেমন একটা আবছায়ার মধ্যে কেটেছিল ওর! খালি মনে হচ্ছিল যদি ওই ছোট্ট প্রাণটা বেঁচে যেত তাহলে কী হত! কেমন দেখতে লাগত তাকে! মনে হয়েছিল এখন কোন আবর্জনায়? কোন অন্ধকার জায়গায় পড়ে আছে সে! হাত বাড়িয়ে কি সে ডাকছে তার মাকে!

এই ঘটনার মাঝে কি একবার এসেছিল আদিত! না মনে করতে পারছে না! আদিতকে তো ও আগেই তাড়িয়ে দিয়েছিল জীবন থেকে! শুধু মনে আছে এক রাতে দরজা খুলে গিয়েছিল ওর ঘরের। দাদা আর জেঠিমা ওকে বলেছিল, 'তোকে এবার চলে যেতে হবে এখান থেকে। আর এই বাড়িতে তোর জায়গা নেই!'

না আর কাকুতি মিনতি করেনি স্মাহি। কয়েকদিন সময় চেয়ে নিয়েছিল শুধু! তারপর চলে এসেছিল সেই বাড়ি থেকে। আসার সময় শুধু একবার তাকিয়েছিল পেছনে ফিরে। দেখেছিল সেই বারান্দা শূন্য! জেঠু নেই! শুধু মৃতদেহের মতো পড়ে আছে এক ফালি রোদ!

সেই জেঠু বসেছিল সামনে! মাথা নিচু করে!

জেঠু এবার মাথা তুলেছিল, 'আমি তোকে নিয়ে যেতে এসেছি। ওই বর্ধমানের বাড়ি বেচে দিয়েছি আমি। ভাল দাম পাইনি। পার্টির লোকেরা জবরদস্তি করে নিয়েছে বাড়িটা! তোর জেঠিমাও আর নেই! তোর দাদা দুবাইতে গিয়ে সব সম্পর্ক চুকিয়ে দিয়েছে আমার সঙ্গে। আমি আর তোর বোন আছি। আমার দীর্ঘ দিনের ইচ্ছে ছিল তোকে কাছে এনে রাখার। কিন্তু সাহস হয়নি রে মা! এবার তোর বোন বলল তোর কাছে আসতে! আমি ভিতু মানুষ! তাই বুঝতে পারছি না কী করে তোকে বলব! কী করে ক্ষমা চাইব!'

স্মাহির আবার জল এসে গিয়েছিল চোখে। ও বলেছিল, 'আমায় কি তুমি নিজের কাছে নিয়ে গিয়ে রাখতে চাও?'

জেঠু তাকিয়েছিল ওর দিকে। তারপর বলেছিল, 'তুই কি... আমি তোকে খুব যত্ন করব দেখিস! আমরা মানে...' জেঠু যেন কথা খুঁজছিল!

দ্রুত সিদ্ধান্ত নিয়েছিল স্মাহি। তারপর বলেছিল, 'আমি চাকরি করি জেঠু। সেটা ছাড়তে হবে যে!'

'ছাড়বি মা?' জেঠু তাকিয়েছিল ওর দিকে! এত দিন পরে এসে আচমকা এমন আবদার করা যে ঠিক নয় সেটা যেন জেঠুও বুঝতে পারছিল।

স্মাহি জিজ্ঞেস করেছিল, 'তুমি হলে ছাড়তে জেঠু?'

জেঠু মাথা নামিয়ে নিয়েছিল। তারপর ধীরে ধীরে মাথা নেড়ে বলেছিল, 'না?'

স্মাহি হেসেছিল। জেঠুর ঠান্ডা হাত দুটো ধরে বলেছিল, 'বাইশ তারিখ আমি ছেড়ে দেব কাজ! আর তারপর ছব্বিশ তারিখ তুমি আর বোন দুজনেই কিন্তু নিতে আসবে আমায়! কেমন?'

লেক গার্ডেন্স স্টেশনে নেমে ঘড়ি দেখল স্মাহি। এগারোটা দশ বাজে! শুনশান ল্যাটফর্ম! শুধু দূরে কয়েকটা কুকুর জটলা করছে। আর সবটাই কেমন একটা কুয়াশার মোড়কে ঢাকা! ও কাঁধের ব্যাগটাকে ভাল করে ধরল। তারপর পা বাড়াল বাড়ির দিকে। পরশু থেকে এইসব কিছু স্মৃতি হয়ে যাবে। জীবনের আরেকটা অধ্যায় শেষ হল আজ!

'এই যে ম্যাডাম!'

আচমকা ডানদিকের একটা আধো অন্ধকার জায়গা থেকে ডাকটা ছিটকে এল! আর ছ্যাঁত করে উঠল স্মাহির বুক। দেখল পাশের থেকে দুটো ছেলে আর ঝানু আবছায়া থেকে বেরিয়ে কুয়াশা কেটে এগিয়ে আসছে ওর দিকে! জানোয়ারটা ফিরে এসেছে!

'কী চাই?' ভয় পেয়ে গেলেও সেটা দেখাল না স্মাহি।

'তোকে চাইছে শালী! তোকে আজ এই হাভ্রায় আমার চাই! অনেক জ্বোলী করেছিস! আজ আমার ইঞ্জিন গরম আছে! চল, আমরা তিনজন আর তুই। চারজনে মিলে আজ ছব্বা পুট খেলব!'

কথাটা শেষ করে আচমকা ঝানু এগিয়ে এসে ওর হাত ধরে টান মারতে গেল! স্মাহি সরে গেল দ্রুত। টাল সামলাতে না পেরে পা পিছলে পড়ে গেল ঝানু।

'বাঞ্চোত! রেন্ডি! আজ তুই গেছিস... আজ তোকে...' ঝানু উঠে দাঁড়াতে গেল।

আর সময় দিল না স্মাহি। ও দেখল ওর বাড়ির দিকে যেতে হলে সামনের এই জানোয়ারগুলোকে টপকাতে হবে। কিন্তু সেটা সম্ভব নয়। তারচেয়ে লেকের দিকটা সেফ!

ও কুয়াশার মধ্যে ডুবে গিয়ে দৌড় দিল লেকের রাস্তার দিকে।

চারিদিকে কিছুই দেখা যাচ্ছে না স্পষ্ট! তাও ও এগোল দ্রুত! ওই তো আবছায়া লেভেল ক্রসিং। সেটা টপকে সামনের দিকে দৌড়ল ও! এখানে কেউ নেই! শুধু একটা মনখারাপ করা আলো কুয়াশার ফুটোফাটা দিয়ে ছিটকে আসছে। পেছনে ওই রাক্ষসগুলোর পায়ের শব্দ শুনতে পাচ্ছে স্মাহি। ও আরও জোরে দৌড়োবার চেষ্টা করল।

স্মাহি দেখল বাঁদিকে ব্রিজের রাস্তা নেমে আসছে। এখানে তো পুলিশ থাকে মাঝে মাঝে! কিন্তু আজ নেই! আজ কুয়াশা এসে যেন সব কিছু দখল নিয়ে নিয়েছে! পায়ের শব্দ যেন কাছে চলে এল আরও!

'বাঁচাও... বাঁচাও...' উপায় না দেখে এবার চিৎকার করল স্মাহি।

কোনদিকে যাবে বুঝতে না সামনের দিকেই কুয়াশা ভেদ করে এগোল স্মাহি। আর তখনই ধাক্কাটা লাগল! পড়ে গেল স্মাহি! একটা ছেলে! কুয়াশা আর হলুদ আলোর জল কেটে জেগে উঠল একটা মুখ! স্মাহির দম বন্ধ হয়ে গেল যেন! ও দেখল ওর দিকে তাকিয়ে রয়েছে আদিত!

বহু আগে সেই লম্বা বারান্দায় একবার পড়ে গিয়েছিল স্মাহি। আদিত ছিল পাশেই। ও স্মাহির হাত ধরে তুলেছিল। বলেছিল, "your hand / touching mine. / this is how galaxies collide."

আদিত তুলে দাঁড় করাল স্মাহিকে। আর আজও সহস্র কোটি আলোকবর্ষ দূরে কোন এক ছায়াপথের সঙ্গে ধাক্কা লেগে ছিটকে গেল আরও অন্য কোনও এক ছায়াপথ! মহকাশ জুড়ে ঝাড়ে পড়ল তারাচূর্ণ! নেবুলায় নেবুলায় মাথা তুলল নতুন সৌর মন্ডল! ফুটে উঠল গ্রহ, তারা, ধূমকেতু! আর কোথাও আবারও জন্ম নিল বহু বহু কোটি বছর আগে ধ্বংস হয়ে যাওয়া প্রাণ! জন্ম নিল আরেক নীল সবুজ পৃথিবীর সম্ভাবনা!

স্মাহি তাকিয়ে রইল আদিতের দিকে। আর দেখল আদিত ধীরে ধীরে তুলে ধরল একটা পিস্তল! তারপর এগিয়ে এসে স্মাহিকে বাঁ হাত দিয়ে টেনে নিজের পেছনে, আড়ালে নিয়ে গিয়ে সামনে ঝানুদের দিকে বাড়িয়ে ধরল পিস্তল!

ঝানুরা থমকে গেল কি? নাকি পিছিয়ে পড়ল? পালিয়ে গেল নাতো! নাকি এগিয়ে এল আরও! আচ্ছা এখানে এখন আদিত কী করছে! ওর হাতে পিস্তলই বা কেন! কিন্তু কিছুই যেন বুঝতে পারল না স্মাহি। ও শুধু দেখল অন্য কোনও দূরবর্তী গ্রহে প্রাণ জন্ম নিচ্ছে আবার! জলের মধ্যে ধীরে ধীরে নড়ে উঠছে এই মহাবিশ্বের এক অনন্ত বিস্ময়! এক অশেষ জাদু!

ঝানুরা এসে দাঁড়িয়েছে কাছে। কীসব বলছে যেন! আদিত পিস্তল উঁচিয়ে ঠেকিয়ে রেখেছে ওদের। শব্দ জড়িয়ে যাচ্ছে আরও শব্দে। কিন্তু আসলে কিছুই কানে আসছে না স্মাহির। ও কেমন অবশ হয়ে যাচ্ছে। ওর মনে হচ্ছে সত্যি কি এসব ঘটছে! নাকি সবটাই মিথ্যে! স্বপ্ন!

শহরে রাত্রির হাওয়া পাক খেল। কুয়াশা গাঢ় হয়ে উঠল আরও!

আর স্মাহি দেখল, তার ফাটল দিয়ে ষ্টিট লাইটের এক ফালি হলুদ আলো এসে ছিটকে পড়েছে আদিতের বাঁ হাতের ওপর! থিরথির করে কাঁপছে অদ্ভুত আলোটি! যেন কবেকার সেই হলুদ পালক!

স্মাহি বুকের ভেতর জমিয়ে রাখা সমস্ত ভালবাসা নিয়ে হাত বাড়িয়ে ধরল সেই পালকটি। আর এত বছর পর বুঝল জীবনে এই প্রথমবার কোনও ছায়াপথ ছড়িয়ে পড়ল ওর ভেতরে! বুঝল, এই প্রথমবার কোনও প্রাণ তৈরি হল ওর নিজস্ব গ্রহে!

## ॥ ১৯ ॥
## আদিত

কুয়াশা! সারা জীবন জুড়ে আজ যেন কুয়াশা নেমেছে পৃথিবীতে। আজ কোনও বন্ধু নেই! কোনও আলো নেই! কিছু নেই! সব এক অন্ধকার যুদ্ধক্ষেত্র! যাকে সব থেকে বিশ্বাস করে মানুষ, সেই বোধহয় সবচেয়ে বেশি আঘাত করে। যার কাছে সে তৃষ্ণার জল চায়, সেই মুখের কাছে ধরে হলাহল! এ পৃথিবী নরকের! অন্ধকারের! এ পৃথিবী প্রতিশোধের!

খারাপ করলে পৃথিবী নাকি সেই পাপ অন্যভাবে হলেও ফিরিয়ে দেয়! 'কার্মা' নাকি খুব কঠিন একটা জিনিস! এর হাত থেকে কেউ নাকি বাঁচতে পারে না! কিন্তু কবে কী হবে তার জন্য কি মানুষ বসে থাকবে? কবে কার্মা শাস্তি দেবে তার জন্য কতদিন অপেক্ষা করবে মানুষ!

আসলে তোমার কষ্টের হিসেব তোমাকেই নিতে হবে! তোমার বদলা নেবার ভার তোমার ওপরই আছে কেবল। সব কিছু ভাগ্য আর কার্মার ওপর ছেড়ে দিলে জানবে জীবন আবার এসে আঘাত করবে তোমায়! এই পৃথিবী এখন নরখাদকের! ক্ষমতাবান কিছু নরপিশাচ ইচ্ছেমতো সব কিছু করে যায়! তারা পায়ের তলায় পড়ে যাওয়া কাউকে লক্ষ্য করে না! তাদের লোভ, জিঘাংসা আর ক্ষমতা প্রদর্শণই হল বেঁচে থাকার লক্ষ্য! এরা নিজের থেকে থামবে না! এদের থামাতে হবে! অন্তত একজনকে হলেও থামাতে হবে! বাকিদের বুঝিয়ে দিতে হবে, মানুষকে যারা পশুর মতো ব্যবহার করে, তাদের শেষ পরিণতি এমন পশুর মতোই হয়! আমাদের মধ্যের সেই ন্যায় প্রতিষ্ঠা করার ইচ্ছেটাই আসলে হবে দেবীর 'কার্মা'! তার নিয়তি!

সামনে কালভার্টের মতো উঁচু হয়ে রাস্তাটা দুভাগে ভাগ হয়ে গিয়েছে। একটা চলে গিয়েছে থেকে গার্ডেন স্টেশানের দিকে, আর অন্যটা উঠে গিয়েছে ক্লাইভভারে!

আর আদিত যেখানে দাঁড়িয়ে আছে, সেখানের রাস্তাটা চলে গেছে একটা অভিজাত ক্লাবের পাশ দিয়ে লেকের ভেতরে যাওয়ার একটা লোহার গেট অবধি! অন্যদিন এখানে গার্ড থাকে, কিন্তু আজ কেউ নেই! পুলিশের গাড়িও দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না! এই আবহাওয়ার জন্যই হয়তো!

চোয়াল শক্ত করে মোবাইলে সময় দেখল আদিত। এগারোটা! কাল তেইশে ডিসেম্বর! পরশু, অর্থাৎ চব্বিশ তারিখ রাতে বিদেশে ঘুরতে চলে যাবে রাজুদা! তার আগেই কাজটা সেরে ফেলতে হবে! একদিকে মাকু আই.সি.ইউ.-তে শুয়ে মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করবে আর অন্যদিকে যে এর জন্য দায়ী সে 'মস্তি' করে বেড়াবে, সেটা হয় না! জীবনে কোনওদিন কোনও নিয়ম ভাঙেনি আদিত! কিন্তু এবার ভাঙবে! রাজুদার শিক্ষা হওয়া দরকার! মানুষের জীবনের মূল্য যাদের কাছে এক ফোটাও নেই তাদের বেঁচে থাকার দরকারও নেই!

সেদিন বিলুর ফোনটা পাওয়ার পর থেকেই মাথা কেমন করছিল! রাজুদা ওকে মারতে লোক লাগিয়েছিল! আর ওকে মারতে গিয়ে তারা ভুল করে মাকুকে গুলি করেছে! এটা কী হল! মাকু তো খুব সাধারণ ছেলে! একটু পাগলাগোছের! কিন্তু কারও ক্ষতি করে না! বরং সাহায্য করার চেষ্টা করে সবাইকে! তাকে এভাবে মেরে দিল! কেন!

পরেরদিন সকালেই রাজুদার কাছে গিয়েছিল আদিত। যার আদর্শে, যার দিকে তাকিয়ে ও চাকরি ছেড়ে এসে পলিটিক্সে যোগ দিয়েছে সে এমন কুৎসিত মানুষ সেটা তো জানত না!

বাড়িতে ঢোকার সময় ভেতরে ভেতরে কেমন একটা কষ্ট হচ্ছিল ওর! মনে হচ্ছিল, এভাবে রাজুদার সামনে ওকে যেতে হবে কোনওদিন সেটা ও ভাবতেও পারেনি! কিন্তু মাকু খুব নিরিহ একটা মানুষ। তাকে মারার দায় তো নিতেই হবে রাজুদাকে!

রাজুদার বাড়িটা কেমন যেন নিস্তব্ধ ছিল সেদিন। বাইরের রোজকার ভিড়টাও কম ছিল বেশ। ওকে দেখে দু একজন সামান্য চমকেও গিয়েছিল!

বাড়ির ভেতরটা কেমন যেন ঠান্ডা আর স্যাঁতস্যাঁতে লেগেছিল। আদিত দেখেছিল রাজুদার ঘরের দরজাটা সামান্য ফাঁক করা! ও এগিয়ে গিয়ে দরজায় টোকা দিয়েছিল জোরে।

'কে?' রাজুদার গলায় বিরক্তি ছিল স্পষ্ট!

আদিত আর উত্তর না দিয়ে সোজা দরজা ঠেলে ঢুকে গিয়েছিল ভেতরে!

'তুই?' রাজুদা ফোনে কথা বলছিল কারও সঙ্গে! ওকে দেখে ফোনটা নামিয়ে তাকিয়েছিল ওর দিকে। চোখে মুখে রাগ!

আদিত এগিয়ে গিয়ে টেবলের ওপর ভর দিয়ে ঝুঁকে দাঁড়িয়েছিল সামনে। তারপর বলেছিল, 'এটা কী করলে রাজুদা! মাকুকে মেরে দিলে!'

রাজুদা এবার পূর্ণ দৃষ্টি দিয়ে তাকিয়েছিল ওর দিকে। তারপর মোবাইলটা সুইচ অফ করে বলেছিল, 'তোর দেখছি খুব সাহস বেড়ে গিয়েছে!'

'কথা কাটিও না রাজুদা! এটা তুমি কী করলে!'

'বাক্তোত, সেদিনের ছেলে আমায় এসব জিজ্ঞেস করছিস!' রাজুদা চোয়াল শক্ত করে তাকিয়েছিল ওর দিকে, 'তোর ব্যবস্থা করছি, দাঁড়া!'

'আমার ব্যবস্থাই তো করতে গিয়েছিলে! কিন্তু... কেন এমন করলে রাজুদা! সেই ভোটের সময় যাদের রেশন কার্ড হয়ে যাবে বলেছিলে তাদের রেশন কার্ড করে দিলে না! ফ্যাক্টরির আন্দোলনটা সাবোটাজ করলে! তারপর... তারপর...'

রাজুদা কথার মধ্যে উঠে এসে দাঁড়িয়েছিল সামনে। এবার আচমকা ওর কলারটা খামচে ধরে বলেছিল, 'তুই আমার কাছ থেকে কৈফিয়ৎ চাইছিস! তুই একটা ফ্যাক্টরি বন্ধ করার তালে ছিলিস না! সেটা কি ভাল কাজ?

আদিতের গলায় কষ্ট হচ্ছিল, ও রাজুদার হাতটা ছাড়াবার চেষ্টা করতে করতে বলেছিল, 'তুমি... তুমি কত টাকা নিয়েছ মালিকদের থেকে? আমি কি কিছু বুঝি না! কিছু কি বুঝি না! বাদলদা আর তুমি...'

'শালা!' রাজুদা ওকে ঠেলে ফেলে দিয়েছিল মেঝেতে তারপর এগিয়ে এসে আচমকা লাথি মেরেছিল পেটে। অক্ শব্দ করে কুঁকড়ে গিয়েছিল আদিত। একটা ব্যাথা নিমেষের মধ্যে ছড়িয়ে গিয়েছিল সারা শরীরে!

রাজুদা ঝুঁকে পড়ে ফিস্‌ফিস্ করে বলেছিল, 'তোকে ভাল একটা কথা বলেছিলাম, শুনলি না! পুশিকে কষ্ট দিলি! আর আমার কেরিয়ার নিয়েও কাঠি করছিস! গাড়ুদের পাঠিয়েছিলাম তোকে মারতে! তোর ওই ক্যালানে বন্ধুটা মাঝখান থেকে দানা খেল! কিন্তু না, এবার দেখ তোকে কী করি! তোর বাপ, মা চোদ্দ গুষ্টির যদি পেছনে না দিই তাহলে আমার নাম পালটে ফেলিস!'

আদিত উঠে বসেছিল এবার। রাজুদাকে যেন ঠিক রাজুদা লাগছিল না! বরং কেমন একটা রাক্ষসের মতো লাগছিল! মনে হচ্ছিল রাজুদার শ্বাস দিয়ে আগুন বরছে!

রাজুদা বলেছিল, 'একটাই বাঁচার উপায় তোর! এখান থেকে অন্য কোথাও চলে যা! আমি বিদেশ থেকে এসে যেন তোকে না দেখি এখানে!'

আদিত উঠে দাঁড়িয়েছিল। এই রাজুদাকে চিনতে পারছিল না ও। সারা শরীরে একটা চাপা রাগ ছোবল মারছিল। মনে হচ্ছিল একুণি কিছু একটা করতে হবে! এই লোকটাকে এখানে থামাতে হবে, নাহলে লোকটা আরও অনেক ক্ষতি করে দেবে সবার! এটা হতে দেওয়া যায় না কিছুতেই। ও ধীরে ধীরে বেরিয়ে এসেছিল বাইরে!

রাজুদার বাড়ি থেকে কিছুটা দূরে, একটা নির্জিন গলিতে গিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়েছিল আদিত। নয়ডায় ওর চাকরি পাকা! বাবা হাসপাতাল বটে, কিন্তু তাতেও খুব কিছু আটকাবে না। ছোটমামা সেটারও একটা বন্দোবস্ত করবে বলেছে। সঙ্গে মায়ের দিকটাও দেখবে। কিন্তু তাতে তো নিজেকে বাঁচানো হল। আর বাকি মানুষদের কী হবে! মাকুর কী হবে! ও যে আই.সি.ইউ.-তে লড়াই করছে প্রতিটা শ্বাসের জন্য, তার কী হবে? অন্যায়ের বিরুদ্ধে কেউ কি কথা বলবে না! দেশে আইন আছে, কিন্তু সেই আইনের মাধ্যমে কি রাজুর মতো লোকেদের নাগাল পাওয়া যায়? যায় না! তাহলে? তাছাড়া ওর তো শুধু যাওয়ার রাস্তাই আছে! ফেরার রাস্তা তো নেই!

বুকের ভেতরে কেমন একটা ছটফট করছিল ওর! মনে হচ্ছিল কী যেন একটা মনে পড়ি পড়ি করেও পড়ছে না! কী যেন একটা কাজ করলেই সব ঠিক হয়ে যাবে, কিন্তু সেটা হচ্ছে না! শুধু আজও হাজার হাজার মৃত পাখির পালক যেন ঝরে পড়ছে আকাশ থেকে!

'কীরে!' আচমকা পাশের থেকে বিলুর গলা পেয়েছিল আদিত।

আদিত ঘুরে তাকিয়েছিল বিলুর দিকে। একটা হালকা সবুজ রঙের উইন্ডচিটার পরে পানের মশলা চিবোতে চিবোতে ওর দিকে তাকিয়ে ভুরু তুলে ইশারা করেছিল বিলু।

আদিত নামিয়ে নিয়েছিল মাথা। বিলু রাজুদার খাশ লোক। কিছু বলতে এসেছে কি?

বিলু আরও একটু এগিয়ে এসেছিল কাছে, 'অত ভাবছিস কেন? মালটাকে নামিয়ে দে!

কী! চমকে উঠেছিল আদিত! বিলু ওকে মাকুর খবরটা দিয়েছিল। আর এখন এসব কী বলছে! তবে কি বিলু সরে এসেছে আদিতের থেকে!

'অমন আত্তার মতো কী দেখছিস! মালটার খুব রস হয়েছে! ওকে সরিয়ে দে এই মওকায়। তোকে মালটা মারতে চেয়েছিল তুলে যাস না। আমার কাছে খবর আছে আবার চেষ্টা করবে। আদিত, শত্রুর শেষ রাখতে নেই!'

আদিত মাথা নিচু করে নিয়েছিল। ঠিক বলেছে বিলু। রাজুদার মতো লোকজন সবার শত্রু। যে অন্যকে খুন করতে দ্বিধা করে না তার প্রতি দয়া দেখাবার কোনও মানে হয় না।

ও জিজ্ঞেস করেছিল, 'কীভাবে... মানে...'

'টাকা আছে তোর কাছে?' বিলু জিজ্ঞেস করেছিল।

'কত?'

বিলু দেখে নিয়েছিল এদিক ওদিক। তারপর গলাটা সামান্য নামিয়ে বলেছিল, 'শোন, ওয়ান শটারের দাম এক দেড় হাজারের মতো। তবে লাল মুক্তোর মাল হলে তিন চার হাজার পড়ে যাবে। সেতেন এম.এম. কিনতে চাইলে কুড়ি থেকে পঁয়ত্রিশ হাজার পড়বে। আর নাইন এম.এম. এর দাম মোটামুটি তিরিশ থেকে পঞ্চাশ হাজারের মতো!'

আদিত অবাক হয়ে তাকিয়েছিল ওর দিকে।

বিলু বলেছিল, 'ইলেকশান কি তোর খোল-কত্তাল বাজিয়ে হয় নাকি? রাজুদার হয়ে আমিই মাল কিনি লটে! ডিস্কাউন্ট পাই! তোকেও করিয়ে দেব। পারবি?'

পারবে? ওকি পারবে সত্যি? পৃথিবী থেকে একটা নোংরা লোককে সরিয়ে দিতে পারবে কি ও! কিছুই তো পারল না আদিত। ভাল পড়াশুনো করেও সমাজের হয়ে কিছু পারল না করতে! বাবা মায়ের ভাল সন্তান হতে পারল না। এমন কী যাকে ভালবাসল তার জন্যও কিছু করতে পারল না! আচমকা ওর সামনে স্মার্হির মুখটা ভেসে উঠেছিল। যেন দেখতে পেয়েছিল লম্বা বারান্দার সামনে একটা বড় পাখির খাঁচা। তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে একজন। ছোট্ট মুকুট কপালে! নাকের দুপাশে তিল! আর কী ভীষণ সুন্দর হাতের আঙুল! ওই হাত ওর কাছ থেকে এখন অনেক অনেক দূর!

একটা জীবনে ওর কিছুই করা হল না। কেবল ব্যর্থতা আর পরাজয়! এমন একটা জীবনে কিছু কি ভাল কাজ করবে না ও! একটা রাক্ষসকেও কি নিকেষ করবে না?

ও বলেছিল, 'আমি তিন হাজার জোগাড় করতে পারব। কিন্তু কাজ হবে তো!'

বিলু ওর কাঁধে হাত দিয়েছিল, 'মাখনের মতো হবে। চাপ নিস না।'

আজ, এই বাইশে ডিসেম্বরের আবছা কুয়াশার সন্ধেবেলা সেই বিলু ফোন করেছিল, বলেছিল রাতে, এই সময়ে, এখানে আসতে।

রাতে খাবার খেয়ে নিয়ে একটা ফুল সোয়েটার আর মাফলার জড়িয়ে আদিত যখন বেরচ্ছিল মা এসেছিল কাছে! বলেছিল, 'এত রাতে কোথায় যাচ্ছিস? হাসপাতালে?'

আদিত শান্ত গলায় বলেছিল, 'না, বাবা এখন ঠিক আছে। পরশু তো বাড়ি চলে আসবে। আমি অন্য একটা কাজে যাচ্ছি মা। তুমি শুয়ে পড়।'

'সাবধানে যাস,' মা আলতো করে হাত বুলিয়েছিল ওর মাথায়। বলেছিল, 'কী যে করিস কে জানে! আমার চিন্তা হয়! দিনকাল ভাল নয়!'

এইজন্য, একমাত্র এই জন্যই তো ওর এই কাজটা করা দরকার! কেন দিনকাল ভাল নয়? কীসের জন্য দিনকাল এমন হয়ে গেল! কিছু মানুষ ক্ষমতা নিয়ে ছিনিমিনি খেলে নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধি করল বলেই তো এমন হল নাকি! সেই জঘন্য মানুষদের একজনকে অন্তত ওকে সরাতে হবে! রাজুদা তো প্রতীক মাত্র!

একটা বাইক থামার শব্দ পেল আদিত। তারপর শুনল, 'এই যে, এসেছিস? কুয়াশার পর্দা ছিঁড়ে আলতো করে এগিয়ে এল দুটো ছায়া মূর্তি। একজনকে চিনতে পারল আদিত। বিলু।

বিলু এসে চাপা গলায় বলল, 'নিয়ে এসেছিস তো? তিন কিন্তু! বের কর!'

নিজের অনেক কষ্টের জমানো টাকা। তবু এটা করতে হবে! আদিত টাকাটা বের করে দিল। পাশের আবছায়া লোকটা নিয়ে নিল সেটা। তারপর একটা চটে জড়ানো জিনিস তুলে দিল ওর হাতে। খশখশে গলায় বলল, 'দাদা বলল বলে এই দামে দিলাম। সঙ্গে দশটা দানা ফিরি দিয়ে দিয়েছি! হাত সোজা রেখে কাছের থেকে টানবেন। এক সঙ্গে দুটোর বেশি চালাবেন না। গরম হয়ে গেলে মেশিন আটকে যাবে। বুঝেছেন?'

আদিত কিছু বলার আগেই বিলু এসে ওর কানের কাছে বলল, 'কাল মালটা সন্ধেবেলা একা যোধপুর পার্কে যাবে। বুঝলি! আমি টাইমটা বলে দেব পরে।'

মাথা নাড়ল আদিত। আর ঠিক তখনই একটা হুইসল শুনল। সামনের লেক গার্ডেন্স স্টেশানে ট্রেন ঢুকেছে একটা।

'লোকজন আসবে এবার। আমরা কাটি!'

বিলুরা আর দাঁড়াল না। বাইকে উঠে রাত্রি টুকরো টুকরো করে বেরিয়ে গেল দ্রুত! ট্রেনটাও ঘটাঘট শব্দ তুলে চলে গেল শিয়ালদার দিকে।

এদিক ওদিক দেখল আদিত। তারপর চটের মোড়কটা খুলে বের করল জিনিসটা। ঠান্ডা, ভারি একটা ধাতু! সঙ্গেই একটা প্লাস্টিকে মোড়ানো কয়েকটা বুলেট! হাত কাঁপছে আদিতের। এটা কী করতে যাচ্ছে ও! পারবে তো এটা করতে! কীভাবে করবে! একটা মানুষকে মেরে দেবে!

ও ভাল করে ধরল পিস্তলটা। হাত কাঁপলে হবে না! চট দিয়ে আবার মোড়াতে গেল জিনিসটাকে আর ঠিক তখনই শুনল শব্দটা! 'বাঁচাও... বাঁচাও...'

একটা মেয়ের গলা! সচকিত হয়ে উঠল আদিত! কে এমন করে চিৎকার করছে এখানে! কী হয়েছে! ও দ্রুত এগোল সামনে। এখানে ব্রিজের রাস্তা আর স্টেশানের রাস্তাটা এসে মিলেছে।

ঘন কুয়াশার মধ্যে দিয়ে পায়ের শব্দ আসছে শুধু! কে আসছে এভাবে?

আরও দু পা এগোল আদিত এবং তখনই ধাক্কা লাগল একটা। আর কে যেন ছিটকে পড়ল মাটিতে। আদিত সামলাল নিজেকে। তারপর তাকাল। আর সঙ্গে সঙ্গে আকাশের সমস্ত নক্ষত্র ঝিলমিল করে উঠল ওর শরীরে!

স্মাহি! স্মাহি ওর সামনে! এ কি সত্যি, না রূপকথা! কী হয়েছে ওর! কী বিপদ হল! ও দ্রুত হাত ধরে তুলল স্মাহিকে! এই স্পর্শ! এই তো যথেষ্ট ঈশ্বর! এখন কী বলবে ও! কী বলতে হয় এমন সময়ে!

আচমকা পেছনের তিনজন কুয়াশার থেকে ফুটে বেরল এবার। আর বুঝতে পারল আদিত! এই অঞ্চলের গুন্ডা এগুলো! দেখেছে আগে! কী চায় সেটাও বুঝতে পারল। আর নিমেষে ওর শরীরে এক আগ্নেয়গিরি রাগ ভর করল। ও এক হাত দিয়ে নিজের পেছনে টেনে আড়াল করল স্মাহিকে আর অন্য হাতে শূন্য পিস্তলটাই সোজা তুলে ধরল রাক্ষসগুলোর দিকে।

লোকগুলো থমকে গেল। কুয়াশার আবছায়ায় দাঁড়িয়ে আগুপিছু করতে লাগল। একজন বলল, 'সরে যা শুয়োরের বাচ্চা! আমাদের মাল! সরে যা...'

আরেকজন বলল... কী বলল? কিছুই শুনতে পেল না আদিত। শুধু বুঝল পেছন হাত বাড়িয়ে স্মাহি আলতো করে ধরেছে ওর হাতটা! সেই হাত ধরে আছে ওর হাত! বহু আগের একদিন সেই বারান্দার মতো! কিন্তু ও তো বাতিল! ওকে তো তাড়িয়ে দিয়েছিল! তাহলে কেন হাত ধরল এমন! সামনের লোকগুলো কীসব বলছে! কিন্তু কানে কিছু ঢুকছে না আদিতের। কেমন এক অদ্ভুত ভ্রমর-গুঞ্জন যেন ঘিরে রেখেছে ওকে! স্মাহির নরম হাত জড়িয়ে রয়েছে ওর হাত! কী হবে এরপর! ওই গুন্ডাদের থেকে কী করে নিস্তার পাবে ওরা! কীভাবে বাঁচবে এখান থেকে! পিস্তল তো খালি! তবে কি এভাবেই শেষ হবে সব কিছু! এভাবেই কি কিছু না বলেই সব মিলিয়ে যাবে এই কুয়াশায়! এই রাতে! এই তারাদের মাঝের অন্ধকারে! গেলে যাক! এইটুকু স্পর্শ, এইটুকু কাছে থাকাও তো সত্য! অসম্পূর্ণতাই তো জীবনের প্রকৃত সত্য!

এক হাত দিয়ে স্মাহির হাত শক্ত করে ধরল আদিত। তারপর শূন্য পিস্তল ধরে রইল সামনের দিকে! আর মনে মনে বলল, 'ভয় নেই স্মাহি! আমি আছি! তুমি দেখো, আমি যেমন ছিলাম ঠিক তেমনই থাকব! তোমার হয়ে থাকব!'

## ॥ ২০ ॥

### ঋত্বিজ

'আমি তোমার প্রেমে পড়ে গিয়েছি!' নীপা ওর সামনে বসে মোবাইলে খুটখাট করতে করতে তাকাল ওর দিকে!

হাসল তিজু! মেয়েটা একদম পাগলী! সারাক্ষণ ভুলভাল কথা বলে। আগে সিঁড়িতে বসে বলত এখন নার্সিংহোম থেকে আসার পরে ওর ফ্ল্যাটে এসে বলে। হাসি পায় তিজুর। এখনকার ছোট ছোট ছেলে মেয়েগুলো খুব পাকা! পাকা আর ওপিনিয়েনটেড! সব কিছু নিয়ে এদের বক্তব্য আছে। সব বিষয়ে এদের মতামত আছে! তবে এটাই তো স্বাভাবিক! এটাই তো ভাল। জীবনের প্রথম দিকে এভাবেই তো ঠুকে বাজিয়ে দেখে নিতে হয় সবকিছু! খুঁজে নিতে হয় নিজের নিজের সত্যিকে! কারণ বড় হয়ে গেলে, বয়স হয়ে গেলে মানুষ তো ক্লান্ত হয়ে যায়! হতোদ্যম হয়ে যায়! তখন আর কিছুই তো করতে পারে না সে! শুধু নির্বিকার এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকা অভ্যেস হয়ে যায় তার!

'কী হল?' নীপা খোঁচা মারল ওকে।

তিজু হাসল, বলল, 'বুঝলাম, এবার বাড়ি যা! কটা বাজে দেখেছিস? পৌনে এগারোটা!'

'তো? দেরি হোক। আমার জন্মদিনে তুমি কী দেবে আমায়? কাল তেইশে ডিসেম্বর ভুলে যাওনি তো?'

'কী চাস তুই?' তিজু তাকাল ওর দিকে।

'কিস!' খিলখিল করে হাসল নীপা, 'লাইক ফ্রেঞ্চ কিস! তোমায় তোমার বৌ ছেড়ে দিল কেন বলো তো? এমন মালকে কেউ ছেড়ে দেয়!'

তিজু চোখ বড় বড় করে তাকাল, 'মাল!'

নীপা ভুরু কুঁচকে বলল, 'ও ছেলেরাই শুধু মেয়েদের মাল বলবে, না? মেয়েরা বললেই অমনি অবাক হওয়া! এই মিডল এজেড লম্বা চওড়া লোকেদের আমার হেভি সেক্সি লাগে!'

'আচ্ছা, চুপ করা!' তিজু ঘড়ি দেখল। পাগলীটাকে এবার ভাগাতে হবে।

নীপা উঠে দাঁড়াল এবার, 'আচ্ছা আচ্ছা আর ঘড়ি দেখতে হবে না। আই গেট ইট। যাচ্ছি। কিন্তু কাল কিস চাই। লাইক ডিপ ওয়ান! বুঝলে!'

'মার খাবি,' মিষ্টিমিষ্টি চোখ পাকাল তিজু, 'যা এবার। পাগলী।'

নীপা হেসে কবজির কাছের ব্যান্ডেজটা আলতো করে ধরে বলল, 'তোমায় কেউ কী করে ছেড়ে থাকতে পারে? আই ডোন্ট নো! আমায় তুমি পাগলী বলছ, কিন্তু সেই মেয়েটা সবচেয়ে বড় পাগলী!'

'মানে!'

'মানে, আই ক্যান সি ইট ইন ইওর আইজ! আর কতদিন এভাবে থাকবে! যাকে ভালবাস তার থেকে এমন করে থেকো না! সে পাগলী বলে তুমিও এমন করবে! রাগ করে থেকো না আর! অভিমান কোরো না! একটাই জীবন! গ্লিজ গো টু হার! গো ফর দে কল ইউ শেফার্ড!' নীপা এক নিঃশ্বাসে কথাগুলো বলে আর দাঁড়াল না!

নির্জন ঘরে দাঁড়িয়ে কেমন একটা লাগল তিজুর! নীপা কী করে বুঝল এসব! ওর মুখে কি কিছু ফুটে ওঠে! এভাবে কেন বারবার এখনও মুকুর কথা মনে পড়ে ওর! ওকে তো বলেইছিল যা বলার! এমন কী বলেছিল ওর বাচ্চার কষ্ট লেগে আছে ওর হাতে! রক্ত লেগে আছে! ওর হাতে! এটা কী করে বলেছিল মুকু! খুব রাগী মেয়ে ছিল ও! খুব কষ্টে ছিল। তাই হয়ত বলে ফেলেছিল এমন একটা কথা!

যবে থেকে ও জেনেছিল মুকু প্রেগনেন্ট, তিজুর কী যে আনন্দ হয়েছিল! মনে হয়েছিল সারা পৃথিবীর সমস্ত ভাল কিছু নিয়ে ও জড়ো করে মুকুর চারিদিকে! যে মেয়েটাকে প্রথম দিন দেখেই মনে হয়েছিল 'এ আমার!' তার সঙ্গে ও নতুন একজনকে আনছে পৃথিবীতে! ওর নিজের রক্ত! মনে মনে কত কী যে ভেবে নিয়েছিল তিজু!

কিন্তু তারপর কী হল! অন্ধকার একটা সুড়ঙ্গে যেন পড়ে গেল ও! বাচ্চাটা রইল না! মুকু কেমন হয়ে গিয়ে ওকে ছুঁড়ে ফেলে দিল জীবন থেকে! তারপর মৃত্যুসজ্জায় মা বলে গেল এমন একটা কথা!

সবাই ছিল তিজুর। কিন্তু এখন আর কেউ নেই! মুকু বিয়ের আগে একবার বলেছিল, 'দেখবি, তোকে ছেড়ে আমি কোনওদিন কোথাও যাব না। তোকে ছেড়ে থাকতেই পারব না!'

জীবনের এই অদ্ভুত একাকিত্বে এখন কোথায় মুকু! কার কাছে চলে গেল ও! সত্যি অন্য একজনকে বিয়ে করে নেবে!

তিজু উঠে গিয়ে বাইরের দিকে তাকাল। আজ কুয়াশা খুব। কলকাতা যেন অপরিষ্কারভাবে মুছে নেওয়া কোনও ব্ল্যাকবোর্ড! সব কেমন ঘোলাটে।

অভিনব সেদিনের পরে বলেছিলেন আবার পঁচিশ তারিখ দেখা করবেন! ওঁর কেমো নিতে যাওয়া আছে মাঝখানে! খারাপ লাগছে তিজুর। একজন অসুস্থ মানুষকে এভাবে বিরক্ত করতে খারাপ লাগছে! কিন্তু এমনটা এক প্রশ্ন ওকে কুড়ে কুড়ে খাচ্ছে যে নিজেকে সামলাতেও পারছে না! আর অভিনব নিজেও কিছুতেই বলছেন না যে মানুষটি কে! জোর করলে বলছেন, 'আমি কথা দিয়েছিলাম যে নাম বলব না! কথা দিয়েছিলাম যে তাকে গোপন রাখব!'

তাও পঁচিশ তারিখ একবার চেষ্টা করবে তিজু! আর তারপর যদি না হয়... জানে না, আর কিছু ভাবতে পারছে না তিজু!

ও বাইরের দিকে তাকাল। মন কেমন যেন একটুও। আবছা শহরে একা লাগছে খুব। আচমকা মুকুর কাছে যেতে ইচ্ছে করছে ভীষণ! মনে পড়ে যাচ্ছে বিয়ের অনেক আগে এমন একটা রাতের কথা! সেদিন দিল্লীতে কুয়াশা ছিল খুব! আর থাকতে না পেরে মাঝরাতে মুকুদের হোস্টেলে লুকিয়ে চলে গিয়েছিল তিজু! তখন মুকুর মায়ের জন্য

ওদের মধ্যে সাময়িক একটা বিচ্ছেদ এসেছিল। মুকুই বলেছিল, তিজু যেন এখন যোগাযোগ না করে।

কিন্তু যোগাযোগ না করে কী করে থাকবে তিজু! ওর তো পাগল পাগল লাগছিল সারাক্ষণ। মনে হচ্ছিল এক্ষুনি মুকুকে না পেলে ওর দম বন্ধ হয়ে যাবে। তাই হোস্টেলে না গিয়ে উপায় ছিল না ওর। সবার চোখ এড়িয়ে ও একতলার বারান্দায় উঠে আলতো টোকা দিয়েছিল মুকুর সিঙ্গল রুমের জানলায়। নিমেষে জানলা খুলে দিয়েছিল মুকু। তারপর ওকে দেখে দরজা খুলে নিজের ঘরে ঢুকিয়ে নিয়েছিল! সেদিন সারারাত দুজনে দুজনের ভেতরে ডুবে ছিল। মুকু আদুরে গলায় ওর সঙ্গে লেপ্টে থেকে বলেছিল, 'আমি আজ তোকে পাগলের মতো চাইছিলাম। আমি তোকে ছাড়া কিছুতেই থাকতে পারছি না আর। আমাদের জীবনটা কী এভাবেই গোটা একটা অপেক্ষা হয়ে থেকে যাবে?'

শীতের রাতে মুকুর শরীরের তাপে নিজেকে জড়িয়ে নিতে নিতে ওর কানে কানে তিজু বলেছিল, ' "There is a place in the heart that / will never be filled/ a space/ and even during the/ best moments/and/the greatest times/ times/ we will know it/ we will know it/ more than/ ever/ there is a place in the heart that/ will never be filled// and/ we will wait/ and/ wait/ in that space." '

সেই মুকুর থেকে ওকে দূরে থাকতে হয় এখন! অভিনব সত্যি বলেছেন, ভালবাসার মানুষ চলে গেলে মানুষ আর বেঁচে থাকে না!

আচমকা ফোনটা ক্রিং ক্রিং করে বেজে উঠল! সামান্য বিরক্ত হয়ে পেছনে ফিরল তিজু। এই ফোনটা কেন যে ওকে অভিনব দিলেন! এসবের থেকে দূরে থাকবে বলেই তো ও নিজের ফোন নিয়ে আসেনি সঙ্গে করে!

তবু গিয়ে ফোনটা ধরল। আরে জগন! ব্যাটাকে নাম্বারটা দেওয়া ঠিক হয়নি!

'বল।' ফোনটা কানে লাগাল তিজু।

জগন কোনও রকম ভূমিকা না করে বলল, 'ইন্ডিয়ান আর্মি। মেজর। ইউ.এন. পিস কিপিং ফোর্সেও ছিলেন। বিয়ে করেননি। এখন রিটায়ার্ড! অসুস্থ! নাম অভিনব রাওয়াত?'

'আরে! কী বলছিস তুই?' তিজু এমন আচমকা কথায় ঘাবড়ে গেল সামান্য, 'কী হল কী! এসব বলছিস কেন?'

'আপনি জানতেন যে অভিনব রাওয়াত আর্মিতে ছিলেন?'

'আমি? নাতো... মানে...' কী বলবে বুঝতে পারল না তিজু। আসলে অভিনব ওকে নিজের সম্বন্ধে কিছুই বিশেষ বলেননি। আর ও নিজেও বাবার পরিচয় জানতে চাওয়া ছাড়া আর কিছু জানতে চায়নি!

'আমি একটা ছবি পাঠাচ্ছি আপনাকে। দেখুন। অভিনবের ছবি। ইয়াং বয়সের। দেখুন দাদা!'

বলে কাট করে ফোনটা কেটে দিল জগন। আরে পাগল নাকি! ব্যাপারটা কী! কী বলছে কী ছেলেটা। কিন্তু একবার দেখা যাক কী পাঠিয়েছে! তিজু ফোনের ডেটা অন করে হোয়াটস্অ্যাপে মেসেজ দেখল! একটা ছবি এসেছে। ও ক্লিক করল ছবিটায়। পুরোনো দিনের একটা রঙিন ছবি। কেমন অদ্ভুত রঙ। ইস্টম্যান কালার! একজন মানুষ দাঁড়িয়ে রয়েছেন। মাথা উঁচু। হাত দুপাশে মুঠো করা। পরণে মিলিটারি পোশাক।

আচমকা হাতটা কেমন যেন অবশ হয়ে এল তিজুর! মনে হল ফোনটা পড়ে যাবে! এ কার ছবি! এ যে হুবহু ওর মতো দেখতে! ব্লিটিং ইমেজ! হাত কাঁপছে ওর! মাথাটা কেমন যেন লাগছে! ব্যাপারটা কী! এই ছবি জগন পেল কী করে!

ও কাঁপা হাতে জগনকে ফোন করল আবার।

দুবার রিং হতেই ফোনটা ধরল জগন, 'দাদা, আমি আপনার ভাইয়ের সঙ্গে কথা বলে নিয়েছি। উনি বলছিলেন না প্রথমে, কিন্তু আই হ্যাভ মাই ওয়েজ! আমি সামান্য সময়ের মধ্যে যা জোগাড় করতে পারলাম, তাই পাঠালাম আপনাকে। আর আপনার জন্য জানাচ্ছি, অভিনব স্যার, কিন্তু কাল ভোরেই চলে যাচ্ছেন। আপনাকে উনি বলেননি। কিন্তু কালকেই মুম্বাই চলে যাচ্ছেন ফর ফারদার ট্রিটমেন্ট! বুঝলেন!'

'তুই... তুই... কী করে... তুই কে জগন? সত্যি করে বল তুই কে?'

জগন হাসল, 'আমি কেউ নই। জাস্ট আ শ্যাডো। রিটায়ার্ড! আপনি যদি অভিনব স্যারের সঙ্গে দেখা করতে চান আজ এই রাতেই করতে হবে। যাকে খুঁজছেন সে কে আর নিশ্চয় বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে না!'

তিজুর পা কাঁপছে। গলা শুকিয়ে আসছে। এটা কী পাগল ওকে জগন! কী করে জানল এত কিছু!

ও কাঁপা গলায় জিজ্ঞেস করল, 'তুই যাবি আমার সঙ্গে?'

জগন হাসল, 'আমি দেশপ্রিয় পার্ক মোড়ে যে দুটো বড় পানের দোকান আছে তার পাশের পেট্রোল পাম্পের সামনে ওয়েট করব। আপনি ডাউ এগারোটা কুড়িতে আসবেন। কমন। এগারোটা কুড়ি! টাইমটা ইমপরট্যান্ট! মনে রাখবেন দাদা!'

ফোনটা কেটে কী করবে বুঝতে পারল না তিজু। মা বলেছিল বাবা ওর স্ট্রিটে ইমেজ! আর মোবাইলের ছবিটা দেখলে মনে হচ্ছে ও-ই মিলিটারি পোশাকে দাঁড়িয়ে রয়েছে! তাহলে অভিনবই কি... মানে তাই কি নিজেকে প্রকাশ করছিলেন না! মাকে কি এই কথাটাই দিয়েছিলেন! আর কাল চলে যাচ্ছেন জেনেও কি ওকে দিকভ্রান্ত করতে পঁচিশ তারিখ দেখা করতে বলেছেন! মানে উনি গোপনই রাখতে চেয়েছেন নিজেকে!

না, আর না! এখুনি যেতে হবে ওকে। জগন ঠিক বলেছে! আর সময় নেই! আজ রাতেই জিজ্ঞেস করতে হবে উনি সেই মানুষ কীনা! কেন এভাবে লুকিয়ে থাকছেন এখনও! কেন নিজের সন্তানকে সামনে পেয়েও কিছু বলছেন না! শুধু কথা দিয়েছিলেন বলে! মানে মাকে কি সত্যি ভালবেসেছিলেন উনি! ওই যে মৃত্যুর কথা বলেছিলেন তাহলে সেটা কি ওঁর নিজের অভিজ্ঞতা!

তিজু নিজেকে স্থির করল। তারপর দ্রুত ঘড়ি দেখল। এগারোটা সাত বাজে। আর সময় নেই। ও পাশে রাখা জ্যাকেটটা তুলে নিয়ে গায়ে চাপিয়ে মানি ব্যাগ আর মোটর বাইকের চাবিটা টেবলের ওপর থেকে তুলে নিল।

নীচে নেমে বাইকের সাইড-কারে রাখা হেলমেটটা মাথায় পরে নিল চটপট। তারপর বাইকে বসে স্টার্ট দিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে ঘড়ি দেখল তিজু। এগারোটা দশ বাজে। ও দ্রুত বাইক ছোটাল।

কুয়াশায় ডুবে থাকা শহর চিরে এগোচ্ছে ওর বাইক। আলোর লাঠি পথ দেখাচ্ছে ওকে। কোন দিকে নিয়ে যাচ্ছে ওর জীবন! এই ছবি কি সত্যি অভিনবের! এখন কেমো খেরাপি আর অসুখে ঝলসে যাওয়া মুখ দেখে কিছু বোঝা যাচ্ছে না! কিন্তু এটা কি সত্যি এই মানুষটার যুবকবেলার ছবি! এটা কি সত্যি ওর বাবার ছবি!

গলি দিয়ে বেরিয়ে ডান দিকে বাঁক নিয়ে লেক গার্ডেন্স ফ্লাইওভারে উঠল তিজু। ভাল করে দেখা যাচ্ছে না কিছু। রিজের ওপরের হলুদ আলো কুয়াশায় মিশে হানি কেকের মতো রঙ ধরেছে!

বাইকের গতি আরও বাড়াল তিজু। ওর আর দেরি সহ্য হচ্ছে না! সত্যি জগন একটা অদ্ভুত মানুষ! কী করে এসব জেনে নিল ও! ভাবলেও অবাক লাগছে! রিজটা সামনে ডান দিকে বেঁকে গিয়েছে। বাইকটা সেই দিকে ঘোরালো। তারপর ক্রস এগিয়ে গেল সমেত রাস্তার দিকে। আর ঠিক তখনই দেখল দৃশ্যটা!

কুয়াশায় ঢাকা রাস্তায় আবছায়া কিছু শরীর! কিন্তু তার মধ্যেও একটা মেয়ে আর একটা ছেলে যে দাঁড়িয়ে রয়েছে সেটা বুঝতে অসুবিধে হল না। ওদের শরীরী ভাষা দেখে বুঝতে পারল কিছু একটা ঘটছে! আবছা চিৎকারও শোনা যাচ্ছে! কেউ কি বিপদে পড়েছে! সর্বনাশ! এখন কী করবে ও! নিজের কাজে যাবে? নাকি এগিয়ে যাবে সাহায্য করতে! কী করা উচিত!

মোটর বাইক দ্রুত গড়িয়ে যাচ্ছে! হেড লাইটের আলো কুয়াশা চিরে পড়ছে সামনের রাস্তায়। অবয়বগুলো স্পষ্ট হচ্ছে! আরে এটা তো সেই মেয়েটা! আর ছেলেটাকেও তো চেনে! সেই যে রাস্তায় বমি করছিল বলে ও জল দিয়েছিল একদিন! মেয়েটাকে পেছনে রেখে ছেলেটা হাতে কী একটা তুলে তাগ করেছে সামনে। আর দুটো মানুষ চিৎকার করে অশ্রাব্য ভাষায় কীসব বলছে! আরেকজন পিছিয়ে যাচ্ছে কিছু একটা

আনতে। ছেলেটা আর মেয়েটা যে বিপদে পড়েছে সেটা বুঝতে অসুবিধে হল না তিজুর। ও ঘড়ি দেখল। জগদনের কাছে পৌঁছতে কি দেরি হয়ে যাবে? এদিকে এদের যে বিপদ! নিজের দিকটা কি দেখবে? স্বার্থপর কিন্তু এদের কিছু হয়ে গেলে সেই রক্ত কার হাতে এসে লাগবে! স্বার্থপর ঋত্বিজ কি সত্যি আজও স্বার্থপরই থাকবে?

তিজু দ্রুত সিদ্ধান্ত নিল। তারপর বাইকের গতি আরও বাড়িয়ে দিয়ে ছেলেটা আর মেয়েটার পাশে গিয়ে ব্যাচ করে থামালটা গাড়িটা। এবার স্পষ্ট দেখল তিজু। সামনে দুজন গুন্ডা ধরণের লোক। আর তাদের পেছনে আরেকজন পিছিয়ে যাচ্ছে কিছু একটা আনতে!

বাইকটা অমন করে দাঁড় করাতে ছেলেটা আর মেয়েটা চমকে উঠল। তারপর মেয়েটা ওকে দেখে কাতরভাবে বলল, 'স্যার প্লিজ স্যার আমাদের বাঁচান, প্লিজ স্যার...'

তিজু নিমেষে মন স্থির করে নিল। ও বলল, 'তাড়াতাড়ি উঠে পড় বাইকে। কুইক!'

মেয়েটা থমকে গেল কয়েক মুহূর্তের জন্য তারপর ছেলেটাকে টানল হাত ধরে, 'চলো, প্লিজ আদিত, চলো!'

আদিত পেছনে ঘুরল। আর সঙ্গে সঙ্গে একটা ইট এসে লাগল ছেলেটার হাতে! আঃ করে চিৎকার করে উঠল আদিত! ওর হাতের থেকে কী একটা ধাতব জিনিস যেন পড়ে গেল মাটিতে! তিজু দেখল পেছনের গুন্ডা ছেলেটা ইট তুলে ছুঁড়ছে। ও জোর গলায় বলল, 'বসো তাড়াতাড়ি! বসো তোমরা।'

মেয়েটা সাইডকারে লাফিয়ে বসল এবার আর ছেলেটা ওর পেছনে পিলিয়নে উঠে পড়ল। আরেকটা ইট এসে লাগল বাইকের সামনের চাকায়। তিজু দ্রুত বাইক স্টার্ট দিয়ে দিল। ইট পড়ছে সমানে। গালাগালি উড়ে আসছে বৃষ্টির মতো। তার মধ্যেই বাইক চালিয়ে দিল তিজু। শুনল একটা লোক চিৎকার করে বাইক আনতে বলছে! কিন্তু পাত্তা দিল না ও। বাইকের স্পিড বাড়িয়ে দিল। ওই তো লেকে ঢোকার গেটের সামনে রবীন্দ্রনাথের দাঁড়ানো মূর্তিটা! ওটা পাড় করে এগোতে লাগল তিজু। রিয়ার ভিউ মিররে দেখল গুন্ডাগুলোর বাইক আসছে ধাওয়া করে এবার! কুয়াশার ভেতর সেই আলোটাকে কেমন মেঘ চাপা চাঁদের মতো লাগছে। আরও গতি বাড়াল তিজু। বাইকটা কতটা কাছে এল? ও আয়নায় চোখ রাখল আবার। আর দেখল কী যেন ছায়ার মতো আচমকা এসে পড়ল পেছনের বাইকটার সামনে আর বাইকের আলোটা টাল সামলাতে না পেরে কাত হয়ে গেল হঠাৎ। বিকট একটা শব্দ কাচ ভাঙার মতো গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে ছড়িয়ে পড়ল চারিদিকে! তিজু পেছনে মাথা ঘুরিয়ে দেখল এবার। বাইকটা পড়ে গেছে রাস্তায়! ঝাপসা আলোটা কাত হয়ে গেছে। মিট মিট করে নিভে যাচ্ছে। পিছিয়ে যাচ্ছে!

সোজা হয়ে বসল তিজু। হাওয়া এসে লাগছে মুখে। ও না দেখেও বুঝল মেয়েটা হাত বাড়িয়ে ধরে আছে ছেলেটার হাত। না দেখেও বুঝল, ছেলেটাও তাকিয়ে আছে মেয়েটার দিকে। রাতের হাওয়া পাক খাচ্ছে কলকাতায়! এ কীসের গল্প দেখছে ও! কার গল্প দেখছে! অনেকটা কি ওর নিজের গল্প! আচ্ছা আমাদের সবার গল্পগুলোই কি কোথাও এক রকমের!

কেউ কোনও কথা বলছে না। কিন্তু কত কিছুই যে বলছে! সারা জীবন না বলতে পারা কথা কি মানুষ শুধু কথা দিয়েই বলে! কথা ছাড়াও তো মনের সব কথা এমন স্পর্শ আর এমন দৃষ্টি দিয়ে বলে দেওয়া যায়!

তিজু জানে না, সামনে কী অপেক্ষা করছে ওর জন্য! কিন্তু হঠাৎ খুব ভাল লাগছে খুব! মনে হচ্ছে এবার থেকে জীবন অন্য একটা আনন্দের দিকে বয়ে যাবে! মনে হচ্ছে জীবন এবার জীবনের দিকে বয়ে যাবে!

ও এবার পেছনের দিকে তাকাল এক পলক। দুজনে দুজনের হাত ধরে বসে রয়েছে। চোখে চোখ রেখে বসে রয়েছে! আর প্রকৃতি যেন নিজের সমস্ত ভালবাসা দিয়ে ওদের একাকী থাকার জন্য আরও ঘন কুয়াশার চাদরের আড়ালে ঢেকে দিচ্ছে চরাচর!

তিজু হাসল শব্দ করে। তারপর আরও জোরে বাইক ছুটিয়ে দিল দেশপ্রিয় পার্ক মোড়ের ওই পেট্রোল পাম্পের দিকে!

**ঈশ্বরের চিঠি – ৩**

এর পর কী হল? আদিত আর স্মাহির মিল হল কি? তিজুর সঙ্গে দেখা হল মুকুরা? আর অভিনব! তিনি কি সত্যি সেই মানুষ যাকে খুঁজতে এসেছে তিজু! বাইক এগিয়ে যাচ্ছে! আর আমি ওই দূরের উলটে পড়া বাইকের সামনে বসে দেখছি ক্রমশ কুয়াশায় মিশে যাওয়া গাড়ির টেল লাইট! হ্যাঁ, আমি কুয়াশাতেও সব দেখতে পাই! কারণ আমি ঈশ্বর! আমি এসে আচমকা রাস্তা পার করার নামে ওদের সামনে দাঁড়িয়েছিলাম বলেই ওই বাজে লোকগুলো বাইক উলটে পড়ে আছে এখন! তিজু, স্মাহি আর আদিত বেঁচে পালিয়ে গিয়েছে! কিন্তু তারপর! পালিয়ে ওরা গেলটা কোথায়? শেষে কী হল ওদের? গল্পটা কি সম্পূর্ণ হল না?

সম্পূর্ণ, একটা অদ্ভুত শব্দ! এই পৃথিবীতে কোনটা সম্পূর্ণ? আমাদের নিজেদের জীবনের সবকটা গল্পই তো অসম্পূর্ণ। তাহলে কেমন করে আমি একটা নিটোল ভাবে শেষ হওয়া গল্প লিখব? যে মানুষ মারা যাবে বিকেলে বা সন্ধেবেলা বা রাতে, সে কি কোনও পরিকল্পনা নিয়ে সকাল শুরু করে না! সে কি প্ল্যান করে রাখে না কাল কী করবে! পরশু কী করবে! বা পরের সপ্তাহে কোন দিন যাবে বন্ধুর বাড়ি! তাহলে? সে তার মৃত্যু দিনটাও তো শুরু করে বিশ্বাস নিয়ে! বিশ্বাস, আমাদের এক মাত্র অ্যালবেট্রস! সেই পুরোনো বৃদ্ধ নাবিকের মেনে থাকা জাহাজকে যে নিয়ে যাচ্ছিল তার গন্তব্যের দিকে! বিশ্বাস এমন একটা জিনিস যা সব কিছুর মধ্যে থেকে আমাদের বের করে নিয়ে যায়, এগিয়ে নিয়ে যায়! আমাদের আবারও বাঁচার কথা বলে। তাই আমিও বিশ্বাস রাখি যে আদিতের সঙ্গে জীবন শুরু করবে স্মাহি। বিশ্বাস রাখি দেশপ্রিয় পার্কের পেট্রোল পাম্পের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা মুকু আবার ফিরে যাবে তিজুর কাছে। আর বিশ্বাস রাখি তিজু অভিনবের মধ্যে পেয়ে যাবে ওর বাবাকে! আমি বিশ্বাস রাখি একটা আবছায়া পৃথিবীতে আমরা ঠিক আরও আরও বেঁচে থাকব! আরও আরও হাতে হাত বেঁধে রুখে দেব সব মনখারাপ আর কষ্ট! বিশ্বাস রাখি আমি পারব, আর তুমিও ঠিক পারবে আবার বেঁচে উঠতে! পারবে অন্যকে বাঁচিয়ে তুলতে। কারণ, আমি বিশ্বাস রাখি তোমার ওপর। আমি বিশ্বাস রাখি, আজও...

(রঙ্গন ফুলের পাপড়ির মতো ঠোঁট, অলিভ মোটর বাইক আর বাইশে ডিসেম্বরের কুয়াশা ছাড়া এই গল্পের আর সব কিছু কাল্পনিক!)

**শিল্পী:** ওঙ্কারনাথ ভট্টাচার্য